বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

তিনটি বই একত্রে

কিশোর ক্লাসিক

জেন আয়ার
লিটল উইমেন
ভ্যানিটি ফেয়ার

রূপান্তর:কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী
SUVOM

কিশোর ক্লাসিক

তিনটি বই একত্রে

রূপান্তরঃকাজী শাহনূর হোসেন

জেন আয়ার/শার্লট ব্রনটি: বাপ-মা মরা মেয়ে জেন আয়ার। মানুষ হচ্ছিল মামীর বাড়িতে। কিন্তু ওখানে এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি পায়নি সে।...জীবনে এল প্রেম, ঘটে গেল অনেক ঘটনা—ঘটল বিচ্ছেদ। কিন্তু বেশিদিন নিজেকে একা রাখতে পারল কি জেন?

লিট্ল্ উইমেন/লুইযা মে অলকট: স্বামী-স্ত্রী আর চার মেয়েকে নিয়ে মার্চ পরিবার। বাবা চলে গেলেন যুদ্ধে। স্নেহময়ী মা সামাজিক কাজে ব্যস্ত।...কৈশোর, বেড়ে ওঠার যন্ত্রণা, ভালবাসা, পারিবারিক জীবনের অনাবিল সুখ—সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এই অসাধারণ উপন্যাসটিতে।

ভ্যানিটি ফেয়ার/উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে: এমি আর বেকি ঘনিষ্ঠ দুই বান্ধবী। স্কুলের পড়া শেষে পা রাখল নতুন জীবনে। জীবনযুদ্ধে প্রিয় বান্ধবী পরিণত হলো শত্রুতে। এমির সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সুখী কি হতে পারল বেকি? এমির দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াল কে? কে শোনাল ভালবাসার গান?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কিশোর ক্লাসিক

জেন আয়ার

লিটল্ উইমেন

ভ্যানিটি ফেয়ার

রূপান্তর ■ কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1574-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

JANE EYRE
LITTLE WOMEN
VANITY FAIR
Trans By. Qazi Shahnoor Husain

তিপ্পান্ন টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু
ভ
ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

জেন আয়ার/শার্লট ব্রন্টি : ৫–৮৩

লিট্‌ল্‌ উইমেন/লুইয়া মে অলকট : ৮৪–১৫৬

ভ্যানিটি ফেয়ার/ডব্লিউ. এম. থ্যাকারে : ১৫৭–২২৪

কিশোর ক্লাসিক

জেন আয়ার
মূলঃ শার্লট ব্রনটি
অনুবাদঃ কাজী শাহনূর হোসেন

লিটল উইমেন
মূলঃ লুইযা মে অলকট
অনুবাদঃ কাজী শাহনূর হোসেন

ভ্যানিটি ফেয়ার
মূলঃ উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে
অনুবাদঃ কাজী শাহনূর হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর কটি কিশোর ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন
বেন-হার
চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল/নিয়াজ মোরশেদ
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভানটেস/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়র/কাজী শাহনূর হোসেন
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল/ইফতেখার আমিন
দ্য ম্যান হু লাফস/শেখ আবদুল হাকিম
চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
মার্ক টোয়েন/শেখ আবদুল হাকিম
পুডনহেড উইলসন
এমিলি ব্রন্টি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো/অনীশ দাস অপু
আঙ্কল টমস কেবিন
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
শেবা/সায়েম সোলায়মান
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
স্যার ওয়াল্টার স্কট/কাজী মায়মুর হোসেন
রব রয়
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার/কাজী আনোয়ার হোসেন
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
রূপসী বন্দিনী
টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে/শেখ আবদুল হাকিম
হাইপেশিয়া
এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন/কাজী মায়মুর হোসেন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স
আলেকযান্ডার বেলায়েভ/কাজী মায়মুর হোসেন
দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দ্য ফিফথ কলাম/শেখ আপালা হাকিম
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ
আলেকজান্দার দ্যুমা
মার্গারেট ডি-ভ্যালয়/শেখ আপালা হাকিম
জেরাল্ড দুরেল/অনীশ দাস অপু
মানবজন্তু
রবার্ট লুই স্টিভেনসন
কিডন্যাপড/নিয়াজ মোরশেদ
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/আসাদুজ্জামান
বাস্কারভিলের হাউন্ড

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

জেন আয়ার
শার্লট ব্রন্টি
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

সেদিন হাঁটতে গেলাম না আমরা। কারণ বৃষ্টি পড়ছিল। সঙ্গে বইছিল শীতের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। খুব খুশি হলাম আমি। শীতের ঠাণ্ডা বিকেলে বেড়াতে মোটেই ভাল লাগে না আমার।

রীড মামার তিন ছেলে-মেয়ে অর্থাৎ এলিজা, জন আর জর্জিয়ানা তাদের মায়ের সঙ্গে ড্রইংরুমে বসে রইল। আমি চুপিসারে চলে গেলাম পাশের ছোট্ট ঘরটাতে। অনেক বইয়ের মাঝ থেকে খুঁজে পেতে বেশ বড়সড়, ভারী দেখে একটা বই বেছে নিলাম। বইটি ব্রিটেনের পাখিদের নিয়ে লেখা। পরদা টেনে দিয়ে জানালার পাশে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লাম।

পাতার পর পাতা উল্টে চলেছি। ডুবে গেছি বইয়ের মাঝে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠলাম।

'দূর! নেই।' জন রীডের গলা।

চুপ করে রইলাম আমি। ওকে বড় বেশি রকমের ভয় পাই। সর্বক্ষণ আমাকে জ্বালাতন করে ও। মারধোর করে। নিষ্ঠুরের মত। স্কুলে পড়ে জন। বছর চোদ্দ বয়স বড় জোর। আমার দশ। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা আর গাঁট্টাগোঁট্টা ও। আর আমি ছোটখাট পাতলা গড়নের মেয়ে। তবে দেখতে ছোটখাট হলেও আমার চোখ দুটো সুন্দর, ডাগর।

জন খেতে বড় ভালবাসে। ফলে ওর গাল দুটো বেশ ফোলা ফোলা। ও আমাকে অপছন্দ করে, কারণ আমি ওদের বাড়িতে আশ্রিত। ওর মা সম্পর্কে আমার মামী হন। ওদের বাড়িটার নাম গেটশেড।

মামী কেমন যেন উদাসীন। জন যে আমাকে মারধোর করে সেটা যেন তিনি জানেনই না। তবে এটা ঠিক যে বেশিরভাগ সময় জন তার আড়ালেই কাজটা সারে।

যাই হোক, পর্দার আড়ালে থাকার কারণে জন দেখতে পেল না আমাকে। আমাকে খুঁজে না পেয়ে চেঁচাল, 'লিজি, মা'কে বল জেন ঘরে নেই। বৃষ্টির মধ্যে বাইরে চলে গেছে।' কথাটা বলতে পেরে খুব যেন আমোদ পেল জন।

'এসময় লিজির গলা শুনতে পেলাম, আমার মনে হয় ও জানালার

পাশে বসে রয়েছে।"

জন আমাকে টেনে আনার আগেই দ্রুত বেরিয়ে এলাম আমি। সাহস করে প্রশ্ন করলাম, "কি চাও?"

"আমাকে সব সময় "মাস্টার রীড" বলে ডাকবি," জবাব দিল সে। "এদিকে আয়।"

একটা আর্মচেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সে। ইশারায় ডাকল আমাকে। তার সামনে দাঁড়াতে বলল। আমি চেয়ারের কাছে আসতেই জিভ বার করে ভেংচি কাটল সে। বুঝলাম, মার খাওয়ার সময় হয়েছে আমার। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখে কিছুই বলল না সে। আচমকা আঘাত করল আমাকে। প্রচণ্ড জোরে, টলমল করতে করতে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম আমি। পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যথাটা সহ্য করলাম কোনমতে।

"পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকার শাস্তি এটা। অবশ্য তোকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। সেটাও একটা কারণ," বলল জন।

চুপ করে ওর পরবর্তী আঘাতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। ভাবতে লাগলাম কিভাবে সহ্য করব সেটা।

"পর্দার আড়ালে কি করছিলি তুই?" জিজ্ঞেস করল জন।

"পড়ছিলাম।"

"কি পড়ছিলি দেখি।"

জানালার পাশ থেকে বইটা নিয়ে এলাম আমি।

"আমাদের বই পড়ার কোন অধিকার তোর নেই। তোর বাপ একটা ফুটো পয়সাও রেখে যায়নি তোর জন্যে। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ানোর কথা তার। ভদ্রলোকের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকিস, লজ্জা করে না? আমার মায়ের খাস, পরিস, তুই এ বাড়ির কে রে?"

এসব কথা বলে জন আমার হাত থেকে কেড়ে নিল বইটা। আমাকে আদেশ করল দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। আদেশ পালন করলাম আমি, দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে সে। হাতে সেই বিশাল, ভারী বইটি। ছোঁড়ার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ভয়ে। তবে সরে যাওয়ার আগেই বইটি ছুঁড়ে দিল জন। বইয়ের আঘাতে মেঝেতে পড়ে গেলাম আমি। মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল দরজার সঙ্গে। কেটে গিয়ে দরদর করে বেরিয়ে এল রক্ত। তীব্র ব্যথায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

"বদমাশ কোথাকার!!" বললাম আমি। "খুনী—"

‘কি বললি?’ চিৎকার করে বলল জন। ‘দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি!’

আমার দিকে তেড়ে এল সে। চুলের মুঠি আর কাঁধ চেপে ধরল শক্ত করে। সে মুহূর্তে ওকে খুনী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলাম না আমি। অনুভব করলাম আমার মাথা থেকে দু-এক ফোঁটা রক্ত ঘাড় বেয়ে নেমে আসছে। মরিয়া হয়ে ওকে আঁচড়ে দিলাম। ও চিৎকার করতে লাগল, ‘ইঁদুর! ইঁদুরের বাচ্চা!’

সাহায্যের জন্যে জনকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আমি ওকে আঁচড়ে দিতেই এলিজা আর জর্জিয়ানা ওদের মা’কে ডেকে আনতে দৌড়াল। ছুটে এলেন মামী। সঙ্গে বেসী আর অ্যাবট। কাজের লোক ওরা। ছুটিয়ে দেয়া হল আমাদের দু’জনকে। মিসেস রীড দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, ‘একে ওপরে নিয়ে যাও। লাল ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দেবে।’

দু জোড়া হাত চেপে ধরল আমায়। হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওপর তলায়। হাত-পা ছুঁড়ে তীব্র প্রতিবাদ করলাম আমি। তাতে ফল হল আরও খারাপ। বেসী আর অ্যাবট রেগে উঠল আমার ওপর। লাল ঘরে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। অ্যাবট বলল, ‘বসে বসে তোমার শয়তানির কথা ভাব।’

জোর করে ওরা একটা টুলে বসিয়ে দিল আমাকে। আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চারটে হাত আবারও আমাকে চেপে ধরল!

‘শান্ত হয়ে না বসলে বেঁধে রেখে যাব।’ হুমকি দিল বেসী।

ওর মুখ দেখে বুঝলাম দরকার পড়লে বেঁধে রাখতে দ্বিধা করবে না ও, বসে রইলাম চুপচাপ। অ্যাবট তার হাত দুটো ভাঁজ করে গভীর দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। ‘প্রার্থনা সেরে নাও, জেন,’ বলল সে, ‘নইলে চিমনি দিয়ে কোন প্রেতাত্মা এসে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে।’

বেরিয়ে গেল ওরা। তালা মেরে দিল দরজায়। আমি একা এখন। ভয়ে বুকটা শুকিয়ে এল আমার।

রীড মামা মারা যাওয়ার পর থেকে এঘরে আর কেউ ঘুমোয়নি। নয় বছর আগে এঘরেই মারা গিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে এ ঘরটা সম্বন্ধে কেমন যেন একটা ভীতিকর অস্বস্তি কাজ করে সকলের মধ্যে।

লাল ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা বিছানা রয়েছে। মেহগনি কাঠের শক্ত পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা। গাঢ় লাল পর্দা দিয়ে ঘেরা। কার্পেটটাও লাল। বিছানার পায়ের কাছে রাখা টেবিলটাও লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। বড় বড় দুটো জানালা রয়েছে এ ঘরে। খড়খড়ি নামানো এখন।

ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা, শান্ত। ওরা সত্যি করেই তালা মেরেছে কিনা দেখার জন্যে ছুটে গেলাম। হ্যাঁ! তারমানে ওরা না চাইলে আর বেরতে

পারছি না আমি।

আবার টুলে গিয়ে বসলাম। ভাবতে লাগলাম আমার দুর্দশার কথা। আমি তো সর্বক্ষণই মামীকে খুশি করতে চেষ্টা করি। তবু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেন যে আমাকে গাল-মন্দ শুনতে হয় ভেবে পেলাম না আমি।

মাথাটা ব্যথা করছে এখনও, রক্ত পড়াও থামেনি। চুপচাপ বসে কাঁদতে লাগলাম আমি।

ফ্যাকাসে হয়ে আসছে দিনের আলো। চারটে বাজে এখন। মেঘলা আকাশের কারণে আঁধার হয়ে গেছে প্রায়। জানালায় বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে। শোঁ শোঁ করে বইছে বাতাস। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে মরার দশা আমার। রীড মামার কথা মনে পড়ল। আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসার সময় মা'কে কথা দিয়েছিলেন, নিজের মেয়ের মত মানুষ করবেন আমাকে।

বেঁচে থাকলে হয়ত করতেনও। হঠাৎ মনে হল কোথায় যেন শুনেছি, শেষ ইচ্ছে পূরণ না হলে অনেক আত্মা আবার ফিরে আসে দুনিয়ার বুকে। তারা দুখী মানুষের পাশে দাঁড়ায়। অত্যাচারীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়, আমার মন বলছে রীড মামার আত্মাও ফিরে আসবে। মামী আমার ওপর যে অন্যায় করছেন তার শাস্তি তাঁকে দেবে। রীড মামার ভূত হয়ত হঠাৎ করেই আমার সামনে এসে দাঁড়াবে!

ভয়ে পিলে চমকে গেল আমার। চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। চোখের পানি মুছলাম। ফোঁপাচ্ছিলাম এতক্ষণ, সামলে নিলাম দ্রুত। কে জানে আমার কান্না শুনে কোন ভুতুড়ে গলা হয়ত সান্ত্বনা দেবে আমাকে। হয়ত বা মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে দুঃখ প্রকাশ করবে কেউ। সাহস ভরে মাথাটা তুলে চারদিকে চাইলাম আমি।

ওটা কি?

দেয়ালে কিসের যেন ছায়া পড়েছে। চাঁদের আলো নাকি? খড়খড়ির ভেতর দিয়ে এসেছে? না! চাঁদের আলো হলে নড়াচড়া করত না। এটা করছে। আমার মাথার ওপর দিয়ে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। বেড়ে গেছে হৃৎস্পন্দন। ডানা ঝাপটানর মত আওয়াজ কানে এল এসময়। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল আমার। দৌড়ে গেলাম দরজার কাছে। পাগলের মত বেরনর চেষ্টা করতে লাগলাম। না পেরে চিৎকার জুড়ে দিলাম প্রাণভয়ে।

দুই

প্যাসেজ ধরে ছুটে আসছে কেউ। পায়ের শব্দ পেলাম। এ সময় খুলে গেল তালা। বেসী আর অ্যাবট ঢুকল ঘরে।

'কি হয়েছে, জেন? শরীর খারাপ লাগছে?' বেসী জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল,' অনুনয় করলাম আমি। 'নার্সারিতে নিয়ে চল, প্লীজ।'

'কেন? ব্যথা পেয়েছ? কিছু দেখেছ?' জানতে চাইল বেসী।

ওর হাত চেপে ধরলাম আমি। থর থর করে কাঁপছে আমার হাত।

'ভূতের আলো দেখেছি! বোধহয় রীড মামার ভূত!' কোনমতে বললাম আমি। তখনও ধরে রেখেছি বেসীর হাত। ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল না ও।

'হচ্ছেটা কী এখানে?'

মামীর গলা পেলাম। প্যাসেজ ধরে হেঁটে এলেন তিনি। তাঁর গাউনটা মাটিতে ঘষা খেয়ে জোরাল শব্দ করছে।

'তোমাদের বলেছি না, আমার হুকুম ছাড়া এঘরে কেউ আসবে না?' বেসী আর অ্যাবটকে উদ্দেশ্য করে কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

'জেন যেভাবে চিৎকার করছিল, ম্যাডাম–' ভয়ে ভয়ে বলল বেসী।

'ওর হাত ছেড়ে দাও,' আমাকে বললেন মামী। 'জেন আয়ার, এঘরে তোমাকে আরও এক ঘণ্টা থাকতে হবে। তবে দুষ্টুমি না করে শান্ত হয়ে থাকতে পারলে ছাড়া পাবে তুমি।'

'আমাকে অন্য কোন শাস্তি দিন,' প্রার্থনা করলাম আমি। 'এখানে থাকিলে মরে যাব, মামী।'

'একদম চুপ!' ধমক দিলেন তিনি। আমাকে আবার ঠেলে দিলেন ঘরের ভিতর। তালা মেরে দিলেন দরজায়। গাউনের আওয়াজ তুলে দুই সহকারীকে নিয়ে সদম্ভে চলে গেলেন মিসেস রীড।

ঘরের চারদিকে চাইলাম আমি। আঁধার। জ্ঞান হারালাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল আমার। যেন কোন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি। চোখ মেলে দেখি নার্সারিতে আমার বিছানায়

শুয়ে রয়েছি আমি। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। তারমানে রাত এখন। পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে বেসী। আমার মাথার কাছে বসে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। চিনতে পারলাম তাঁকে, ডাক্তার লয়েড।

'বল তো আমি কে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। তাঁর নামটা উচ্চারণ করে হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি তাঁর দিকে। হাতটা ধরে সুন্দর করে হেসে বললেন তিনি, 'আমি তোমার বন্ধু।'

আমাকে শুয়ে থাকতে বললেন তিনি। বেসীকে নির্দেশ দিলেন আমাকে যেন রাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। ওকে আরও কিছু নির্দেশ দিলেন ডাক্তার লয়েড। আগামীকাল আবার আসবেন বলে চলে গেলেন তিনি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। যতক্ষণ তিনি বসে ছিলেন ততক্ষণ মনে হচ্ছিল আমি অনেক নিরাপদ। এখন বড় অসহায় লাগছে নিজেকে। ঘরটা কেমন আঁধার ঠেকছে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভারী হয়ে গেছে বুকটা।

তিনি চলে গেলে পর বেসী বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'ঘুম পাচ্ছে?' নরম গলায় জানতে চাইল সে।

অবাক হলাম আমি। ভয়ও পেলাম। পরের কথাটাই হয়ত ঝাঁঝের সঙ্গে বলবে বেসী। 'তেমন না,' বললাম আমি।

'কিছু খাবে?'

'না, বেসী, ধন্যবাদ।'

'তবে আমি শুতে চললাম। বারোটা বেজে গেছে। তোমার কিছু লাগলে আমাকে ডাকবে, কেমন?'

কী চমৎকার ভদ্রতা! সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কি হয়েছে, বেসী? আমি কি অসুস্থ?'

'আরে না, ভয় পেয়েছ কেবল। আর কিছু না। শিগ্‌গির সেরে উঠবে তুমি।'

ঘুমাতে চলে গেল বেসী।

পরদিন দুপুরে ঘুম ভাঙল আমার। গায়ে শাল জড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে বসলাম। শরীরটা বড় দুর্বল ঠেকছে। তবে তারচেয়েও বেশি ভেঙে পড়েছে মন। চোখ বেয়ে দরদর করে নেমে আসছে নোনা পানি। মুছে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। মনকে প্রবোধ দিলাম। আমার তো খুশি হওয়ার কথা। রীড মামার ছেলে-মেয়েরা আপাতত বাড়িতে নেই। মায়ের সঙ্গে তারা ক্যারিজে চেপে বেড়াতে গেছে। ওরা ফিরে আসার আগেই এলেন ডাক্তার লয়েড।

'জেন, এস,' আমাকে ডাকতে এল বেসী। আমার যেতে হল না। ডাক্তার লয়েড নিজেই এলেন এ ঘরে। বেসীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছে ও?'

বেসী জানাল আমি এখন অনেকটা সুস্থ।

'তবে ওকে এত মলিন দেখাচ্ছে কেন? এদিকে এস তো, জেন।'

তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম আমি।

'কাঁদছিলে, তাই না? কেন বল তো? কোথাও ব্যথা

'না, স্যার।'

'আসলে মিসেস রীডের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেনি বলে ওর মন খারাপ,' বেসী পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইল।

'আমার তা মনে হয় না,' বললেন ডাক্তার।

বেসীর মিথ্যে কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলাম না আমি। বলে বসলাম, 'বেড়াতে যেতে মোটেও ভাল লাগে না আমার। সেজন্যে কাঁদছি না আমি। আসলে আমি বড় অসহায়।'

'ছি, জেন! এসব কি বলছ?' বেসী বলল।

আমার দিকে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, 'কাল কি হয়েছিল তোমার? শরীর খারাপ হল কিভাবে?'

'পড়ে গিয়েছিল,' আমি জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল বেসী।

'বাজে কথা!' বললেন ডাক্তার।

'আমাকে বই ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল। তবে সেজন্যে কিছু হয়নি আমার,' বলে ফেললাম আমি।

এসময় বেল বেজে উঠল। কাজের লোকদের খাওয়ার সময় হয়েছে। ডাক্তার লয়েড পরিচিত এই শব্দের সঙ্গে। বেসীকে যেতে বললেন তিনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হল তাকে।

'তবে কিজন্যে হল?' আবার আমার দিকে মনোযোগ দিলেন ডাক্তার লয়েড।

'আমাকে ভূতের ঘরে আটকে রেখেছিল ওরা।'

ডাক্তার লয়েড হেসে ফেললেন। তবে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে উঠল একই সঙ্গে। 'ভূত! তুমি ভূতকে ভয় পাও?'

'পাই, রীড মামার ভূতকে ভয় পাই। তিনি ও-ঘরেই মারা গিয়েছিলেন। ওরা আমাকে মোমবাতি ছাড়া ও-ঘরে আটকে রেখেছিল। একথা জীবনে ভুলব না আমি।'

'এজন্যেই তোমার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে?'

'শুধু এজন্যে নয়। অন্য ব্যাপারও আছে। আমার অনেক দুঃখ।'

'কি দুঃখ শুনি।'

'আমার বাপ-মা কেউ নেই। জন রীড বলে এ বাড়িতে আমার থাকার কোন অধিকার নেই। সুযোগ থাকলে অন্য কোথাও চলে যেতাম আমি। এখানে আমার অনেক কষ্ট।'

'তোমার স্কুলে পড়তে ইচ্ছে করে না?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার লয়েড।

এ নিয়ে আগেও ভেবেছি আমি। বেসীর মুখে স্কুলের কথা আগেও শুনেছি। তবে তা খুবই সামান্য। স্কুল সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই আমার। কিন্তু ভর্তি হতে পারলে এখান থেকে বহুদূরে চলে যেতে পারব আমি, একথা জানা আছে। মিসেস রীড, তাঁর ছেলে-মেয়ে, গেটশেড সব কিছু ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারব।

'আমি স্কুলে পড়তে চাই,' মনের ইচ্ছে প্রকাশ করলাম আমি।

এসময় ক্যারিজটা এসে থামল। ইতোমধ্যে বেসী ফিরে এসেছে। ডাক্তার লয়েড উঠে দাঁড়ালেন। বেসীকে প্রশ্ন করলেন, 'মিসেস রীড এলেন? আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বেসী ডাক্তার লয়েডকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এ ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে কয়েক সপ্তাহ। স্কুলের ব্যাপারে মামী কিছুই বলেননি আমাকে। তবে একদিন রাতে বেসী আর অ্যাবটের কথায় বুঝতে পারলাম এ বাড়িতে আমাকে সহ্য করতে পারছেন না তিনি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে গল্প করছিল ওরা। অ্যাবট বলল মিসেস রীড আমার মত বেয়াদব, অভদ্র মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচেন। তাঁর নাকি ধারণা আমি তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি।

ওদের কথা থেকে আরও জানতে পারলাম, আমি একজন গরীব পাদ্রীর মেয়ে। সবার মতের বিরুদ্ধে মা আমার বাবাকে বিয়ে করেছিলেন। আমার নানা এই বিয়েতে মত দেননি। মেয়ের অবাধ্যতায় তিনি এত বেশি রেগেছিলেন যে সম্পত্তির এক কানাকড়িও দেননি মেয়েকে। বাবা-মার বিয়ের বছরখানেক পরে টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত হন বাবা। মায়ের মধ্যেও সংক্রমিত হয় সে জ্বর। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে মারা যান দু'জনে।

যাই হোক মিসেস রীড ইদানীং আমার সঙ্গে কথা বলা একদম কমিয়ে দিয়েছেন। আমাকে এক রকম আলাদা করে দিয়েছেন বলা চলে। একাই খাই আমি। ঘুমানর সময়ও আমি একা, বেশিরভাগ সময় নার্সারিতেই কাটে আমার। মামীর ছেলে-মেয়েরা ড্রইংরুমে বসে গল্পগুজব করে। জন এখনও

সুযোগ পেলেই জিভ বার করে ভেংচি কাটে আমায়। তবে সেদিনের ঘটনার পর থেকে আর কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না।

এভাবে ক্রিসমাস এল। নতুন বছরও এল। ওদের তিন ভাই-বোনের জন্যে এল প্রচুর উপহার, খাবার-দাবার। সন্ধ্যায় পার্টি দেয়া হল। গেটশেড মেতে উঠল চিরাচরিত উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে। বলাবাহুল্য আমাকে বাদ দেয়া হল সবকিছু থেকে। নতুন নতুন কাপড় পরে আমার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াল ওরা। নিচে পিয়ানো বাজানো হল। নার্সারিতে বসে শুনলাম আমি। মাঝে মধ্যে সিড়ির মুখে পা টিপে টিপে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম খানসামারা খাবার ট্রে হাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। এভাবেই ক্রিসমাস আর নববর্ষ উদযাপন করলাম আমি।

জানুয়ারি মাসের পনেরো তারিখ। সকাল নয়টায় নার্সারির জানালার পাশে বসে আছি আমি। এখান থেকে দারোয়ানের ঘর চোখে পড়ে। গেটশেডে আসার রাস্তাও দেখা যায়। হঠাৎ খুলে গেল গেট। একটা ক্যারিজ ঢুকল। থামল এসে বাড়ির সামনে। দরজার বেল সশব্দে বেজে উঠতে শুনলাম। নিত্যকার ঘটনা এটা। কোনরকম আগ্রহ বোধ করলাম না আমি। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বেসী দৌড়ে উঠে এল ওপরে।

'জেন, সকালে হাত-মুখ ধুয়েছ?' প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল সে।

আমি মাথা নাড়লাম। ধুইনি।

সে দ্রুত আমার মাথা ব্রাশ করে দিল। সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে বলল আমাকে এক্ষুনি নাস্তার টেবিলে যেতে হবে। নিচে।

ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলাম আমি। প্রায় তিন মাস মিসেস রীড ডেকে পাঠাননি আমাকে। এখন আবার কিসের দরকার পড়ল? মনে মনে ভয় পেলাম আমি। শূন্য হলরুমে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপাশের ঘরেই নাস্তার টেবিল। কিন্তু ঢুকতে সাহস পেলাম না। নার্সারিতে ফিরে যাব সে সাহসও নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিট দশেক। এসময় জোরে বেজে উঠল ও ঘরের বেল। বুঝলাম আমাকেই ডাকছে।

ধীরে হেঁটে গেলাম দরজার কাছে। খোলাই রয়েছে দরজা। ঢুকে পড়লাম আমি। চেয়ে দেখলাম মিসেস রীড বসে রয়েছেন ফায়ারপ্লেসের পাশে। আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো পোশাক পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন কার্পেটের ওপর। তাঁর লম্বা শরীরটা আমার কাছে গাছের মত লাগল। ভদ্রলোকের মুখটা কঠিন। মুখোশ পরে রয়েছেন যেন। ঘন ভ্রূর নিচে ধূসর একজোড়া চোখ।

মিসেস রীড হাতের ইশারায় ডাকলেন আমাকে।

'এর কথাই বলেছিলাম,' বললেন তিনি।

'দেখে তো ছোটই মনে হচ্ছে,' ভারী গলায় বললেন ভদ্রলোক। 'বয়স কত?'

'দশ বছর।'

'এত?' ভদ্রলোকের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'নাম কি তোমার?'

'জেন আয়ার, স্যার।'

'ভাল। দুষ্টুমি কর না তো?'

চুপ করে রইলাম আমি। কিন্তু মিসেস রীড মাথা নেড়ে বললেন, 'ও ব্যাপারে কিছু না বলাই ভাল, মিস্টার ব্রকলহার্স্ট।'

'এ তো ভাল কথা নয়,' গম্ভীর স্বরে বললেন তিনি। মিসেস রীডের মুখোমুখি রাখা আর্মচেয়ারে বসলেন ভদ্রলোক। 'এদিকে এস,' ডাকলেন আমাকে।

আমি এগিয়ে গেলাম। ঠিক তাঁর সামনে দাঁড় করালেন আমায় তিনি। কি কঠোর তাঁর মুখটা। এ মুহূর্তে আমার সমান্তরালে রয়েছে তাঁর মুখ। কি বিশাল নাক! কি বিশাল হাঁ! বড় বড় দাঁত দেখা যাচ্ছে!

'তারমানে দুষ্টু মেয়ে তুমি, তাই না?' বললেন তিনি। 'দুষ্টু মেয়েরা মারা গেলে কোথায় যায় জান?'

'নরকে,' বললাম আমি।

'অহলে নরকে যেতে না চাইলে কি করতে হবে তোমাকে বল তো?'

এক মুহূর্ত ভেবে বললাম আমি, 'সুস্থ থাকতে হবে আর কিছুতেই মরা চলবে না।'

'তুমি চাইলেই স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে তোমার? তোমার চেয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা প্রতিদিন মারা যাচ্ছে,' কঠোর মুখে বললেন তিনি। 'বাইবেল পড়?'

'মাঝে সাঝে।'

'প্রার্থনা সঙ্গীত ভাল লাগে তোমার?'

'না, স্যার। একদমই না,' জবাব দিলাম আমি।

'বল কি! তুমি দেখছি সত্যিই দুষ্টু,' চোখ নাচিয়ে বললেন তিনি।

'আগেই তো বলেছিলাম, মিস্টার ব্রকলহার্স্ট,' মামী বললেন। 'একে লোউড স্কুলে পাঠাতে পারলে আমার জানটা বাঁচে। চিঠিতে পড়েননি? আপনার টিচারদের বলে দেবেন এর ওপর কড়া নজর রাখতে।'

আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এল প্রায়, খুশিতে। শেষ পর্যন্ত এখান থেকে তাড়ানো হচ্ছে আমাকে! নতুন পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করতে

যাচ্ছি আমি। কিন্তু সামনে কি অপেক্ষা করছে তখন জানা ছিল না আমার। জানা থাকলে হয়ত এতখানি খুশি হতে পারতাম না।

তিন

১৯ জানুয়ারি। ভোর সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠলাম আমি। কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে নিলাম। গেটশেড ছেড়ে চলে যাচ্ছি আজ। বেসী ছাড়া আর কেউ ওঠেনি এখনও।

নার্সারি থেকে বেরিয়ে এলাম আমি আর বেসী। মিসেস রীডের ঘর পেরোনর সময় বেসী জিজ্ঞেস করল, 'মামীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

'না, বেসী। তাঁকে ঘুম থেকে ওঠানো ঠিক হবে না,' বললাম আমি।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। আকাশে চাঁদ নেই। শীতের সকালে দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে যাচ্ছে। দারোয়ানের ঘরে আলো দেখতে পেলাম। আমার ট্রাঙ্কটা রাখা দেখলাম দরজার পাশে। কাল সন্ধ্যায় ওখানে আনা হয়েছে ওটা। দারোয়ানের স্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাঙ্কের পাশে।

এসময় দূর থেকে চাকার গড়গড় শব্দ পেলাম, ছয়টা বেজে গেছে খানিক আগে। কোচ আসছে। গেটের কাছে চলে গেলাম আমি। আঁধার ভেদ করে কোচের আলো এগিয়ে আসছে দ্রুত। দারোয়ানের স্ত্রী প্রশ্ন করল বেসীকে, 'ও একাই যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'এখান থেকে কদ্দূর?'

'মাইল পঞ্চাশেক।'

'এতদূর! মিসেস রীড ওকে একা না ছাড়লেও পারতেন।'

কোচ চলে এল। কোচের ছাদে তোলা হল আমার ট্রাঙ্ক। বেসীর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম আমি।

'ওর দিকে খেয়াল রাখবে,' কোচের গার্ডকে বলল বেসী।

'অবশ্যই,' বলল গার্ড। আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল ভেতরে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ছুটল কোচ।

কোচ ভ্রমণের কথা বিশেষ মনে নেই আমার। শুধু এটুকু মনে আছে

সময় যেন পেরোতে চাইছিল না কিছুতেই। বিকেল বেলাটা কেমন যেন ভেজা, কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হল আমার। বিকেল মরে সন্ধে ঘনাতেই বুঝতে পারলাম গেটশেড ছেড়ে বহুদূর চলে এসেছি আমরা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। ঘুম ভাঙতে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের কোচ। দরজাটা খোলা। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়। দেখে মনে হল কাজের লোক। প্রদীপের আলোয় তার মুখ আর চেহারা চোখে পড়ল আমার।

'জেন আয়ার এসেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। আমাকে কোলে করে নামানো হল। ট্রাঙ্কটাও নামিয়ে দিয়ে চলে গেল কোচ।

চারদিকে চাইলাম আমি। বৃষ্টি, বাতাস আর আঁধারের মাঝ দিয়ে চোখে পড়ল একটা দেয়াল। সামনে খোলা দরজাও দেখলাম। সে দরজা দিয়েই মহিলার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম আমি। বন্ধ করে তালা মেরে দেয়া হল দরজায়। বাড়িটা বিশাল, এবার বুঝলাম। অসংখ্য জানালা। কোন কোনটায় আবার আলো জ্বলছে। দরজা পেরিয়ে প্যাসেজ ধরে অন্য একটা ঘরে আনা হল আমাকে, চলে গেল মহিলা, আমাকে একা রেখে।

এঘরে ফায়ারপ্লেস রয়েছে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া আঙুলগুলো সেঁকে নিলাম আমি। এসময় ঘরে ঢুকলেন দুই ভদ্রমহিলা। প্রথমজন লম্বা। মাথায় কালো চুল। চোখ জোড়াও কালো। বিষণ্ণ, মলিন মুখ। আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন তিনি, 'এতটুকু মেয়েকে একা পাঠানো উচিত হয়নি।' তারপর যোগ করলেন, 'শিগ্গির ওর ঘুমানর ব্যবস্থা করা দরকার। ক্লান্তি লাগছে তোমার?' আমার কাঁধে হাত রেখে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

'কিছুটা, ম্যাডাম।'

'খিদেও পেয়েছে সন্দেহ নেই। মিস মিলার, ওকে নিয়ে যান। খাইয়ে তবে শুতে পাঠাবেন।' আমার গালে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে ভাল মেয়ে তুমি। আমাদের কথা শুনবে।'

আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিস মিলার। অনেকগুলো প্যাসেজ পেরিয়ে বিশাল এক হলরুমে নিয়ে এলেন। বিরাট সব টেবিল। তার চারদিকে বেঞ্চিতে বসে রয়েছে অসংখ্য মেয়ে। নয় থেকে বিশের মধ্যে বয়স ওদের। মেয়েগুলোর সম্মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন এ-ঘরে আসার পথে শুনতে পেয়েছিলাম আমি। সকলের পরনে একই পোশাক। বাদামি ফ্রক আর লম্বা সাদা পিনাকোর। ওরা সবাই পড়াশোনায় ব্যস্ত। আগামীকালের পড়া তৈরি করছে। দরজার পাশে একটা বেঞ্চিতে আমাকে বসতে বললেন

মিস মিলার। তারপর হেঁটে গেলেন হলরুমের মাথায়। চিৎকার করে বললেন, 'এই, তোমরা চার মনিটর বইগুলো জমা নিয়ে নাও।'

ভিন্ন ভিন্ন টেবিল থেকে উঠে এল চারটি মেয়ে, তারপর ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করল বইগুলো। সরিয়ে ফেলল। মিস মিলার নির্দেশ দিলেন আবার, 'খাবারের ট্রে নিয়ে এস।'

মেয়ে চারটি বেরিয়ে গেল। প্রায় তক্ষুণি ফিরে এল আবার। চারজনের হাতে চারটি ট্রে। আমাকে দেয়া হল এক মগ পানি আর পাতলা কয়েক টুকরো ওটকেক। তৃপ্তির সাথে পানি খেলাম আমি। কিন্তু খাবার ছুঁয়ে দেখতেও ইচ্ছে হল না। বড় ক্লান্তি লাগছে।

খাওয়া শেষে মিস মিলার প্রার্থনা করলেন। মেয়েরা তারপর সারি বেঁধে দুজন দুজন করে উঠে গেল ওপরে। অবসাদের কারণে বেডরুমটা কেমন, প্রথমে ভালমত লক্ষ্যই করলাম না আমি। আমাকে কাপড় ছাড়তে সাহায্য করলেন মিস মিলার। ঘরটা লম্বা। সার বেঁধে বিছানা ফেলা হয়েছে। প্রতিটা বিছানায় দুজনের শোয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিছানাগুলো ভরে যেতে লাগল দ্রুত। শুয়ে শুয়ে এসব লক্ষ করলাম আমি। মিনিট দশেকের মধ্যেই নিভিয়ে দেয়া হল ঘরের একমাত্র বাতিটা। নিঃশব্দ অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দ্রুত পেরিয়ে গেল রাতটা। মাঝে বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা শুনে ঘুম ভেঙেছিল একবার। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছিল তখন। মিস মিলারকে আমার পাশে শুয়ে থাকতে দেখলাম। দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল ঘণ্টার জোর আওয়াজে। ভোর হয়নি এখনও দু'একটা মোমবাতি জ্বলছে ঘরে। উঠে পড়েছে মেয়েরা। পোশাক পাল্টাচ্ছে। আমাকেও উঠতে হল। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে কাপড় পাল্টে বেসিনে ধুয়ে নিলাম হাত-মুখ।

ঘণ্টা বেজে উঠল আবার। সারি বেঁধে দুজন করে নেমে এলাম আমরা, ঢুকলাম এসে ঠাণ্ডা স্কুলরুমটাতে। আলো খুব কম এঘরে। মিস মিলারের প্রার্থনা শেষে শুরু হল ক্লাস।

আজ সকাল থেকে আর বেল বাজেনি। ক্লাস চলতেই থাকল। মিস মিলার ঘুরে ঘুরে ক্লাস তদারক করলেন, এ সময় আবার বেজে উঠল ঘণ্টা। লাইন ধরে সকলে চললাম নাস্তার টেবিলে। অন্য ঘরে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার। কাল সারাদিন বলতে গেলে আমার পেটে কিছুই পড়েনি।

এ ঘরের ছাদটা নিচু। বিশাল ঘরটায় লম্বা দুটো টেবিল। কতগুলো গামলা রাখা আছে টেবিলে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তবে ওগুলো অনেকখানি দূরে থাকায় গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। লম্বা-চওড়া প্রার্থনা শেষে

গান ধরা হল। তারপর বসার সুযোগ পেলাম আমরা। একটা বাসনে পরিজ দেয়া হয়েছে আমাকে। দু-এক চামচ মুখে দিয়েই বুঝতে পারলাম বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে ওটা। ও জিনিস গেলার চেষ্টা করতে লাগল সকলেই। নাক কুঁচকে দু-এক চামচ অতিকষ্টে গিলে হাত গুটিয়ে বসে রইল প্রত্যেকে। নাস্তা সারলাম আমরা এভাবেই। এমন চমৎকার খাবারের জন্য স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হল। তারপর সকলে ফিরে গেলাম স্কুলরুমে।

ক্লাস শুরুর আগে মিনিট পনেরো সময় পেলাম আমরা। গল্পগুজব করার জন্যে। অনিবার্যভাবেই গল্পের প্রধান উপজীব্য হল সকালের জঘন্য নাস্তা।

স্কুলরুমের দেয়াল ঘড়িতে ন'টা বাজল। মিস মিলার ঘরে ঢুকে চিৎকার করলেন, 'সবাই চুপচাপ যে যার সিটে গিয়ে বস।'

আমরা ফিরে এলাম যার যার জায়গায়। খানিক বাদে গতকালের সেই ভদ্রমহিলা স্কুলরুমে এলেন। বড় মেয়েদের পড়াতে শুরু করলেন। মেয়েদের ফিসফিসানিতে বুঝলাম লোউড স্কুলের সুপারিন্টেডেন্ট তিনি। মিস টেম্পল নাম।

সময় যখন বারোটা তখন মিস টেম্পল গলা উঠিয়ে বললেন, 'মেয়েরা, আমার কিছু কথা ছিল।' সবার গুঞ্জন থেমে গেল তাঁর গলা শুনে। গুনগুন করে পড়ছিল সকলে। 'সকালে তোমরা নাস্তা খেতে পারনি। সবারই নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। দুপুরে তোমাদের জন্যে পাঁউরুটি আর পনিরের বন্দোবস্ত করেছি আমি,' বললেন তিনি।

ছাত্রী-শিক্ষিকা সকলেই অবাক হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। খুশি হয়েছে প্রত্যেকেই।

মিস টেম্পল রুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই পনির আর পাঁউরুটি এসে গেল। বিলি করা হল সকলের মাঝে। ছাত্রীদের খুশি আর ধরে না।

খাওয়া শেষে নির্দেশ এল, 'বাগানে চল।' অন্য সকলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমিও।

এতক্ষণে প্রায় কারও সাথেই কথা হয়নি আমার। কেউ যেন আমাকে খেয়ালই করেনি। একাই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। এ সময় কাছেই কাশল কে যেন। পেছনে ফিরে দেখি কাছেই পাথরের বেঞ্চিতে বসে রয়েছে একটা মেয়ে। ঝুঁকে বই পড়ছিল মেয়েটি। আমাকে চাইতে দেখে বলল, 'তুমি এতিম?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'আমার বাবা-মা দুজনই মারা গেছেন। আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই।'

'এখানকার সব মেয়েরই হয় বাবা না হয় মা নেই। অনেকের আবার কেউই নেই। তোমার মত।'

'এ স্কুলটা কি ওই লম্বা মত ভদ্রমহিলার, যিনি আমাদের পাঁউরুটি আর পনিরের কথা বললেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'মিস টেম্পল? না না। হলে তো ভালই হত। তাঁকে সব কিছুর জন্যে মিস্টার ব্রকলহার্স্টের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তিনিই সকলের খাবার আর কাপড় কিনে দেন।'

'কেন?'

'মিস্টার ব্রকলহার্স্ট হচ্ছেন এ স্কুলের কোষাধ্যক্ষ এবং ম্যানেজার। স্কুলটা তাঁর মা'র প্রতিষ্ঠিত। ফলে তিনিই এটার দেখাশোনা করেন।'

'তিনি এখানেই থাকেন?'

'না। মাইল দুয়েক দূরে বিশাল এক বাড়িতে থাকেন।'

'টিচারদের কেমন লাগে তোমার?'

'ভালই তো।'

'অনেকদিন ধরে আছ এখানে?'

'দু'বছর।'

'তুমিও কি এতিম?'

'আমার মা নেই।'

'কেমন লাগে স্কুলটা?'

'বড় বেশি প্রশ্ন কর তুমি। অনেক জবাব দিয়েছি আর নয়। এখন আমি পড়ব।'

কিন্তু ওর আর পড়া হল না। ঘণ্টা বেজে উঠল। স্কুলরুমে ফিরে গেলাম সকলে। ক্লাস চলল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। বিকেলের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বাগানের সেই মেয়েটিকে স্কুলরুমের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। শাস্তি দেয়া হয়েছে তাকে। ভেবে পেলাম না মেয়েটি কেমন। ভাল নাকি দুষ্টু।

পাঁচটা বাজার খানিক পরে ছোট এক মগ কফি আর আধ টুকরো করে বাদামি রুটি পেলাম। তৃপ্তির সাথে খেলাম আমি। অবশ্য এর তিনগুণ খাবার পেলে পেটটা ভরত। কি আর করা, পেটে খিদে নিয়েই থাকতে হল।

আধ ঘণ্টা খেলাধুলার সুযোগ দেয়া হল আমাদের। তারপর আবার পড়া; পানির গ্লাস আর ওটকেক, প্রার্থনা এবং সবশেষে বিছানা।

লোউড এতিমখানায় প্রথম দিনটা এভাবেই কাটল আমার।

চার

লোউড স্কুলের প্রথম দু-তিন মাস আমার কাছে দু-তিন বছরের মত লাগল। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের কিছুদিন প্রচুর তুষারপাত হল। আমরা প্রায় গৃহবন্দী হয়ে গেলাম বলা যায়। ঠাণ্ডায় প্রচণ্ড কষ্ট পেলাম সকলে। বুট নেই। ফলে জুতোর মধ্যে তুষার ঢুকে গলে যায়। দস্তানা না থাকার কারণে ব্যথায় ফুলে উঠল হাত। অসাড় হয়ে এল প্রায়। পায়ের অবস্থাও তাই। এ কয়েক মাস খুবই সামান্য পরিমাণ খাবার দেয়া হল আমাদের।

একদিন বিকেলে স্লেট হাতে নিয়ে বসে রয়েছি আমি। একটা অঙ্ক মেলাতে চেষ্টা করছি। হঠাৎ চোখ পড়ল জানালায়। চেয়ে দেখি মিস্টার ব্রকলহার্স্ট যাচ্ছেন। তাঁকে আগের চেয়ে লম্বা আর শুকনো দেখাচ্ছে।

মিনিট দুয়েক পরেই স্কুলরুমে ঢুকলেন তিনি। মিস টেম্পলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সামনের দিকের বেঞ্চিতে বসার কারণে তাঁর প্রায় সব কথাই শুনতে পেলাম আমি।

'মিস টেম্পল, হাউসকিপারের মুখে শুনলাম গত দু-সপ্তাহে দু-দিন নাকি দুপুরে পাঁউরুটি আর পনির দেয়া হয়েছে মেয়েদের। কেন? আমাদের এখানে এ নিয়ম নেই। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি! এটা চালু করল কে?'

'আমি, স্যার,' মৃদু স্বরে বললেন মিস টেম্পল 'ওরা সকালে ভালমত নাস্তা খেতে পারেনি দু'দিন। খাবারটা পুড়ে গিয়েছিল। তাই আর কি…'

কথাটা মোটেও পছন্দ হল না মিস্টার ব্রকলহার্স্টের। 'ম্যাডাম,' কঠিন গলায় বললেন তিনি। 'আমি দেখতে পাচ্ছি ওদের বেশি বেশি খাইয়ে পেটুক বানানো হচ্ছে। এটা আমি চাই না। আমি চাই ওরা কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্যবতী মেয়ে হিসেবে গড়ে উঠুক।'

কথা শেষ হলে পর তিনি স্কুলরুমের সর্বত্র দৃষ্টি বোলালেন, তাঁর চোখজোড়া আচমকা পিটপিট করে উঠল। তাঁর মুখ দেখে মনে হল চমকে উঠেছেন কিছু দেখে।

'মিস টেম্পল,' ডাকলেন তিনি। 'ওই যে ওই কোঁকড়া চুলের মেয়েটা কে? লাল কোঁকড়া চুল। ছড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটা কে?'

ছড়িটা তুলে যেন ভয়ঙ্কর কোন কিছু দেখালেন তিনি। হাতটা কাঁপতে লাগল তাঁর।

‘ও জুলিয়া সেভার্ন,’ শান্তস্বরে জবাব দিলেন মিস টেম্পল।

‘ওর চুল কোঁকড়া কেন? আপনি জানেন না কোঁকড়া চুল পছন্দ করি না আমি?’

‘ওর চুল তো আপনা থেকেই কোঁকড়া, নরম সুরে বললেন মিস টেম্পল।

‘আপনা থেকেই! আমি বারবার বলেছি মেয়েদের চুল ছোট থাকবে। সুন্দর করে বেঁধে রাখতে হবে। কালই নাপিত পাঠিয়ে দেব আমি। ওই মেয়েটার সব চুল কেটে ফেলতে হবে। অন্য আরও অনেকের লম্বা চুল আছে দেখছি। মিস টেম্পল, প্রথম সারির সব মেয়েকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলুন।’

মিস টেম্পল নির্দেশ দিলেন, বড় মেয়েরা তাঁর কথামত দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। অনেকের চোখে-মুখেই বিরক্তি ফুটে উঠেছে। তবে সেটা অবশ্যই মিস্টার ব্রকলহার্স্টের আড়ালে। সবার চুল পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি। দূর থেকে। আমরা ওদিকে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। ভেতর ভেতর সকলেই উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ। এবার ফাঁসির আদেশ দেয়ার মত শোনাল মিস্টার ব্রকলহার্স্টের কণ্ঠ।

‘সবার চুল ছোট করে ফেলতে হবে।’

কিছু একটা বলার জন্যে মিস টেম্পল মুখ খুললেন। কিন্তু হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন মিস্টার ব্রকলহার্স্ট।

‘ম্যাডাম,’ বললেন তিনি। ‘এ ব্যাপারে কোন কথা শুনতে চাই না আমি। মানুষকে চুল দেখিয়ে বেড়াচ্ছে এরা। প্রত্যেকের বেণী কেটে ফেলতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করলাম–’

থেমে গেলেন তিনি। তিন ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন এ সময়। প্রত্যেকের পরনে চমৎকার, দামি পোশাক। তিনজনের চুলই লম্বা, কোঁকড়ানো। আমার পাশে বসা মেয়েটি ফিসফিস করে জানাল, এঁরা সবাই মিস্টার ব্রকলহার্স্টের পরিবারের সদস্য।

মিস্টার ব্রকলহার্স্ট ফিরে ওঁদের উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন। ঠিক সে মুহূর্তে আমার হাত থেকে খসে পড়ে গেল স্লেটটা। সশব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ঘরের প্রত্যেকের দৃষ্টি এখন আমার ওপর। ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োনর জন্যে ঝুঁকে পড়তেই শুনলাম মিস্টার ব্রকলহার্স্টের চিৎকার, ‘অসতর্ক মেয়ে কোথাকার!’ তারপর বললেন, ‘ও, জেন আয়ার দেখছি! ওর সম্বন্ধে সবাইকে কিছু জানানো দরকার। এদিকে এস তো, মিস আয়ার!’

ভয়ে হাত-পা জমে গেল আমার। নড়াচড়া ভুলে গেলাম। দুটো বড় মেয়ে আমার দু'পাশে বসে ছিল। ওরাই আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর ঠেলে দিল সেই ভয়ঙ্কর বিচারকের দিকে।

মিস টেম্পল এগিয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন মিস্টার ব্রকলহার্স্টের কাছে। ফিসফিস করে সান্ত্বনা দিলেন তিনি, 'ভয় পেয়ো না, জেন। ইচ্ছে করে তো আর ভাঙনি। উনি তোমায় কিছু বলবেন না।'

তাঁর মধুর কথাগুলো ছুরির মত বিঁধল আমার বুকে।

কারণ আমি জানি মিনিটখানেকের মধ্যেই আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবেন তিনি। মিস্টার ব্রকলহার্স্ট, তাঁর পরিবার আর মিসেস রীডের প্রতি তীব্র ক্রোধ অনুভব করলাম আমি।

'টুলটা নিয়ে এস,' আঙুল দিয়ে উঁচু একটা টুলের দিকে দেখালেন মিস্টার ব্রকলহার্স্ট।

আনা হল টুল।

'ওকে এটার ওপর দাঁড় করাও।'

আমাকে দাঁড় করানো হল টুলের ওপর। কে করল জানি না। আমার পাশে দাঁড়ালেন মিস্টার ব্রকলহার্স্ট।

'ভদ্রমহিলারা,' পরিবারের সদস্যদের দিকে ফিরে বললেন তিনি। 'মিস টেম্পল, শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ এবং মেয়েরা–এই মেয়েটিকে দেখুন আপনারা।'

দেখল সবাই। আমার গায়ের চামড়া যেন পুড়ে যেতে লাগল ওদের চাহনিতে।

'দেখতেই পাচ্ছেন মেয়েটি ছোট। তবে জানিয়ে রাখা ভাল ছোট হলেও দুষ্টের শিরোমণি ও। ওর মামী তাই বলেছেন আমাকে। ওর কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে সকলকে। মেয়েরা, তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না। ওকে খেলায় নেবে না। শিক্ষয়িত্রীদের বলছি, ওর ওপর নজর রাখবেন। মেয়েটি মিথ্যুক!'

'বলে কি!' মিস্টার ব্রকলহার্স্টের এক আত্মীয়াকে ফিসফিস করে বলতে শুনলাম আমি।

'ওর মামী ওকে ভাল হওয়ার জন্যে এখানে পাঠিয়েছেন,' বলে চললেন মিস্টার ব্রকলহার্স্ট, 'আমাদের সকলের দায়িত্ব সে দিকটাতে লক্ষ রাখা।'

ঘুরলেন তিনি। তিন ভদ্রমহিলা ততক্ষণে রওনা দিয়েছেন দরজার দিকে। মিস্টার ব্রকলহার্স্ট আবার ফিরে তাকালেন ক্লাসরুমের দিকে।

'আরও আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে ও,' বললেন তিনি। 'আর আজ কেউ কথা বলবে না ওর সঙ্গে।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লজ্জায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলাম আমি। এ সময় বাগানের সেই মেয়েটি, যার নাম হেলেন বার্নস উঠে এল। মিস স্মিথকে পড়ার কি যেন কথা জিজ্ঞেস করে ফেরার পথে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। কী চমৎকার সেই হাসি! ঠিক যেন কোন পরী হাসল। সান্ত্বনা দিচ্ছে আমায়। অনেকখানি সাহস ফিরে পেলাম। সে মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম একা নই আমি। আমার একজন বন্ধু আছে।

আমার শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পাঁচটা বেজে গেল। মেয়েরা সব চলে গেল চা খেতে। ভাবলাম এখন বোধহয় টুল থেকে নেমে পড়া যায়। তাই করলাম আমি। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। এক কোণে গিয়ে মেঝেতে বসে পড়লাম। কাঁদতে লাগলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মনে হল মরে যাওয়াই ভাল আমার। চোখ মুছে তাকাতেই দেখি হেলেন বার্নস দাঁড়িয়ে রয়েছে কাছে। আমার জন্যে কফি আর পাঁউরুটি নিয়ে এসেছে।

'খেয়ে নাও,' বলল সে।

আমি কিছু না বলে কাঁদতে লাগলাম। ভেউ ভেউ করে। আমার পাশে বসে পড়ল ও। দু'হাত দিয়ে নিজের হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে তাতে রাখল মাথাটা। ওকে দেখে সে সময় মনে হল ঠিক যেন কোন ভারতীয় বসে রয়েছে আমার পাশে। চুপ করে বসে ধ্যান করছে। নীরবতা ভাঙলাম আমিই প্রথম। 'হেলেন, একটা মিথ্যুক মেয়ের পাশে কেন বসে রয়েছ তুমি?' বললাম আমি।

'কে বলল তুমি মিথ্যুক? তোমার জন্যে প্রত্যেকের দুর্বলতা আছে। মিস্টার ব্রকলহার্স্টকে কেউ পছন্দ করে না। তাছাড়া, জেন–' থামল সে।

'বল, হেলেন,' ওর হাতে হাত রেখে বললাম আমি।

'আমাকে তোমার বন্ধু ভাববে,' সহজ ভাবে বলল সে।

হেলেনের কাঁধে মাথা রাখলাম আমি। একহাতে জড়িয়ে ধরলাম ওর কোমর। আমরা বসে রইলাম চুপ করে। পাশাপাশি।

মনে হল লোউডের দুঃখ কষ্ট আমার কাছে গেটশেডের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয়। কেউ আমাকে গেটশেডের প্রাচুর্যের মধ্যে ফিরে যেতে বললেও যাব না আর। কারণ জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের একজন বন্ধু খুঁজে পেয়েছি আমি।

পাঁচ

লোউড এখন আর আগের মত খারাপ লাগে না আমার। এরই ফাঁকে বসন্ত এল। ফুলে ফুলে ভরে উঠল বাগান। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে হেলেন আর আমি বেড়াতে বেরোই। বৃহস্পতিবার আমাদের হাফ ডে।

রাস্তার দুপাশে চোখে পড়ে চমৎকার সব ফুল। ফুটে রয়েছে ঘন ঝোপের মাঝে।

এক জংলা উপত্যকায় লোউড। তারই মাঝখানে স্কুল ভবনটি। স্যাঁতসেঁতে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব গোটা এলাকা জুড়ে। এই কুয়াশাই রোগ নিয়ে এল। বসন্ত আসতেই লোউড এতিমখানা টাইফাসে আক্রান্ত হল। মে মাস আসার আগেই–হাসপাতালে পরিবর্তিত হল লোউড স্কুল।

অপর্যাপ্ত খাবার এবং শীতের সময়কার অবহেলার কারণে বেশির ভাগ ছাত্রীই খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। আশি জনের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ জনই শয্যাশায়ী হল একই সময়ে। ছুটি দেয়া হল ক্লাস। ফলে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে লাগলাম আমরা। যাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব আছে তারা চলে গেল স্কুল ছেড়ে। অসুস্থদের অনেকেই মারা গেল স্কুলেই এবং তাদের কবরও দেয়া হয়ে গেল দ্রুত। অনেকে যেন কেবল মারা যাওয়ার জন্যেই যার যার বাড়িতে ফিরে গেল। লোউডের নিত্যসঙ্গী এখন মৃত্যু। কিন্তু বিষণ্নতা আর ভীতি যখন জেঁকে বসেছে লোউডের বিভিন্ন প্যাসেজে, রুমে এবং হাসপাতালের গন্ধ ছাড়া যখন আর কিছু ভাবতে পারছি না আমরা তখন সূর্য ঔজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছে পাহাড়ের গায়ে, জঙ্গলে। আমরা যারা সুস্থ ছিলাম তারা প্রাণভরে উপভোগ করে নিলাম প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতাম আমরা। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতাম। যা খুশি তাই করতাম। বাধা দেয়ার কেউ নেই।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল হেলেন। ওকে ওপর তলার একটা ঘরে আটকে রাখা হল। স্কুলের যে অংশে এখন হাসপাতাল সেখানে রাখা হল না কারণ আর সবার মত টাইফাস হয়নি ওর। ও ভুগছে ক্ষয়রোগে। আমার কেন যেন মনে হল ঠিকমত সেবা শুশ্রূষা পেলেই ভাল হয়ে যাবে ও।

কোন কোনদিন বিকেলে বাগানে বসে থাকতে দেখতাম ওকে। তবে

ওর সঙ্গে দেখা করার বা কথা বলার অনুমতি ছিল না আমার।

জুন মাসের গোড়ার দিকে এক বিকেলে মেরী অ্যান উইলসন নামে এক মেয়ের সঙ্গে বনে বেড়াতে গেলাম আমি। চলে গেলাম অনেক দূর। ফলে পথ হারিয়ে ফেললাম। ফেরার পথে দেখি চাঁদ উঠেছে আকাশে। ফিরে দেখলাম বাগানের গেটের কাছে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পরিচিত ঘোড়া। ডাক্তার বেটসের।

'কেউ নিশ্চয় অসুস্থ,' বিষণ্ন মুখে বলল মেরী, 'তা নাহলে এ সময়ে ডাক্তার বেটসকে ডাকা হত না।'

ও ঢুকে পড়ল বাড়িতে। আর বন থেকে তুলে আনা গোটা কয়েক শিকড় পুতে দেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ বাগানে থাকতে হল আমাকে। সদর দরজা খোলার শব্দ পেলাম এ সময়।

বেরিয়ে এলেন ডাক্তার বেটস, সঙ্গে একজন নার্স। ঘোড়ায় চেপে ডাক্তার রওনা হতেই নার্স ফিরে গেল স্কুলের দিকে। সে দরজা বন্ধ করে দেয়ার আগেই দৌড়ে গেলাম আমি।

'হেলেন বার্নস কেমন আছে?' জানতে চাইলাম।

'ভাল নয়,' বলল নার্স। 'ডাক্তার বলেছেন আর বেশিদিন এখানে থাকতে পারবে না ও।'

ওর বলার ধরনে বুঝে গেলাম আমি। হেলেন তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছে এখন। প্রচণ্ড ভীতি অনুভব করলাম। সেই সঙ্গে তীব্র কষ্ট আর ওর সঙ্গে দেখা করার আকুলতা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন ঘরে রয়েছে ও?'

'মিস টেম্পলের ঘরে,' নার্স জানাল।

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'সম্ভব নয়। ভেতরে চলে এস তুমি। কুয়াশা পড়ছে। বাইরে থাকলে জ্বর হবে।'

আমি পাশের দরজা দিয়ে স্কুলরুমে ঢুকে পড়লাম। নার্স বন্ধ করে দিল সদর দরজা। তখন ন'টা বাজে। মিস মিলারকে দেখলাম মেয়েদের শুতে যেতে বলছেন। সে রাতে কিছুতেই ঘুম এল না আমার। ঘণ্টা কয়েক বাদে চুপিসারে বিছানা থেকে নামলাম আমি। নাইটড্রেসের ওপর ফ্রকটা চাপিয়ে মিস্ টেম্পলের ঘরের দিকে চললাম। হেলেনের সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমাকে, যে করে হোক।

খুঁজে পেলাম মিস টেম্পলের ঘর। দরজার তলা দিয়ে আলো চোখে পড়ল। চারদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। দরজাটা খুলে ভেতরে চাইলাম আমি।

মিস টেম্পলের বিছানার কাছ ঘেঁষেই ছোট একটা খাট চোখে পড়ল। সাদা পর্দা দিয়ে অর্ধেকটা ঢাকা। লেপের নিচে একটা অবয়ব দেখতে পেলাম। তবে পর্দার কারণে নজরে এল না মুখটা। সেই নার্সটিকে দেখলাম খাটের পাশে ইজি চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে। পা টিপে টিপে খাটের দিকে এগোলাম আমি। পর্দা সরাতে গিয়ে পিছু হটে এলাম। ভয়ে। আগে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে হেলেন বেঁচে আছে। নইলে হয়তো লাশ দেখতে হতে পারে আমাকে।

'হেলেন,' ফিসফিস করে ডাকলাম আমি, 'জেগে আছ?'

নড়ে উঠল হেলেন, সরিয়ে দিল পর্দা। ওর মুখটা দেখতে পেলাম এবার আমি। মলিন, ফ্যাকাসে।

'জেন, তুমি!' সেও ফিসফিস করে বলল।

'যাক!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবার। হেলেন মারা যাচ্ছে না। ডাক্তার ভুল বলেছে। যারা মারা যাবে তারা কি এত শান্ত স্বরে কথা বলতে পারে?

খাটে উঠে ওকে চুমু খেলাম আমি। অনুভব করলাম ওর গাল-কপাল কেমন যেন ঠাণ্ডা, রোগাটে। হাত দুটোর অবস্থাও তাই। ম্লান হাসল ও।

'কেন এসেছ, জেন? এখন তো অনেক রাত।'

'তোমাকে দেখতে। একটুও ঘুম আসছিল না আমার। তোমার সঙ্গে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।'

'ঠিক সময়েই এসেছ তুমি। নইলে আর দেখা হত না।'

'কেন, হেলেন, কোথাও যাচ্ছ নাকি? বাড়িতে চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। বহু দূর যেতে হবে আমাকে। চিরদিনের মত—আমার শেষ বাড়িতে।'

'না, না, হেলেন—'

থেমে গেলাম আমি। চোখের পানি যখন লুকোতে চেষ্টা করছি তখন কাশতে লাগল হেলেন। নার্স শুনতে পেল না। ঘুমে বিভোর সে। কাশি থামলে শুয়ে পড়ল হেলেন। ক্লান্ত। ফিসফিস করে বলল, 'জেন, তুমি খালি পায়ে এসেছ। ঠাণ্ডা লাগবে, লেপের তলায় শুয়ে পড়।'

ওর পাশে শুয়ে পড়লাম আমি। আমাকে একহাতে জড়িয়ে ধরল হেলেন। ওর গা ঘেঁষে শুয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ নীরবতার পর আবার ফিসফিস করে উঠল হেলেন, 'আমি খুব সুখী, জেন। আমি মারা গেলে একটুও দুঃখ করতে পারবে না কিন্তু। জান, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। মরতে তো একদিন হতই।'

হেলেনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম আমি। ওকে এখনকার মত আপন আর কখনও লাগেনি। মনে হচ্ছে যে ভাবে হোক ওকে ধরে রাখব আমি। রাখবই। কিছুতেই মরতে দেব না।

'কি শান্তি! শেষবারের কাশিটা একেবারে কাহিল করে দিয়ে গেছে। বড় ঘুম পাচ্ছে আমার। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, জেন। আমার কাছে থাক।'

'থাকব, হেলেন, কোথাও যাব না।'

'ঠাণ্ডা লাগছে না তো তোমার?'

'না।'

'গুড নাইট, জেন।'

'গুড নাইট, হেলেন।'

আমাকে চুমু খেল হেলেন। আমিও চুমু খেলাম ওকে। ঘুমিয়ে পড়লাম দুজনেই।

ঘুম ভাঙতে দিনের আলো চোখে পড়ল। কে যেন কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। সেই নার্সটি। আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে।

পরে জানতে পারলাম ভোরবেলা মিস টেম্পল তাঁর ঘরে ফিরে এসেছিলেন। সারারাত একজন অসুস্থ ছাত্রীর পরিচর্যা শেষে। আমাকে তিনি হেলেনের খাটে শুয়ে থাকতে দেখেন। হেলেনের কাঁধে ছিল আমার মাথা। দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলাম ওর গলা। আমি তখন ঘুমের রাজ্যে আর হেলেন—তার শেষ বাড়িতে।

ব্রকলব্রিজ কবরস্থানে দাফন করা হল হেলেনকে। ও মারা যাওয়ার পর আগাছায় ছেয়ে গিয়েছিল কবর। আলাদা করে চেনা যেত না। এখন অবশ্য মাথার দিকটাতে মার্বেল পাথরে খোদাই করা আছে হেলেনের নাম।

প্রিয় বান্ধবীর জন্যে এটুকু করেছি আমি।

ছয়

জনা ত্রিশেক মেয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লোউড থেকে বিদায় নিল টাইফাস জ্বরের জীবাণু। মৃতের সঠিক সংখ্যা জানাজানি হওয়ার পর লোকের দৃষ্টি পড়ল স্কুলটার ওপর। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, এতগুলো মেয়ে একসঙ্গে একই জায়গায় মারা গেল কেন? কতগুলো উত্তরও বেরিয়ে এল।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপর্যাপ্ত খাবার, শীতের সময় গরম কাপড়-চোপড়ের অভাব, দূষিত পানি—এসবই এতগুলো মৃত্যুর কারণ।

এলাকার বেশ কয়েকজন ধনী ব্যক্তি প্রচুর অনুদান দিলেন। কাছেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নতুন স্কুল ভবন তৈরি করার জন্যে। নতুন ভবন তৈরির পর যথাসময়ে সেখানে চলে গেলাম আমরা। উন্নত হল আমাদের খাবার আর কাপড়ের মান। পুরানো স্কুলটার চেয়ে নতুনটা সবদিক দিয়েই অনেক আরামপ্রদ।

আটটা বছর এ স্কুলে কাটালাম আমি। ছাত্রী হিসেবে ছ বছর আর বাকি দু বছর শিক্ষিকা হিসেবে। এ আটটা বছর খুব একটা খারাপ কাটেনি। কিন্তু এর পরপরই আমার জীবনটা কেমন যেন বদলে গেল।

আমার অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী মিস টেম্পল একজন ধর্মযাজককে বিয়ে করে চলে গেলেন বহু দূরের এক জেলায়। হারিয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে।

মিস টেম্পলকে আমি মায়ের জায়গায় বসিয়েছিলাম। শুধু তাই নয় পরের দিকে তিনি বান্ধবীর মত আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

মিস টেম্পল যেদিন সন্ধ্যায় স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন, মনে আছে সেদিন জানালা খুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। দৃষ্টি চলে গিয়েছিল স্কুল সীমানার বাইরে। সাদা একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বহু দূর। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলাম আমি। দুঃখ হল কেন আরও বেশি দেখা যায় না এখান থেকে।

গত আটটা বছরে বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে খুব সামান্যই জেনেছি আমি। স্কুলেই কাটিয়েছি সব ছুটি। গেটশেড ছেড়ে চলে আসার পর মামী আর যোগাযোগ রাখেননি আমার সঙ্গে। চিঠি দেননি। আসেননি। কাউকে পাঠানওনি।

হঠাৎ একদিন মনে হল নতুন কোন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, নতুন মানুষদের মাঝে চলে যেতে পারলে ভালই তো হত।

কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব? এর জবাব জানা নেই আমার।

সেদিন রাতে শুয়ে রয়েছি বিছানায়। চোখে ঘুম নেই। হঠাৎই মাথায় এসে গেল জবাবটা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। এই বলে যে শিক্ষিকা বা গভর্নেস পদে চাকরি চাই।

পরদিন ভোরে উঠে পড়লাম আমি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তৈরি করে ফেললাম বিজ্ঞাপন। আমাদের জেলার কাগজের ঠিকানায় পোস্ট করে দিলাম ওটা।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। অবশেষে সপ্তাহখানেক বাদে জবাব এল। খামের ওপর দেখলাম F লেখা। প্রেরকের নামের আদ্যাক্ষর বোধহয়। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত।

'যদি J. E., অর্থাৎ যিনি গত বৃহস্পতিবার "শায়ার হেরাল্ড" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তিনি তাঁর চরিত্র ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রশংসাপত্র প্রদান করতে পারেন তবে তাঁকে দশ বছরের কম বয়সী একটি মেয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। বেতন বছরে ত্রিশ পাউণ্ড। J. E. কে তাঁর কাগজপত্র নিচের ঠিকানায় পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করছি।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স,
থর্নফিল্ড হল,
মিলকোট।'

হাতের লেখা দেখে মনে হল কোন বয়স্কা ভদ্রমহিলা হবেন হয়ত। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স! কল্পনায় ভেসে উঠল কালো গাউন পরা এক বিধবার ছবি। থর্নফিল্ড হল! বিলাসবহুল কোন জায়গা হবে নিঃসন্দেহে। মিলকোট সম্বন্ধে অবশ্য জানা ছিল আমার। বর্ধিষ্ণু শহর। মনে মনে এরকম একটা জায়গাই খুঁজছিলাম আমি। যেখানে জীবন থেমে থাকবে না। আর সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব আমিও।

দুএকদিনের মধ্যেই স্কুলের ইন্সপেক্টর আর সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিয়ে সই করিয়ে পাঠিয়ে দিলাম প্রশংসাপত্র। উত্তরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। উত্তর এল, দু সপ্তাহের মধ্যে আমাকে গভর্নেসের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। দু সপ্তাহ বাদে কোচে চেপে বসলাম আমি। রওনা দিলাম মিলকোটে থর্নফিল্ডে আমার নতুন জীবন শুরু করার জন্যে।

আগেই জানতাম মিলকোটের জর্জ সরাইখানায় একজন দেখা করবে আমার সঙ্গে। ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন আঁধার হয়ে গেছে এদিক ওদিক চাইলাম আমি। আশা করলাম নাম ধরে ডাকবে কেউ। কাউকে দেখলাম না। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোন ক্যারিজও আসেনি

আমাকে সরাইখানার একটা ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল মনের মধ্যে ভয় আর অনিশ্চয়তা নিয়ে সেখানে বসে রইলাম আমি। এসময় এক ওয়েটার এসে ঢুকল ঘরে।

'আপনি কি মিস আয়ার?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ।'

'আপনার জন্যে একজন অপেক্ষা করছেন।'

একলাফে উঠে দাঁড়ালাম আমি। তড়িঘড়ি ছুটে গেলাম প্যাসেজে। খোলা দরজার কাছে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওর পেছনে আবছাভাবে ক্যারিজটাও চোখে পড়ল। প্যাসেজে রাখা আমার ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে জানতে চাইল সে, 'আপনার নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। ট্রাঙ্কটা কোচে তুলল লোকটি। বলে রাখা ভাল, এটি আমার সেই ট্রাঙ্ক। আট বছর আগে যেটি নিয়ে এসেছিলাম গেটশেড থেকে। কোচে উঠে পড়লাম আমি। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আবছা অন্ধকার চিরে গন্তব্যে ছুটে চলল কোচ।

ঘণ্টাখানেক বাদে পৌঁছলাম আমরা। কোচোয়ান নেমে দু পাল্লার একটা গেট খুলে দিল। আমরা গেটটা অতিক্রম করতেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল ওটা। লম্বা রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে থামল কোচ। বাড়িটার সামনের দিকে বিশাল খোলা জায়গা।

একটামাত্র জানালায় মোমবাতি জ্বলতে দেখলাম। একটি কাজের মেয়ে খুলে দিল সদর দরজা। কোচ থেকে নেমে ওর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম আমি। বিশাল একটা হলরুম পেরিয়ে দরজার কাছে গিয়ে থামলাম আমরা। মেয়েটি দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকে পড়ল আমাকে নিয়ে। এ ঘরের ফায়ারপ্লেসে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। তার পাশে বেঁটে-খাট, বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন। উল বুনছেন। আমাকে দেখে উঠে এলেন তিনি। 'কোন কষ্ট হয়নি তো? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। ঠাণ্ডা লাগছে? এস, আগুনের কাছে এস।' মিষ্টি হেসে নরম সুরে বললেন তিনি কথাগুলো।

'আপনি নিশ্চয়ই মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ঠিকই ধরেছ। বস, প্লীজ।'

আমি বসতেই কাজের মেয়েটিকে আমার জন্যে খাবার নিয়ে আসতে বললেন তিনি।

'আপনার মেয়েকে কি আজ থেকেই পড়ানো শুরু করব?' খাওয়া শেষ হতে জানতে চাইলাম আমি।

'আমার মেয়ে!' অবাক হয়ে গেলেন তিনি, 'ও আচ্ছা, মিস ভ্যারেনসের কথা বলছ তুমি। হ্যাঁ, ওকেই পড়াতে হবে।'

'ও আপনার মেয়ে নয়?'

'না, আমার কেউ নেই। আমি একা।' আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা অভদ্রতা হবে ভেবে চুপ করে রইলাম আমি। পরে আস্তে আস্তে জানা যাবে সব।

'তোমাকে আর বসিয়ে রাখব না। চল, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই,'

বললেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স।

তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম আমি।

মোমবাতি হাতে আমাকে দোতলায় নিয়ে এলেন তিনি। রেলিং আর সিঁড়ির ধাপগুলো ওক কাঠের তৈরি। বেডরুমটায় ঢুকে মনে হল যেন কোন গির্জায় ঢুকেছি। তবে ঘরটা পছন্দ হয়ে গেল আমার। ঘরের আসবাবপত্রগুলো সাধারণ হলেও আধুনিক।

আমাকে গুড নাইট বলে বিদায় নিলেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স।

নিজের একটা আশ্রয় পেয়েছি আমি। নিরাপদ আশ্রয়। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মনটা। বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা সেরে নিলাম। বেশিক্ষণ আর জাগতে পারলাম না সে রাতে। ঘুমে জড়িয়ে আসছে দুচোখ। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে গেলাম ঘুমের রাজ্যে। ঘুম ভাঙতে দেখি দিনের আলো ঝলমল করছে চারদিকে।

বিছানা ছেড়ে কাপড় পাল্টে নিলাম। ওক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে, হলরুমে। হলরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। খোলা লনে। বাড়িটা তিন তলা, এবার দেখলাম আমি। একটা বসতি রয়েছে বেশ অনেকটা দূরে। তার পেছনে এ বাড়িটা। দূরে পাহাড়ও চোখে পড়ল। অনেকগুলো। তবে লোউডের মত উঁচু নয় ওগুলোর চূড়া। তবু সবগুলো মিলে যেন ঘিরে রেখেছে গোটা মিলকোট শহরটাকে। চোখ জুড়িয়ে গেল আমার।

এসময় মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স দরজায় এলেন। তাঁকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

'বাহ্! এত সকালেই উঠে পড়েছ? কেমন লাগছে থর্নফিল্ড?' জানতে চাইলেন তিনি।

'দারুণ!' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, তা লাগারই কথা। তবে মিস্টার রচেস্টারের উচিত মাঝে সাঝে এখানে এসে থাকা। তিনি যত্ন না নিলে বেশিদিন টিকবে না বাড়িটা।'

'মিস্টার রচেস্টার!' অবাক হয়ে বললাম, 'কে তিনি?'

'এ বাড়ির মালিক,' শান্ত স্বরে বললেন ভদ্রমহিলা, 'কেন, তাঁর নাম শোনোনি?'

'আমি ভেবেছিলাম,' বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে বললাম, 'বাড়িটা আপনার।'

'আমার? বল কি তুমি! আমি তো এ বাড়ির হাউজকীপার! মিস্টার রচেস্টারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।'

'আর যাকে পড়াব সে কে?'

'মিস্টার রচেস্টারের পালিত মেয়ে। মেয়েটির জন্যে গভর্নেস খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি আমাকে। ওই যে, নার্সের সঙ্গে আসছে ও।'

ফিরে দেখি দৌড়ে আসছে একটা মেয়ে। পেছনে নার্স। সাত-আট বছর বয়স বড় জোর। পাতলা গড়ন। রোগাটে মুখ। তবে চুলগুলো বড় চমৎকার। কোঁকড়া। নেমে এসেছে কোমরের কাছে।

'গুড মর্নিং, মিস এডেল,' বললেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। 'এদিকে এস, ইনি তোমার টিচার। তোমাকে পড়াবেন।'

মেয়েটি দ্রুত ফিরল তার নার্সের দিকে। ফরাসি ভাষায় কি যেন বলল।

'ওরা বিদেশী?' কৌতূহলী হলাম আমি।

'নার্সটা বিদেশী। এডেলের জন্ম ফ্রান্সে। ভাল ইংরেজি বলতে পারে না ও, আমি অন্তত বুঝি না। তবে মনে হয় তুমি বুঝবে।'

ভাগ্য ভাল লোউডে ফরাসি ভাষা শিখেছিলাম। এবার কাজে লেগে যাবে। এডেলের সঙ্গে হাত মেলালাম আমি। কথাবার্তা শুরু করলাম ওর ভাষাতেই। প্রথমদিকে খানিকটা গুটিয়ে ছিল ও। কিন্তু নাস্তার টেবিলে বসতেই কথার ফুলঝুরি ছুটল ওর মুখে। মা মারা যাওয়ার পর ফ্রেডেরিক দম্পতির কাছে থাকত ও। তারপর মিস্টার রচেস্টার ওকে নিয়ে এসেছেন ইংল্যাণ্ডে।

নাস্তা সেরে দুজনে লাইব্রেরিতে গেলাম। এ ঘরেই পড়াব ওকে আমি। সারাটা সকাল পড়ালাম। চমৎকার কেটে গেল সময়। দুপুর হয়ে এলে এডেলকে পাঠিয়ে দিলাম ওর নার্সের কাছে। সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সময় মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স ডাকলেন আমাকে। হলরুম থেকে জানতে চাইলেন পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখতে চাই কিনা আমি। সানন্দে রাজি হলাম। ওপর-নিচ ঘুরে ঘুরে দেখালেন তিনি আমাকে। চমৎকার করে সাজানো তিন তলার শোবার ঘরগুলো। আলো-আঁধারির খেলা ওগুলোতে। দিনের আলোয় দারুণ দেখাচ্ছে।

'কারা থাকে এখানে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেউ না। তবে ভূত থাকা অসম্ভব নয়।'

'এ বাড়িতে ভূত আছে নাকি?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলাম আমি।

'শুনিনি কখনও, পাল্টা হেসে বললেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স।

সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে আমাকে নিয়ে চিলেকোঠায় উঠে এলেন তিনি। তারপর মই বেয়ে উঠে গুপ্ত দরজা দিয়ে সোজা বাড়ির ছাদে চলে এলাম আমরা। পাঁচিলে শরীরের ভার রেখে নিচে তাকালাম আমি। মাঠগুলোকে

ঠিক যেন মানচিত্রের মত দেখাচ্ছে এখান থেকে। বড় মনোরম সেই দৃশ্য। খানিক বাদে ছাদ থেকে চিলেকোঠায় নেমে এলাম আমি। জায়গাটা কবরের মত অন্ধকার।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকে গুপ্ত দরজাটা বন্ধ করার জন্যে মইয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল একটুক্ষণ, আমি আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে সরু সিঁড়িটা বেয়ে নেমে এলাম তিন তলায়।

দাঁড়ালাম যেখানটাতে সেটা একটা লম্বা প্যাসেজ। আঁধার মত প্যাসেজটা। দু পাশে কালো দরজার সারি। সবগুলোই বন্ধ মনে হল। প্রাচীন কোন দুর্গের করিডরে এসে দাঁড়িয়েছি যেন।

ধীর পায়ে এগোতেই কানে এল একটা শব্দ। কে যেন হাসছে। নিচু স্বরে, নিষ্প্রাণ গলায়। হাসিটা ভুতুড়ে ঠেকল আমার কানে। এমন নিস্তব্ধ জায়গায় কে হাসতে পারে? কোথাও কেউ আছে বলে তো মনে হয়নি একবারও। অথচ হাসিটা স্পষ্ট শুনেছি আমি। থমকে দাঁড়ালাম। থেমে গেল শব্দটা। কেবল এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর শুরু হল আবার। এবার আগের চেয়ে জোরে। তীক্ষ্ণ হাসিটা প্রতিটি বন্ধ ঘরে যেন প্রতিধ্বনি তুলল। মুহূর্ত দুয়েক চুপচাপ। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আবছা অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স বলেছিলেন এ ঘরগুলো খালি পড়ে আছে। বলেছিলেন থর্নফিল্ডে ভূত নেই। কিন্তু যে ঘরটা থেকে হাসির শব্দ এসেছে তিনি চাইলে সেটার দরজাটা দেখিয়ে দিতে পারি আমি। প্রমাণ করতে পারি থর্নফিল্ডে ভূত আছে কি নেই।

সাত

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স এগিয়ে আসছেন আমার দিকে।

'মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স!' বললাম তাঁকে, 'হাসিটা শুনেছেন? কে হাসল?'

'কোন চাকর-বাকর হবে হয়ত,' স্বাভাবিক ভাবে বললেন তিনি। 'খুব সম্ভব গ্রেস পুল। এখানকার একটা ঘরে বসে সেলাই করে ও। মাঝে মাঝে লিয়াও থাকে ওর সাথে। দুজনে একসাথে হলেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।'

এসময় হাসির শব্দ শোনা গেল আবার। বিড়বিড় করে কথা বলছে কেউ। ক্রমে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

'গ্রেস!' ডেকে উঠলেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। কেউ জবাব দেবে আশা করিনি আমি। হাসিটা ভূতের, কোন সন্দেহ নেই। কাজেই কারও জবাব দেয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সবচেয়ে কাছের দরজাটা খুলে গেল এসময়। আমাকে অবাক করে দিয়ে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। মহিলা। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। মাথায় লাল চুল। চোখে মুখে কঠিন দৃষ্টি।

'খুব বেশি হৈ-চৈ করছ, গ্রেস,' বললেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। 'আমার সেদিনের কথাগুলো মনে আছে তো?'

মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল গ্রেস। ঘরে ফিরে গেল আবার।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের পিছু পিছু নিচে নেমে এলাম আমি। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি খাবার রাখা রয়েছে।

পরের কয়েক সপ্তাহে বার কয়েক শুনলাম গ্রেস পুলের সেই অদ্ভুত, ভুতুড়ে হাসি। তবে হাসির চেয়েও অদ্ভুত তার বিড়বিড়ানি। কোন কোন দিন শান্ত থাকে সে। বোঝাই যায় না ও রয়েছে এ বাড়িতে। আবার কখনও সারাদিনে অসংখ্যবার হাসে।

প্রায়ই দেখি ওকে। ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে আসে। হাতে ট্রে বা গামলা। চলে যায় রান্নাঘরে। খাবার বা পানীয় নিয়ে ফিরে যায় দ্রুত।

পেরিয়ে গেল তিনটি মাস। অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর। এরই মধ্যে ভালবেসে ফেলেছি আমার ছাত্রীকে। সেই সঙ্গে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকেও। তাঁর মিষ্টি ব্যবহারের কারণে।

জানুয়ারির এক বিকেলে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স এডেলের হয়ে একদিন ছুটি চাইলেন। ওর সর্দি লেগেছে। এডেল নিজেও এসে ছুটির জন্যে আবদার ধরল। আপত্তি করলাম না আমি। ছেলেবেলায় ছুটির জন্যে কিভাবে অপেক্ষা করতাম মনে পড়ে গেল আমার।

সারাটা সকাল লাইব্রেরিতে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম মাইল দুয়েক দূরে হে গ্রামে বেড়াতে যাব। লম্বা কোট আর বনেট পরে তৈরি হয়ে নিলাম। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স একটা চিঠি লিখেছেন। পোস্ট করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন আমাকে। চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি।

রাস্তার মাটি শক্ত। বাতাস নেই। এ রাস্তায় আর কাউকে চোখে পড়ল না। তিনটে বাজে এখন। সূর্য এর মধ্যে ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। দুপাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠ। সমস্ত গ্রামাঞ্চলটা যেন গভীর ঘুমে মগ্ন। চমৎকার

শান্ত পরিবেশ, দারুণ ভাল লাগল আমার। মাইল খানেক হাঁটার পর জিরিয়ে নিতে মন চাইল। বসে পড়লাম একটা আলের ওপর। ওটা চলে গেছে মাঠে। গুটিসুটি মেরে বসে শীত তাড়াতে চাইলাম। কোটটা টেনেটুনে ঢেকে নিলাম পা। আর হাতে দস্তানা থাকায় খুব একটা অনুভব করলাম না শীত। তবে ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই মনে। চেয়ে দেখি কাছের ছোট্ট নদীটার ওপর পারাপারের যে সেতু রয়েছে সেটায় পুরু হয়ে বরফ জমেছে। নদীর পানিও জমে বরফ হয়ে গেছে। এখান থেকে থর্নফিল্ড হলও চোখে পড়ল আমার।

সূর্য ডোবাতক সেখানেই বসে রইলাম আমি। গাছগুলোর পেছন দিকের আকাশটা লাল করে দিয়ে ডুবে গেল সূর্য। এবার উঠে পড়লাম আমি। রওনা হলাম আবার।

তিন কদম এগিয়েছি কি এগোইনি হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। এগিয়ে আসছে এদিকেই। বাঁকের আড়ালে থাকায় ঘোড়াটাকে দেখতে পেলাম না। রাস্তাটা সরু। তাই পথ করে দেয়ার জন্যে পিছিয়ে গেলাম আমি। আবার বসে পড়লাম সেই আলটার ওপর। ঘোড়াটা চলে গেলে তারপর যাব।

পাহাড়ের চূড়ার ওপর তখন সদ্য ওঠা চাঁদ তার আসন করে নিয়েছে। কাছে এগিয়ে এল খুরের শব্দ। তবে এখনও ওটা রয়েছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। এসময় কানে এল কিসের যেন শব্দ। ঘন ঝোপের আড়াল থেকে বিশাল একটা সাদা-কালো কুকুর বেরিয়ে এল আচমকা। ছুটে গেল রাস্তা ধরে। প্রায় তক্ষুণি দেখতে পেলাম ঘোড়াটাকে। তেজী একটা ঘোড়া। একজন আরোহী বসে রয়েছে তার পিঠে। দেখে মনে হল লোকটি মিল্‌কোটে যাবে। শর্টকাট হিসেবে এ রাস্তাটিকে বেছে নিয়েছে। ঘোড়াটা চলে যাওয়ার পর এগোলাম আমি। খানিকদূর এগিয়ে ফিরে তাকাতে হল। কোন কিছু পিছলে গেছে বরফে, কারও চিৎকার শুনলাম, তারপর ভারী কি যেন পতনের শব্দে চেয়ে দেখি ঘোড়াসুদ্ধ পড়ে গেছে লোকটি।

নদীর ওপরকার বরফ ঢাকা সেতুতে পিছলে গেছে ঘোড়া।

লাফাতে লাফাতে ফিরে এল কুকুরটি। গগনবিদারী ঘেউ ঘেউ শুরু করল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল তার অসহায় চিৎকার। মনিবের কাছে ফিরে গেল আবার। তার সারা শরীর শুঁকে নিয়ে এবার ছুটে এল আমার কাছে। সাহায্যের আশায়।

কোনমতে ওঠার চেষ্টা করছে তখন লোকটি। এরই মাঝে কুকুরটিকে ধমকাল, 'চুপ, পাইলট!'

'ব্যথা পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। জবাব দিল না সে। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল।

প্রথমে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল লোকটি।

ওঠার সময় বলল, 'সরে দাঁড়ান এক পাশে।'

তাই করলাম আমি। ঘোড়াটাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল লোকটি। খুরের খটাখট শব্দে কান ঝালাপালা করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ঘোড়া। ঝুঁকে পড়ে পা পরীক্ষা করে দেখল লোকটি। কতখানি ব্যথা লেগেছে বোঝার চেষ্টা করল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বসে পড়ল আমার সেই আলটার ওপর।

'আপনি চাইলে লোক ডেকে আনতে পারি আমি। থর্নফিল্ড হল বা হে গ্রাম থেকে,' বললাম আমি।

'ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না। হাড় ভাঙেনি। মচকে গেছে কেবল।'

উঠে দাঁড়িয়ে পা ঝাড়া দিল সে। ব্যথায় বিকৃত হল মুখ। 'উফ,' করে উঠল।

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখন লোকটিকে। লম্বা কোট পরে রয়েছে সে। কলারটা ফারের তৈরি। ইস্পাতের বকলস রয়েছে কোটে। লোকটির উচ্চতা মাঝারি। তবে কাঁধ চওড়া। রোদে-পোড়া মুখটায় পুরু ভ্রূ। পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বয়স।

কোন রকম সঙ্কোচ বা ভীতি অনুভব করছি না আমি। যদিও লোকটি ভ্রূ কুঁচকে কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

'থর্নফিল্ডে,' জবাব দিলাম আমি।

'মালিক কে থর্নফিল্ডের?' প্রশ্ন এল।

'মিস্টার রচেস্টার।'

'চেনেন তাঁকে?'

'না, চিনি না।'

'ওখানকার কাজের লোক নন নিশ্চয়। আপনি–' কথা শেষ না করেই আমার কাপড়-চোপড়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল লোকটি। ভ্রূ কুঁচকে রয়েছে তখনও।

'আমি গভর্নেস।'

'ও আচ্ছা, গভর্নেস!' বলল সে, 'ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।'

আল থেকে উঠে পড়ল লোকটি। হাঁটার চেষ্টা করতেই কুঁচকে উঠল মুখ।

'চাইলে সাহায্য করতে পারেন আমাকে,' মৃদু হেসে বলল সে। 'লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে আমার কাছে এনে দিতে পারবেন? ভয় পাবেন না তো?'

মাথা নেড়ে ঘোড়াটার কাছে গেলাম আমি। লাগামটা ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই ওটা ধরতে দেবে না ঘোড়াটা। কাছে ঘেঁষতেই দিল না আমাকে। বারবার চেষ্টা করলাম আমি। লোকটি এতক্ষণ দেখছিল সব। এবার হেসে ফেলল।

'এদিকে আসুন,' বলল সে।

গেলাম আমি।

'কিছু মনে করবেন না,' নরম গলায় বলল লোকটি। 'আপনার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে আমাকে। উপায় নেই।'

আমার কাঁধে ভারী একটা হাত রাখল সে। শরীরের ভার অনেকখানি ছেড়ে দিল আমার ওপর। বহুকষ্টে ঘোড়ায় উঠে বসল। লাগামটা চেপে ধরে হাসার চেষ্টা করল সে। ফুটল না হাসিটা।

'ধন্যবাদ,' বলল লোকটি। 'কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরবেন।'

ঘোড়াটার পেটে স্পার দাবাল সে। ছুটল ঘোড়াটা। কুকুরটাও ছুটল পেছন পেছন। তিনটি প্রাণীই উধাও হয়ে গেল দ্রুত।

দস্তানা জোড়া পরে নিয়ে হাঁটা ধরলাম আমি। খানিকবাদেই বিরক্ত হয়ে উঠলাম নিজের ওপর। লোকটার চেহারা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বারবার কেবল মনে পড়ে যাচ্ছে। কঠোর একটা মুখ। হে গ্রামে চিঠিটা যখন পোস্ট করছি তখনও চোখে ভাসছে মুখটা। বাড়ি ফেরার পথেও সেই একই মুখ সর্বক্ষণ জ্বালাতন করল আমাকে।

হলরুমে ঢুকে শুনি এডেল কার সঙ্গে যেন গল্পে মেতে উঠেছে। একাই কথা বলে চলেছে সে। ফলে বোঝার উপায় নেই অন্য মানুষটি কে। দ্রুত পায়ে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। তবে ঘরে মোমবাতি নেই। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকেও দেখলাম না। ঘরে কেবল সাদা-কালো, বিশাল একটা কুকুর। বসে রয়েছে কার্পেটের ওপর। আমাকে দেখে উঠে এল কুকুরটা। লেজ নাড়তে লাগল।

বেল বাজালাম আমি। একটা মোমবাতি জ্বালানো দরকার। লিয়া ঢুকল ঘরে।

'কার কুকুর এটা?' জানতে চাইলাম।

'মালিকের,' বলল সে।

'এসেছে কার সঙ্গে?'

'মালিকের সঙ্গে–মিস্টার রচেস্টার। এই তো খানিক আগেই এসেছেন তিনি।'

'তাই!'

'মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স আর মিস এডেল তো ওনার সঙ্গেই গল্প করছে। ডাইনিংরুমে। জন গেছে ডাক্তার আনতে। ঘোড়া থেকে পড়ে মিস্টার রচেস্টারের পা মচকে গেছে।'

'ও! একটা মোম এনে দেবে, লিয়া?' বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে কোনমতে বলতে পারলাম আমি।

মোমবাতি নিয়ে এল লিয়া। তার পেছন পেছন ঘরে ঢুকলেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। লিয়ার বলা কথাগুলো আর আমার দেখা ঘটনাগুলো আবার শুনতে হল মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের মুখে। তবে নতুন একটা খবর যোগ করলেন তিনি। ডাক্তার অর্থাৎ মিস্টার কার্টার এসে গেছেন। তিনি এখন মিস্টার রচেস্টারের সঙ্গে রয়েছেন।

কথাগুলো বলেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। চায়ের কথা বলার জন্যে।

আমি উঠে এলাম ওপরে।

আট

মিস্টার রচেস্টার শীঘ্রি শুয়ে পড়লেন সে রাতে। পরদিন উঠলেনও দেরি করে। খুব সম্ভব ডাক্তারের নির্দেশ মোতাবেক। নিচে নেমে এসে লাইব্রেরিতে গেলেন তিনি। কাজ করবেন ওখানেই।

এডেল আর আমি ওপর তলার একটা ঘরে বসলাম আজকে। কিন্তু পড়ায় মনই নেই এডেলের। সে খানিক পর পর কেবলু দরজার কাছে ছুটে যায়। উঁকিঝুঁকি মেরে মিস্টার রচেস্টারকে দেখতে চেষ্টা করে।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরেই যথারীতি ডিনার সারলাম আমরা। ঠাণ্ডা বিকেলটা এডেল আর আমি পড়ার ঘরেই কাটালাম।

সন্ধে নামতে বইপত্র নিয়ে এডেলকে নিচে নামার অনুমতি দিলাম। ঘরেই বসে রইলাম আমি। যতক্ষণ না মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স এসে ডাকলেন আমাকে।

'মিস্টার রচেস্টারের সঙ্গে তুমি আর তোমার ছাত্রী আজ ছ'টায় চা খাবে। ড্রইংরুমে,' বললেন তিনি।

'ফ্রকটা বদলে নাও,' মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স যোগ করলেন।

'না বদলালে হয় না?' বললাম আমি।

'না, মিস্টার রচেস্টার এলে সবসময় ফিটফাট থাকতে হয়। আমি অন্তত চেষ্টা করি,' বললেন তিনি।

ঘরে গিয়ে সেরা পোশাকটা বেছে নিলাম আমি। কালো রঙের সিল্কের পোশাক। আর ওতে মুক্তোর ছোট একটা ব্রৌচ লাগিয়ে নিলাম। মিস টেম্পল ব্রৌচটা দিয়েছিলেন আমাকে। তিনি লোউড ছাড়ার মুহূর্তে। তারপর মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন তিনি আমাকে।

দুটো মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে। আরও দুটো জ্বলছে ম্যানটেলপিসের ওপর। ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে রয়েছে কুকুরটা। পাইলট। আগুন পোহাচ্ছে। এডেলকে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখলাম। কাউচে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন মিস্টার রচেস্টার। ঘরে আগুন জ্বলছে। ফলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাঁর মুখটা। মোটা ভ্রূ দেখে চিনতে অসুবিধে হল না যে ইনিই সেই অশ্বারোহী। আমাদের এগিয়ে আসতে দেখেও মাথা তুললেন না তিনি।

'ইনি মিস আয়ার, স্যার,' মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স বললেন।

মাথা নোয়ালেন তিনি। তবে এডেল আর পাইলটের দিক থেকে চোখ সরালেন না।

'বসুন, মিস আয়ার,' মৃদুস্বরে বললেন তিনি। বসে পড়লাম। মনে মনে কৌতূহল অনুভব করছি। মিস্টার রচেস্টার কিভাবে আলাপ শুরু করবেন সেটা ভেবে। মূর্তির মত বসেই রইলেন তিনি। নড়াচড়া নেই। কোন কথাও নেই। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি। এ সময় কথা বলতে শুরু করলেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক গলায়।

'ম্যাডাম, চা খাব,' একটিমাত্র জবাব এল তাঁর কথার।

ট্রে এল। এডেলকে নিয়ে টেবিলে গেলাম আমি। কিন্তু মিস্টার রচেস্টার কাউচ ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখালেন না।

'কাপটা মিস্টার রচেস্টারকে দাও,' আমার দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স।

নির্দেশ পালন করলাম আমি। কাপটা নেয়ার সময় আমার দিকে একবার চাইলেন মিস্টার রচেস্টার।

'এডেলের পেছনে অনেক খেটেছেন দেখলাম,' বললেন তিনি। 'অনেক উন্নতি করেছে ও।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' শান্তস্বরে বললাম আমি।

'হুম্!' একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন তিনি। চা খেতে লাগলেন

নিঃশব্দে। ট্রেটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর মুখ খুললেন তিনি। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আগুনের কাছে আসুন।'

গেলাম আমরা। পাইলটকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল এডেল। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স এক কোণে বসে উল বুনতে লাগলেন। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন এবার মিস্টার রচেস্টার।

'আমার বাসায় মাস তিনেক হল এসেছেন। তাই না?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ইয়েস, স্যার।'

'আগে কোথায় ছিলেন?'

জানালাম আমি এতিম। আগে লোউড স্কুলে ছিলাম। সেখান থেকেই এসেছি।

'হুম্!' সব শুনে বললেন তিনি। 'কাল সন্ধ্যায় আপনাকে দেখার পর থেকে রূপকথার মত লাগছে আমার। আচ্ছা, আমার ঘোড়াটাকে জাদু করেননি তো কাল? আপনি এখানে এলেন কিভাবে বলুন তো!'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তাই দেখে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স চিঠি লিখেছিলেন আমাকে।'

'হ্যাঁ,' বললেন ভদ্রমহিলা, 'ভাগ্যিস লিখেছিলাম নইলে মিস আয়ারের মত গভর্নেস কোথায় পেতাম?'

'থাক, আপনাকে আর সাফাই গাইতে হবে না। ইনি কেমন সেটা নিজেই বুঝতে চাই আমি। জানেন, আমাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়েছিলেন মিস আয়ার!' গম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলো বললেন মিস্টার রচেস্টার।

'কিছু বললেন, স্যার?' শেষের কথাগুলো বুঝতে পারেননি মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স, অবাক দেখাল তাঁকে।

মৃদু হাসলেন মিস্টার রচেস্টার।

'লোউডে কি কি শিখিয়েছে আপনাদের? পিয়ানো বাজাতে পারেন?' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'পারি অল্প-স্বল্প,' বললাম আমি।

'মোমবাতি নিয়ে লাইব্রেরিতে যান। দরজাটা খোলা রেখে যাবেন। পিয়ানো রয়েছে। যে-কোন একটা সুর বাজিয়ে শোনান।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি। চলে গেলাম ও-ঘরে। বাজাতে শুরু করলাম পিয়ানো।

'হয়েছে!' খানিক বাদেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

পিয়ানো থামিয়ে এ ঘরে ফিরে এলাম আমি। মিস্টার রচেস্টার

বললেন, ‘এডেল আজ সকালে কয়েকটা স্কেচ দেখিয়েছে আমাকে। বলেছে আপনার আঁকা। সত্যি তাই? আপনার ফাইলটা আনুন দেখি।’

লাইব্রেরি থেকে ফাইল নিয়ে এলাম আমি। আমার আঁকা প্রতিটি ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর তিনটে ছবি সরিয়ে রেখে ফিরিয়ে দিলেন বাকিগুলো।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকে বললেন, ‘ছবিগুলো ওই টেবিলে রাখুন।’ তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘বসুন। ছবি আঁকতে অনেক সময় আর চিন্তা-ভাবনা লাগে বলেই জানি। এত সময় পান কখন?’

‘ওগুলো লোউডে থাকতে এঁকেছি। ছুটির সময়।’

‘আইডিয়া পেয়েছেন কোথা থেকে?’

‘মাথা থেকে।’

‘যেটা আপনার কাঁধে দেখছি?’

‘ইয়েস, স্যার।’

‘আরও আইডিয়া আছে নাকি ওটার ভেতর?’

‘আছে। সেগুলো এগুলোর চেয়েও ভাল।’

ছবি তিনটে দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখলেন তিনি।

‘চমৎকার,’ শেষ পর্যন্ত বললেন। ‘রেখে দিন।’ ছবিগুলো ফাইলে রেখে দিলাম আমি। হঠাৎই যেন সময়ের কথা মনে পড়ল তাঁর। ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, ‘আরে! ন’টা বেজে গেছে দেখি। মিস আয়ার, এতক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছেন এডেলকে? শিগ্‌গির শুতে নিয়ে যান।’

তাঁর কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিল এডেল।

‘গুড নাইট,’ সবার উদ্দেশে বললেন তিনি। তারপর হাত দেখালেন দরজার দিকে। যেন আমাদের সঙ্গ আর ভাল লাগছে না তাঁর।

এডেলকে শুইয়ে দিয়ে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরে গেলাম আমি।

‘মিস্টার রচেস্টারের মেজাজ মর্জির কোন ঠিক নেই,’ তাঁকে বললাম।

‘ঠিক,’ বললেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। ‘তবে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে চিন্তিত তিনি। সেটাও একটা কারণ।’

‘কি ব্যাপারে?’

‘পারিবারিক ব্যাপার,’ এড়িয়ে যেতে চাইলেন তিনি। ‘এখানে আসেন না বড় একটা, জানই তো, চলেও যাবেন শীঘ্রি।’

‘থর্নফিল্ড পছন্দ নয় তাঁর?’

‘আসলে এখানকার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না তিনি।’

এ ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে চাইলেন না মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। সেটা

বুঝতে পেরে চুপ করে রইলাম আমিও। মিস্টার রচেস্টার আমার কাছে রহস্যময় মানুষ হয়েই রইলেন।

পরের কয়েকদিন তাঁকে দেখলাম না বড় একটা। পায়ের ব্যথা কমে যাওয়ার পর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়তে শুরু করলেন তিনি। প্রায়ই তাঁর ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে যেত।

একদিন বিকেলে এডেল আর আমার সঙ্গে মাঠে দেখা হয়ে গেল তাঁর। এডেল পাইলটকে পেয়ে খেলায় মগ্ন হল। মিস্টার রচেস্টার আমাকে নিয়ে কাছের বিচ অ্যাভিনিউ থেকে হেঁটে আসতে চাইলেন। তাঁর মুখে জানলাম এডেলের মা'র সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল। ভদ্রমহিলা ছিলেন অপেরার নর্তকী। তিনি মারা যাওয়ার পর থেকে মিস্টার রচেস্টারই এডেলের দেখাশোনা করছেন।

কথাটা জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করলাম। পরের ক'দিনে অনেকটা যেন বদলে গেলেন তিনি। আগের সেই রাশভারী ভাবটা আর রইল না। দেখা হলেই কথা বলেন, হাসেন। অনেকগুলো সন্ধ্যা কথা বলে কাটালাম আমরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁকে এখন আর মনিব বা প্রভু মনে হয় না, বন্ধুর মত ভাবতে শুরু করেছি আমি তাঁকে। তিনি হাসলে আমার ভাল লাগে। মনে হয় এরচেয়ে সুন্দর বুঝি আর কিছু নেই, হতে পারে না। ঘরে তাঁর উপস্থিতি আগুনের সবচেয়ে উজ্জ্বল শিখার চেয়েও যেন চোখ ধাঁধানো, জ্বলজ্বলে।

তবে তাঁর মন-মেজাজের খোঁজ এখনও পাইনি আমি। মাঝেমাঝেই একা বসে থাকেন লাইব্রেরিতে। ভাঁজ করা হাতে মাথা রেখে। দেখে বড় মায়া লাগে আমার। মনে হয় তাঁকে খুশি করার জন্যে সবকিছুই করতে পারব আমি।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে রয়েছি। ঘুম আসছে না। মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে মিস্টার রচেস্টারের কথা।

'উনি কি শীঘ্রিই চলে যাবেন?' আপন মনেই প্রশ্ন করলাম আমি।

'মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স বলেছেন একসঙ্গে দুসপ্তাহের বেশি এখানে থাকেন না মিস্টার রচেস্টার। এবার তো আট সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন। কবে চলে যাবেন কে জানে। তিনি চলে গেলে আর কোন আকর্ষণ থাকবে না জায়গাটার,' ভাবলাম আমি।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ চমকে জেগে উঠলাম। অদ্ভুত একটা বিড়বিড়ানি কানে এল।

আমার ঠিক ওপর থেকে এসেছে শব্দটা। মোমবাতি জ্বালিয়ে শুইনি।

জ্বালানো উচিত ছিল। গভীর অন্ধকারে কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। বিছানায় উঠে বসলাম। এসময় থেমে গেল শব্দটা।

ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। ধড়ফড় করছে বুকের ভেতরটা। নিচে হলরুমের দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল। এ সময় অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। মনে হল কেউ যেন আমার দরজার ওপর দিয়ে আঙুল বুলাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে পথ করে নিচ্ছে বাইরের অন্ধকারে।

'কে ওখানে?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। জবাব দিল না কেউ। হঠাৎ মনে হল পাইলট হতে পারে। রান্নাঘরের দরজা খোলা থাকে মাঝে মধ্যে। সে সুযোগে মিস্টার রচেস্টারের ঘরের দরজায় চলে যায় ও।

ভাবনাটা মাথায় আসতেই অনেকখানি সাহস ফিরে পেলাম। শুয়ে পড়লাম আবার।

চারদিক নিঝুম, তন্দ্রামত এল। কিন্তু আমার কপালে ঘুম ছিল না সে রাতে।

হঠাৎই নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল, ভুতুড়ে হাসিতে। মনে হল দরজার ফুটো দিয়ে যেন ঘরে ঢুকল শব্দটা। দরজার দিকে মাথা দিয়ে শুই আমি। সে মুহূর্তে মনে হল ভূতটা যেন আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। চারদিকে চোখ বোলালাম দ্রুত। অস্বাভাবিক কিছু নজরে এল না। আবার শোনা গেল শব্দটা। দরজার ওপাশ থেকে এসেছে, কোন সন্দেহ নেই।

'কে ওখানে?' আবার চেঁচালাম আমি। গুঙিয়ে উঠল কেউ। গড়গড় শব্দ শুনলাম। তিন তলায় যাওয়ার দরজার দিকে চলে গেল পায়ের শব্দ। খুলে গেল দরজাটা। বন্ধও হয়ে গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ।

'গ্রেস পুল নাকি? কোন আত্মা-টাত্মা নিয়ে এসে ভয় দেখাতে চাইছে?' নিজেকেই প্রশ্ন করলাম আমি।

একা ওঘরে শুয়ে থাকা অসম্ভব মনে হল আমার কাছে। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরে চলে যাব আমি। তড়িঘড়ি ফ্রক পরে শাল জড়িয়ে নিলাম। কাঁপা হাতে খুললাম দরজাটা। বাইরে মোমবাতি জ্বলছে। আশ্চর্য কাণ্ড! কে জ্বালল? বাতাস কেমন যেন গুমোট আর ধোঁয়াটে ঠেকল আমার কাছে। আগুন লেগেছে কাছেই কোথাও। বুঝতে মোটেও অসুবিধে হল না আমার।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল এসময়। মিস্টার রচেস্টারের ঘরের দরজাটা সামান্য খুলে রয়েছে। ঘরের ভেতর ঘন নীল ধোঁয়া দেখতে পেলাম। মেঘের মত জমাট বেঁধে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

আগুনের কম্পন চোখে পড়ল। হাপরের বাড়ি পড়ল যেন বুকে। মিস্টার রচেস্টারের ঘরে আগুন লেগেছে!

নয়

মুহূর্তের মধ্যে মিস্টার রচেস্টারের ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। বিছানার চারপাশে লকলক করছে আগুনের শিখা। পর্দাগুলো পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু মিস্টার রচেস্টারের কোন হুঁশ নেই। ধোঁয়া আর আগুনের শিখার মাঝখানে গভীর ঘুমে মগ্ন তিনি।

'উঠুন!' চিৎকার করে বললাম আমি, 'উঠুন!' ধাক্কা দিলাম তাঁকে। বিড়বিড় করে কি যেন বলে আবার পাশ ফিরে শুলেন তিনি। ওদিকে বিছানার চাদর পুড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে। পানি ভর্তি গামলা আর জগ রয়েছে ঘরে। সেদিকেই ছুটে গেলাম আমি। তুলে নিলাম দুটোই। দ্রুত ফিরে এসে ঘুমন্ত মিস্টার রচেস্টারের ওপর ঢেলে দিলাম পানি। দৌড়ে গেলাম আমার ঘরে। গামলা আর জগ আছে ওখানেও। পানি ভর্তি। সেগুলোও ঢাললাম তাঁর বিছানায়। পানিতে ভেসে গেল বিছানা।

এবার ধড়মড় করে উঠে বসলেন মিস্টার রচেস্টার। বিছানা আর নিজের অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্যা শুরু হল নাকি?'

'না, স্যার,' তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। 'ঘরে আগুন ধরে গিয়েছিল। প্লীজ, উঠুন আপনি। আমি মোমবাতি আনতে যাচ্ছি,' বললাম।

'ও, জেন আয়ার দেখছি,' রেগে মেগে বললেন তিনি। 'আমাকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলেন?'

'ঈশ্বরের দোহাই, উঠুন আপনি,' মরিয়া হয়ে বললাম আবার।

উঠে পড়লেন তিনি।

দৌড়ে গিয়ে মোমবাতি নিয়ে এলাম আমি। আমার ঘরের বাইরে ওটা জ্বলছিল তখনও। মোমবাতি হাতে নিয়ে বিছানাটা পরীক্ষা করে দেখলেন মিস্টার রচেস্টার।

পুড়ে কালো হয়ে গেছে এখানে ওখানে। পুরো বিছানাটাই পানিতে ভিজে চপচপ করছে। কার্পেটের অবস্থাও তাই।

'কার কাজ এটা?' প্রশ্ন করলেন অবশেষে।

যতটুকু জানি সব বললাম তাঁকে। গম্ভীর মুখে শুনলেন তিনি।

'মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকে ডাকব?' কথা শেষ করে জানতে চাইলাম আমি।

'দরকার নেই। তিনি এসে কি করবেন? আপনি আমার কোটটা গায়ে দিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি। মোমবাতিটা নিয়ে যাচ্ছি। আপনি যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। কাউকে ডাকবেন না বুঝেছেন? মনে থাকে যেন।'

বেরিয়ে গেলেন তিনি। তিন তলায় গেলেন বুঝতে পারলাম। দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম। বেশ অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। আঁধারে দাঁড়িয়েই রয়েছি আমি। মিস্টার রচেস্টার কোথায় গেলেন দেখতে যাব যখন ঠিক তখনই মোমবাতির আলো ছায়া ফেলল দেয়ালে। আসছেন তিনি। ঘরে ঢোকার পর খুব মলিন আর বিষণ্ন দেখাল তাঁকে। কেন সেটা বুঝতে পারলাম না আমি।

'যা ভেবেছিলাম তাই,' বললেন তিনি। নামিয়ে রাখলেন মোমবাতিটা। খালি একটা গামলার উল্টো পিঠে।

'কি ভেবেছিলেন, স্যার?'

'অদ্ভুত একটা হাসি শুনেছিলেন না?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ। গ্রেস পুলের হাসি। কি ভয়ঙ্কর ভাবে যে হাসে মহিলা। কলজে শুকিয়ে যায়। ওরই কাজ মনে হয় এটা।'

'ঠিকই ধরেছেন। গ্রেস পুলেরই কাজ। থাক, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কাউকে জানানরও দরকার নেই। চারটে বাজে প্রায়। আমি নিচে লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দেব বাকি রাতটুকু।'

'গুড নাইট, স্যার,' দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম আমি।

'আরে, দাঁড়ান দাঁড়ান। ওভাবে চলে যাচ্ছেন কেন? আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। অন্তত হাতটা তো মেলাবার সুযোগ দেবেন।'

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি আমার দিকে।

তাঁর বলার ধরনে হেসে ফেললাম আমি। বাড়ানো হাতটা ধরার জন্যে হাত বাড়াতেই দু হাতে চেপে ধরলেন তিনি আমার হাতটা

'জেন, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ,' গভীর শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।

'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি শুধু,' বললাম আমি। 'গুড নাইট, স্যার।'

'দাঁড়ান,' বললেন তিনি। আমার হাতটা ধরে রেখেছেন তখনও। 'প্রথমদিন আপনার চোখ আর হাসি দেখেই বুঝেছিলাম আমার ভাল চান আপনি।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' কথাটা বলে রওনা দেয়ার চেষ্টা করলাম আমি।

'চলে যাচ্ছেন?'

'শীত করছে, স্যার।'

'শীত? ও, হ্যাঁ তা তো করবেই। ভিজে গেছেন যে। ঠিক আছে, জেন, যান আপনি।'

কিন্তু আমার হাতটা তখনও শক্ত করে ধরা তাঁর হাতে। ছাড়াতে পারলাম না আমি।

'মনে হয় মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স ওপরে আসছেন,' দ্রুত কথাগুলো বলে ফেললাম।

হাত ছেড়ে দিলেন তিনি। ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি। কিন্তু ঘুমানর কথা চিন্তাও করতে পারলাম না। জেগে রইলাম সারা রাত। পরদিন উঠে পড়লাম ভোরে।

সকালের নাস্তার পর মিস্টার রচেস্টারের ঘরের সামনে হৈ চৈ শুনলাম। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স, লিয়া, রাঁধুনি আর জন সবাই রয়েছে ওখানে। সকলকে কথা বলতে শুনলাম। 'আরেকটু হলেই পুড়ে মরতেন! রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে শোয়া একদম উচিত নয়,' এ ধরনের কথাবার্তা কানে এল আমার।

সন্ধে হয়ে গেল। মিস্টার রচেস্টারের দেখা নেই সারাদিন। তাঁর গলাও শুনিনি আজ। ভাবলাম রাতে হয়ত দেখতে পাব তাঁকে। সন্ধের আঁধার গাঢ় হতে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরে গেলাম আমি। উদ্দেশ্য গল্পও হবে চা খাওয়াও হবে। মিস্টার রচেস্টারের কথা কিছু জানাও থাকতে পারে তাঁর। কথা বললে হয়ত ব্যাকুলতা কমবে আমার।

আমাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন ভদ্রমহিলা, 'জেন, শরীর খারাপ নাকি? মুখটা কেমন লাল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন ব্যাপারে খুব উত্তেজিত।'

'আমি ভালই আছি,' দ্রুত বললাম। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স উঠে জানালার খড়খড়ি উঠিয়ে দিলেন। 'ভাল দিনেই রওনা দিয়েছেন মিস্টার রচেস্টার,' বাইরের দিকে চেয়ে বললেন তিনি।

'রওনা দিয়েছেন! মিস্টার রচেস্টার চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, তুমি জান না?' অবাক মনে হল তাঁকে। 'সকালে নাস্তা খেয়েই চলে গেছেন। মিস্টার এশটনের বাড়িতে থাকবেন। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে। তাঁর পছন্দের সব লোকজন রয়েছেন ও বাড়িতে।'

'আজ রাতে ফিরবেন তো?'

'মনে হয় না। কালও ফেরেন কিনা সন্দেহ। অন্তত সপ্তাহখানেক

কাটিয়ে তবে আসবেন। ও বাড়ির ভদ্রলোকেরা খুব পছন্দ করেন তাঁকে। আর মেয়েরা তো তাঁর জন্যে পাগল।'

'মেয়ে আছে নাকি ও বাড়িতে?'

'থাকবে না? মিসেস এশটন রয়েছেন। তাঁর তিন মেয়ে রয়েছে। আর রয়েছেন মিস ইনগ্র্যাম, দারুণ সুন্দরী মহিলা।'

'তিনি–তিনি কি বিবাহিতা?'

'না, তবে শিগ্‌গিরই হয়ত বিয়ে হয়ে যাবে। জেন, কিছু খাচ্ছ না দেখছি। শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, আমি ঠিকই আছি। আর এক কাপ চা দেবেন?'

ঘরে ফিরে গেলাম। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের বলা কথাগুলো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। আমার চেয়ে বড় গর্দভ বোধহয় জন্মেনি আর। মিথ্যে কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়িয়েছি এতদিন। সুধা মনে করে বিষপান করেছি।

মিস ইনগ্র্যামের মত সুন্দরী মহিলা থাকতে আমার কথা ভাবতে যাবেন কেন মিস্টার রচেস্টার? কি আছে আমার? তাঁর পাশে দাঁড়ানর মত কোন যোগ্যতাই তো আমার নেই। আমাকে মিছিমিছি গুরুত্ব দিতে যাবেন কেন তিনি? কাউকে ভালবাসার যে কি কষ্ট আগে বুঝিনি। আর সে-লোক যদি হয় ধরাছোঁয়ার বাইরের কেউ তবে সে কষ্টের সীমা নেই। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি আমি।

হাজারো চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

দু সপ্তাহ পর চিঠি এল মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের নামে। তখন নাস্তার টেবিলে আমরা।

'মিস্টার রচেস্টার লিখেছেন,' খামটা খোলার সময় বললেন তিনি।

কফির কাপটা নামিয়ে রাখলাম আমি। হাতটা কাঁপছে, তবে সেটা লক্ষ করলেন না মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। চিঠিটা তাঁর পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলাম।

'কি লিখেছেন মিস্টার রচেস্টার? ফিরতে আরও দেরি হবে?'

'না,' মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স বললেন। 'তিন দিনের মধ্যে ফিরছেন। তারমানে আগামী বৃহস্পতিবার। তবে একা আসছেন না। ও বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসছেন। এখানে থাকবেন ওঁরা। মহিলারাও আসছেন। ঘরগুলো সব গুছিয়ে রাখতে বলেছেন।'

মহিলারা আসছেন। তারমানে মিস ইনগ্র্যামও। মনটা ভারী হয়ে গেল আমার। উবে গেল সব উৎসাহ। এবারই হয়ত মিস ইনগ্র্যাম মিসেস রচেস্টার হয়ে যাবেন—কে জানে।

দশ

বৃহস্পতিবার সন্ধে ছ'টায় মিস্টার রচেস্টারদের আসার কথা।

স্কুলরুমের জানালায় দাঁড়িয়ে রইলেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স, পরনে কালো সার্টিনের গাউন, তাঁর সেরা পোশাক। এডেল গিয়ে দাঁড়াল তাঁর পাশে। ওকে অনুসরণ করলাম আমি। এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ এলে এখান থেকে ঠিকই দেখতে পাব। তবে আমাকে দেখা যাবে না।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স, 'ওই যে, ওঁরা আসছেন।'

চারটে ঘোড়া এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। পেছনে দুটো খোলা ক্যারিজ। চারজনের মধ্যে দুজন অশ্বারোহী অল্পবয়সী তরুণ। তৃতীয়জন হচ্ছেন মিস্টার রচেস্টার স্বয়ং। পাইলট ছুটছে তাঁর আগে আগে। তাঁর পাশের ঘোড়ায় রয়েছেন লাল পোশাক পরিহিতা এক মহিলা। তাঁর মাথার টুপিটা কাৎ হয়ে পড়েছে বাতাসের কারণে, ফলে লম্বা কালো কোঁকড়া চুল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'মিস ইনগ্র্যাম!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স। তড়িঘড়ি ছুটলেন সকলকে অভ্যর্থনা করার জন্যে।

হলরুমে এখন নারী-পুরুষ কণ্ঠের সম্মিলিত গুঞ্জন। খানিক পরেই পায়ের শব্দ পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে সকলে। হালকা পায়ে হেঁটে গেল বারান্দা দিয়ে। সেই সঙ্গে মৃদু হাসির শব্দও শুনলাম। দরজাগুলো খুলল। বন্ধ হল আবার। নীরব হয়ে গেল থর্নফিল্ড হল।

'মহিলারা কাপড় পাল্টাচ্ছেন,' এডেল বলল এসময়। 'মিস্টার রচেস্টার ডিনারের সময় ডাকবেন না আমাদের?' প্রশ্ন করল সে।

'মনে হয় না। তাঁর এখন আমাদের কথা ভাবার সময় নেই। কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে তোমার।'

এডেলের খাবার আনার জন্যে নিচে নেমে এলাম আমি। খাবার নিয়ে সোজা উঠে গেলাম ওপরে।

সেরাতে মিস্টার রচেস্টার আর তাঁর অতিথিদের দেখা পেলাম না

আমরা। পরদিন সকালে সবাই বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে। কেউ ঘোড়ায় চেপে কেউবা ক্যারিজে। মিস ইনগ্র্যামকে নিয়ে মিস্টার রচেস্টার ঘোড়ায় চাপলেন। অন্যদের চেয়ে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখলেন তাঁরা। সকলে চলে যেতেই মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স এসে বললেন, 'জেন, মিস্টার রচেস্টার বলেছেন এডেলকে নিয়ে ডিনারের পর নিচে যেতে হবে তোমাকে। ড্রইংরুমে।'

নিচে যাওয়ার সময় আমার সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পরে নিলাম। মুক্তোর ব্রৌচটাও লাগালাম। এডেলকে নিয়ে তারপর নেমে এলাম নিচে।

আটজন ভদ্রমহিলাকে দেখলাম ড্রইংরুমে। প্রত্যেকেই লম্বা। সুন্দরী। তাঁদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালাম আমি। দুএকজন কেবল প্রত্যুত্তর দিলেন। বাকিরা চেয়ে রইলেন আমার দিকে। মিস ইনগ্র্যামকে কাছ থেকে দেখলাম এবার। খুবই সুন্দরী তিনি। কোন সন্দেহ নেই তাতে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছেন মিস্টার রচেস্টার। চোখ তাঁর মিস ইনগ্র্যামের চোখে। এডেলের সঙ্গে পরিচয় হল ভদ্রমহিলাদের। আমি চুপচাপ বসে রইলাম এক কোণে। সবাই মেতে উঠল হাসি-আনন্দে, কথাবার্তায়। আমাকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেল সকলে। ভীষণ অপমানিত বোধ করলাম আমি। শেষমেশ মিস ইনগ্র্যাম গিয়ে বসলেন পিয়ানোর সামনে। পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইলেন।

'এখনই কেটে পড়ার সময়,' তাঁর বাজানো শেষ হলে ভাবলাম আমি।

পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। সরু একটা বারান্দা চলে গেছে হলরুমের দিকে। ওটা পেরোনর সময় হঠাৎ খুলে গেল স্যাণ্ডেলের ফিতে। ওটা লাগানর জন্যে ঝুঁকতেই শুনি ডাইনিংরুমের দরজা খুলল। সোজা হতেই দেখি মিস্টার রচেস্টার। কখন যে এ ঘরে এসেছেন জানিই না আমি। বহু লোকের ভিড়ে আসলে লক্ষ করতে পারিনি।

'কেমন আছেন, জেন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ভাল, স্যার।'

'আমার সঙ্গে ও ঘরে তখন কথা বললেন না কেন?'

'আসলে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।'

'খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে আপনাকে। কি হয়েছে, বলুন তো?'

'কই, কিছু হয়নি '

'ড্রইংরুমে চলুন।'

'ইচ্ছে করছে না, স্যার। বড় ক্লান্তি লাগছে।'

মুহূর্ত খানেক আমার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

'মন খারাপ?' বললেন তিনি। 'কি হয়েছে, আমাকে বলুন।'

'কিছু হয়নি, স্যার। মন ভালই আছে।'

'তার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি। ঠিক আছে, আজ রাতের মত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে রাখবেন যে ক'দিন মেহমানরা থাকবেন সে ক'দিন কিন্তু ড্রইংরুমে চাই আপনাকে। প্রতি সন্ধ্যায়। গুড নাইট, ডার–' শব্দটা শেষ করলেন না তিনি। ঠোঁট কামড়ে ধরে চলে গেলেন দ্রুত। আমি চলে এলাম ঘরে।

পরের সপ্তাহটা উৎসবমুখর পরিবেশে কেটে গেল। থর্নফিল্ড হলের সকলেই ব্যস্ত রইল। আমাকে যেন ভুলেই গেছেন মিস্টার রচেস্টার। তবে সেজন্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কমেনি আমার। কারণ এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করতে চলেছেন তিনি যার নখের যোগ্যও নই আমি।

এক স্যাঁতসেঁতে বিকেলে মিস্টার রচেস্টার ব্যবসার কাজে মিলকোট গেলেন।

সন্ধে বেলায় একটা শেজ এসে থামল গাড়িবারান্দায়। দরজার বেল বেজে উঠল। খানিক বাদে আগন্তুক হাজির হলেন ড্রইংরুমে। মিস ইনগ্র্যামকে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালেন তিনি। হয়ত ভাবলেন তিনিই এ বাড়ির কর্ত্রী।

'ভুল সময়ে এসে পড়লাম মনে হয়,' বললেন তিনি। 'আমার বন্ধু মিস্টার রচেস্টার তো বাড়িতে নেই। তবে অসুবিধে হবে না। আমি তাঁর ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

রোদে-পোড়া শরীর ভদ্রলোকের। লম্বা গড়ন। দেখে তাঁকে ইংরেজ বলে মনে হল না আমার। গলার স্বরটাও কেমন ভিনদেশীদের মত।

সে রাতে ড্রইংরুমে সবাই মিলিত হওয়ার পর জানলাম ভদ্রলোকের নাম ম্যাসন। জ্যামাইকা থেকে সদ্য ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা রেখেছেন। মিস্টার রচেস্টার হয়ত কখনও বেড়াতে গিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জ্যামাইকায়। সেখানেই হয়ত পরিচয় হয়েছে এঁর সঙ্গে, ভাবলাম আমি। মিস্টার রচেস্টারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা সবাই। তিনি ফেরার পর হলে ঢোকার সময় দেখা হল আমার সঙ্গে। আমাকে দেখে সুন্দর করে হাসলেন তিনি।

'স্যার,' বললাম তাঁকে। 'আপনি যাওয়ার পর আপনার এক বন্ধু এসেছেন।'

'কে এল আবার? নাম বলেছে?'

'বলেছেন, স্যার। মিস্টার ম্যাসন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এসেছেন।'

হঠাৎ আমার একটা হাত টেনে নিয়ে চেপে ধরলেন তিনি। মুছে গেছে হাসি।

'ম্যাসন! ওয়েস্ট ইণ্ডিজ!' বললেন তিনি। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাঁর মুখ। ধপ করে বসে পড়লেন তিনি। আমাকেও টেনে বসিয়ে দিলেন তাঁর পাশে। চাইলেন আমার চোখের দিকে।

'জেন,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আপনাকে নিয়ে যদি কোন নির্জন দ্বীপে চলে যেতে পারতাম!' তারপর বললেন, 'ডাইনিংরূম থেকে আমার জন্যে এক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে আসুন। ম্যাসন ও ঘরে রয়েছে কিনা এসে জানাবেন। লাইব্রেরিতে যাচ্ছি আমি।'

ডাইনিংরূমে গিয়ে দেখি সকলে খেতে ব্যস্ত। এখানে ওখানে জটলা করে খাচ্ছেন তাঁরা। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে প্লেট বা গ্লাস। ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিস্টার ম্যাসন, কথা বলছেন কর্নেল ডেন্টের সঙ্গে। গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে দ্রুত লাইব্রেরিতে ফিরে এলাম আমি।

'ম্যাসন কি করছে ওখানে?' আমার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বললেন তিনি।

'গল্প করছেন।'

'আবার ও ঘরে যান আপনি। ম্যাসনের কানে কানে বলবেন, আমি ওকে দেখা করতে বলেছি। ওকে এ ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার আসার দরকার নেই।'

তাঁর কথামতই কাজ করলাম আমি। লাইব্রেরিরূমে মিস্টার ম্যাসনকে পৌঁছে দিয়ে ওপরে চলে গেলাম। অনেক পরে রাত গভীর হলে শুনতে পেলাম মেহমানরা যে যার ঘরে চলে যাচ্ছেন। মিস্টার রচেস্টারের গলার আওয়াজ পেলাম এসময়। 'ম্যাসন, এদিকে এস, এ ঘরটা তোমার,' বললেন তিনি।

তাঁর গলার স্বরে আগের সেই চিন্তিত ভাবটা নেই। মনে হল বেশ ফুর্তিতেই রয়েছেন তিনি। হালকা হয়ে গেল আমার মনটা। নিশ্চিন্তে দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম।

রাতে পর্দা টেনে শুইনি। ফলে চাঁদের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল আমার। রূপালি থালাটার দিকে চেয়ে পর্দা টেনে দেয়ার জন্যে হাত বাড়ালাম।

এ সময় তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার করে উঠল কে যেন। থর্নফিল্ড হলের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল সে শব্দ। বাড়ানো হাতটা সেভাবেই রইল আমার। অসাড় হয়ে এল শরীর। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। তবে চিৎকারটা শোনা

গেল না আর।

তার পরপরই ঠিক আমার মাথার ওপরে ধস্তাধস্তির শব্দ পেলাম। অস্ফুট চিৎকার করল কেউ, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' তারপর বলল কে যেন, 'জলদি এস, রচেস্টার।'

দরজা খোলার শব্দ পেলাম। বারান্দা ধরে দৌড়ে গেল কেউ। পায়ের আওয়াজ শোনা গেল ওপরে। পড়ে গেল কি যেন। তারপর সব নিশ্চুপ।

জেগে উঠেছে সবাই। বুঝতে পারলাম আমি। বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। মেহমানদের সকলেই এখন ভিড় করেছে ওখানে। 'কি ব্যাপার?' 'কি হল?' 'ডাকাত পড়ল নাকি?' এ ধরনের প্রশ্ন করছে একে অন্যকে।

'রচেস্টার কোথায় গেল?' চিৎকার করে উঠলেন কর্নেল ডেন্ট। 'ঘরে নেই সে।'

এ সময় শোনা গেল হাঁক, 'এই যে আমি এখানে।' বারান্দার শেষ মাথার দরজাটা খুলে গেল। হাতে মোমবাতি নিয়ে হাজির হলেন মিস্টার রচেস্টার।

'ভয়ের কিছু নেই,' বললেন তিনি। তাঁর কালো চোখ জোড়া মোমের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। 'এক কাজের মহিলা দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়েছিল। এখন ভালই আছে। ঘরে ফিরে যান আপনারা।'

একে একে সকলেই ফিরে গেলেন ঘরে। আমিও ফিরলাম। তবে শুতে গেলাম না আর। ধস্তাধস্তির শব্দের পর যে কথাগুলো কানে এসেছিল আমার, তা বোধহয় শুনতে পায়নি আর কেউ। আমি জানি দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়ার কথাটা ঠিক নয়। এর পেছনে অন্য কোন ঘটনা আছে।

জানালার পাশে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। চোখ চলে গেল বাইরে। মাঠগুলো ছড়িয়ে রয়েছে বহুদূর পর্যন্ত। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভর করল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার নীরব হয়ে গেল থর্নফিল্ড হল। বিছানার দিকে এগোলাম আমি। জুতো খুলছি এমন সময় শুনতে পেলাম মৃদু শব্দ। কেউ সতর্ক হাতে টোকা দিচ্ছে আমার দরজায়।

এগারো

দরজার দিকে এগোলাম আমি।

'কে?' জিজ্ঞেস করলাম।

‘বাইরে আসুন। সাবধানে,’ মিস্টার রচেস্টারের গলা।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। হাতে মোমবাতি।

‘আপনার ঘরে স্পঞ্জ আছে?’ ফিসফিস করে জানতে চাইলেন মিস্টার রচেস্টার।

‘আছে।’

‘স্মেলিং সল্ট?’

‘আছে।’

‘দুটোই নিয়ে আসুন।’

আমি নিয়ে এলে পর বললেন, ‘এদিকে আসুন। কোন শব্দ করবেন না।’

বারান্দা ধরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন তিনতলার অন্ধকার বারান্দায়। কালো, ছোট একটা দরজার দিকে এগোলেন তিনি চাবি হাতে। তালায় চাবিটা ঢুকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘রক্ত দেখে নার্ভাস হয়ে পড়বেন না তো?’

‘মনে হয় না,’ বললাম। ‘তবে পরখ করার তেমন সুযোগও হয়নি কখনও।’

রোমাঞ্চ অনুভব করছি আমি। কেমন রহস্যময় ঠেকছে সব কিছু। তবে ভয় লাগছে না মোটেই।

‘হাতটা দেখি আপনার,’ বললেন তিনি। তাঁর হাতে হাত রাখলাম। ‘গরমই আছে দেখছি। ভয় পাননি তাহলে,’ হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন মিস্টার রচেস্টার। দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি এবার।

ঘরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘরে আগেও এসেছি। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের সাথে যেদিন পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখেছিলাম সেদিন এসেছিলাম এ ঘরে। পর্দা টাঙানো ছিল তখন ঘরটায়। কিন্তু এখন দেখলাম পর্দাটা একপাশে সরানো। তার ঠিক পেছন দিকেই একটা দরজা। খোলা। ভেতরে আলো জ্বলছে। ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ কানে এল। বেড়ালদের ঝগড়ার মত শোনাল শব্দটা। মিস্টার রচেস্টার শব্দটা শোনামাত্রই নিভিয়ে দিলেন মোমবাতিটা। আমাকে বললেন, ‘এক মিনিট দাঁড়ান।’ দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। চিৎকার করে হেসে উঠল কেউ। অভ্যর্থনা জানানো হল যেন মিস্টার রচেস্টারকে। ঘরে ঢুকেছেন বলে। হাসিটা মিলিয়ে গেল দ্রুত। তবে গলাটা চিনতে অসুবিধে হল না আমার। গ্রেস হল। ও ঘরে রয়েছে সে।

কাউকে যেন নিচু স্বরে কথা বলতে শুনলাম। তার পরপরই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন মিস্টার রচেস্টার।

'এদিকে আসুন,' বললেন তিনি। একটা বিশালাকৃতির বিছানার পাশে নিয়ে গেলেন আমাকে। পর্দা দিয়ে ঢাকা ওটা। ঘরের বিরাট জায়গা দখল করে রেখেছে বিছানাটা। বিছানার মাথার কাছে এক লোক বসে রয়েছে। ইজি চেয়ার পেতে। মাথাটা পেছন দিকে হেলানো। চোখ বোজা, মিস্টার রচেস্টার মোমবাতিটা জ্বাললেন। লোকটির মুখের কাছে ওটা ধরতেই মিস্টার ম্যাসনকে চিনতে পারলাম। মলিন, নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে তাঁকে। শার্টটা ফেলে রেখেছেন কাঁধের ওপর। একটা বাহু রক্তাক্ত।

'মোমবাতিটা ধরুন,' আমার হাতে ওটা ধরিয়ে দিলেন মিস্টার রচেস্টার। পানিভর্তি একটা জগ ওয়াশ স্ট্যাণ্ড থেকে নিয়ে এলেন তিনি। জগটা ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। তারপর ওতে স্পঞ্জ চুবিয়ে ঘর্মাক্ত, ফ্যাকাসে মুখটা মুছে দিতে লাগলেন।

স্মেলিং সল্টের শিশি চাইলেন আমার কাছে। ওটা দিতেই মিস্টার ম্যাসনের নাকের নিচে চেপে ধরলেন শিশিটা।

চোখ মেললেন মিস্টার ম্যাসন। গুঙিয়ে উঠলেন। তাঁর শার্টটা সরিয়ে দিলেন মিস্টার রচেস্টার। কাঁধ আর বাহুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেখান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ক্ষতস্থানগুলোতে স্পঞ্জটা চেপে ধরলেন মিস্টার রচেস্টার।

'খুব সিরিয়াস?' বিড়বিড় করে জানতে চাইলেন মিস্টার ম্যাসন।

'আরে না, সামান্য আঁচড় লেগেছে কেবল। কালই চলে যেতে পারবে তুমি,' বললেন মিস্টার রচেস্টার। তারপর ডাকলেন আমাকে, 'জেন!'

'ইয়েস, স্যার?'

'ঘণ্টা দুয়েক এর সঙ্গে থাকতে হবে আপনাকে। এ ঘরে। রক্ত বেরোলেই স্পঞ্জ ব্যবহার করবেন। তবে কোন কথা বলতে পারবেন না। রিচার্ড, তুমিও না। মনে থাকে যেন।'

মিস্টার ম্যাসন কিছু বললেন না। গুঙিয়ে উঠলেন কেবল। লাল হয়ে ওঠা স্পঞ্জটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার রচেস্টার। তালা লেগে গেল দরজায়। মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

তিন তলার রহস্যময় একটা ঘরে আটকা পড়লাম আমি। আহত এক মানুষ বসে রয়েছেন আমার সামনে। তিনিও কম রহস্যময় নন। রাত অনেক এখন। দরজার ঠিক ওপাশেই ওঁত পেতে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর খুনী মহিলা। যদি বেরিয়ে আসে হঠাৎ! ভাবনাটা মাথায় আসতেই ভয়ে কেঁপে উঠল আমার সারা শরীর।

দীর্ঘ মুহূর্তগুলো যেন কাটতেই চাইছে না। রাতের এ সময় পর্যন্ত মাত্র তিনটি শব্দ কানে এসেছে আমার। একজনের পায়ের শব্দ, সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার আর গুরুগম্ভীর স্বরের গোঙানি।

কি যে ঘটছে থর্নফিল্ড হলে কে জানে। প্রথমে আগুন ধরল তারপর রক্তাক্ত মানুষ, এখন আবার নিস্তব্ধ রাতে উটকো শব্দ কানে আসছে। আর এই ভদ্রলোকই বা রাতের বেলা এখানে এসেছিলেন কেন? এখন তো তাঁর অঘোরে ঘুমানর কথা। মিস্টার রচেস্টারই বা কেন এই আহত লোকটিকে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন?

রাত অনেক এখন। কারও দেখা নেই। মিস্টার ম্যাসনকে আগের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল আর অসুস্থ দেখাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও ভয় করছে আমার। ভদ্রলোক মারাই যান কিনা কে জানে।

নিভে গেছে মোমবাতি। জানালার পর্দা ভেদ করে ধূসর আলো এসে পড়েছে ঘরে। নিচে পাইলটকে ঘেউ ঘেউ করতে শুনলাম। মিনিট পাঁচেক পরে মিস্টার রচেস্টার তালা খুলে ঘরে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে সার্জন। এঁকেই আনতে গিয়েছিলেন তিনি।

'কার্টার, যা করার জলদি কর,' ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন মিস্টার রচেস্টার। 'আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওকে নিচে নামিয়ে নিতে হবে।'

ভারী পর্দা টেনে দিলেন তিনি। সার্জন ঝুঁকে পড়ে মিস্টার ম্যাসনের ব্যাণ্ডেজগুলো খুলে ফেললেন। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন মিস্টার ম্যাসন।

'কাঁধের মাংস ছিঁড়ে গেছে। কেটেওছে,' বললেন সার্জন। 'ছুরির কাটা নয় এটা। দাঁত বসানো হয়েছে।'

'আমাকে কামড়েছে,' বিড়বিড় করে বললেন মিস্টার ম্যাসন। 'রচেস্টার ছুরিটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়ার সময়। উফ্, কি ভয়ঙ্কর ব্যথা।'

'আগেই বলেছিলাম,' তাঁর বন্ধু বললেন। 'একা যেয়ো না ওর কাছে।' তারপর মিস্টার কার্টারকে বললেন, 'জলদি কর, কার্টার। সূর্য ওঠার আগেই ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'অন্য হাতটাও দেখতে হবে। ক্ষত রয়েছে,' বললেন সার্জন। 'ওখানেও কামড় বসিয়েছে নিশ্চয়ই।'

'আমার রক্ত শুষে নিয়েছে। বলেছে কলজেটাও চিবিয়ে খাবে,' মিস্টার ম্যাসন কোনমতে বললেন।

মিস্টার রচেস্টারকে কেঁপে উঠতে দেখলাম।

'চুপ কর, রিচার্ড,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

সার্জন পরিচর্যা শেষ করলেন। মিস্টার রচেস্টারের কোট পরানো হল

তাঁর বন্ধুকে। আমাকে পাঠানো হল নিচে। বাড়ির পাশের দিককার একটা দরজা খুলে দেয়ার জন্যে। উঠনে নেমে এসে দেখি গেটগুলো খুলে রাখা হয়েছে। একটা কোচ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘোড়া জোতা রয়েছে কোচে।

ধরাধরি করে মিস্টার ম্যাসনকে আনা হল নিচে। কোচে ওঠানো হল। সার্জনও উঠলেন তাঁর সাথে।

'ওকে দেখে রাখবে,' বললেন মিস্টার রচেস্টার। 'ও সেরে না ওঠা পর্যন্ত তোমার বাড়িতেই থাকবে। দু'একদিনের মধ্যেই খোঁজ নিতে আসব আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন কার্টার। বেরিয়ে গেল কোচ। এবার আমার দিকে ফিরলেন মিস্টার রচেস্টার।

'অনেক কষ্ট দিলাম, জেন। মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছেন না তো?'

'অভিশাপ? আপনাকে? মাথা খারাপ নাকি?'

আমার হাতটা টেনে নিলেন তিনি।

'আঙুলগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,' বললেন তিনি। 'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, জেন–'

পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল হঠাৎ। চমকে হাতটা ছেড়ে দিলেন মিস্টার রচেস্টার। সরে গেলেন আমার কাছ থেকে।

কর্নেল ডেন্ট আর লিন এসেছেন আস্তাবলে। আমরা দুজন দুদিকে সরে পড়লাম।

মিস্টার রচেস্টারকে তাঁদের উদ্দেশ্যে উৎফুল্ল গলায় বলতে শুনলাম, 'ম্যাসন সূর্য ওঠার আগেই চলে গেছে। ওকে বিদায় জানানর জন্যে চারটের সময় উঠতে হয়েছে আমাকে।'

বারো

মিস্টার ম্যাসন চলে যাওয়ার দুদিন পর মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরে ডাক পড়ল আমার। নিচে নেমে দেখি এক লোক অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। দেখে মনে হল কর্মচারী গোছের কেউ।

আমি ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সে। 'আমাকে মনে হয় চিনতে পারেননি, মিস। আমি লিভেন। মিসেস রীডের কোচোয়ান।'

'ও, লিভেন? কেমন আছ? তোমার না বেসীকে বিয়ে করার কথা ছিল?

ও কেমন আছে?'

'ভাল আছে, মিস, বৌ আর তিন বাচ্চা নিয়ে সুখেই কাটছে আমাদের।'

'ও বাড়ির ওরা কেমন আছে?'

'ভাল নেই, মিস।'

'কেন কি হয়েছে? কেউ মারা যায়নি তো?' ওর কালো পোশাকের দিকে এক ঝলক চেয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'মিস্টার জন মারা গেছেন।'

'মিস্টার জন?'

'ইয়েস, মিস।'

'কি হয়েছিল তার?'

'আজেবাজে লোকজনের সঙ্গে মিশে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রচুর দেনা করেছিলেন। জেলেও গিয়েছিলেন। দুবার জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন তাঁর মা। তবুও শোধরাননি। শেষে সপ্তাহ তিনেক আগে গেটশেডে এসেছিলেন। সব সম্পত্তি তাঁর নামে লিখিয়ে নেয়ার জন্যে। মিসেস রীড রাজি হননি। ফলে লণ্ডনে ফিরে গিয়েছিলেন আবার। ওখানেই মারা গেছেন। সবার ধারণা আত্মহত্যা করেছেন।'

চুপ করে রইলাম আমি। লিভেন আবার বলতে লাগল, 'মিসেস রীডের শরীর স্বাস্থ্য একদম ভেঙে গেছে। বোধহয় খুব বেশিদিন আর বাঁচবেন না। বেসীকে বলেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি। সেজন্যেই এসেছি। কাল ভোরে যদি আমার সঙ্গে একবার গেটশেডে যেতেন, মিস–'

'যাব, লিভেন। মনে হচ্ছে আমার যাওয়া উচিত।' লিভেনকে কাজের লোকদের ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। জন আর তার স্ত্রীকে বলে দিলাম ওর দিকে খেয়াল রাখার জন্যে। আমি চললাম মিস্টার রচেস্টারের খোঁজে। ছুটি নিতে হবে। বিলিয়ার্ড রূমে মিস ইনগ্র্যামের সঙ্গে তখন খেলছেন মিস্টার রচেস্টার। আমি দরজায় দাঁড়াতেই অবহেলার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন মিস ইনগ্র্যাম। মিস্টার রচেস্টার দেখতে পাননি আমাকে। মিস ইনগ্র্যাম বললেন, 'ও বোধহয় তোমাকে খুঁজছে।'

কে খুঁজছে দেখার জন্যে ঘুরলেন মিস্টার রচেস্টার। আমাকে দেখে কৌতূহলী হলেন। খেলা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

'কি ব্যাপার, জেন?'

'কদিনের ছুটি চাই, স্যার।'

'হঠাৎ? কোথাও যাবেন নাকি?'

'ইয়েস, স্যার। এক অসুস্থা মহিলাকে দেখতে যাব।'

'ও আচ্ছা। তা থাকবেন কদিন?'
'খুব বেশিদিন নয়।'
'এক সপ্তাহের বেশি থাকতে পারবেন না কিন্তু।'
'কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করব।'
'কার সঙ্গে যাবেন?'
'ভদ্রমহিলা লোক পাঠিয়েছেন।'
'বিশ্বস্ত?'
'ইয়েস, স্যার।'
'কখন রওনা দেবেন?'
'কাল ভোরে।'
'সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে তো?'
'আছে স্যার, পাঁচ শিলিং।'

হেসে ফেললেন মিস্টার রচেস্টার। পকেট থেকে দশ পাউণ্ডের একটা নোট বার করে বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। ওটা নিলাম আমি। এ বাড়িতে আসার পর এই প্রথম টাকা নিলাম। এতদিন বেতন নিইনি।

'জেন!'
'বলুন, স্যার।'
'কথা দিন ফিরে আসবেন।'
'কথা দিলাম, স্যার।'
'ধন্যবাদ, জেন। আজ রাতে ড্রইংরুমে আসছেন তো?'
'না, স্যার। কালকের জন্যে তৈরি হতে হবে।'
'তার মানে আর দেখা হচ্ছে না?'
'তাই তো মনে হয়।'
'গুডবাই, জেন।'
'গুডবাই।'

আর কোন কথা না বলে ডাইনিংরুমের দিকে চলে গেলেন তিনি।

আমি রওনা দিলাম পরদিন ভোরে। এর মধ্যে আর দেখা হয়নি তাঁর সাথে।

বিকেলে পৌঁছলাম গেটশেডে। আমাকে কোচ থেকে নামতে দেখে ছুটে এল বেসী।

'কতদিন পর দেখলাম! কেমন আছ, জেন? জানতাম তুমি আসবে।' একটানা কথাগুলো বলে গেল সে।

ওর গালে চুমু খেলাম আমি। 'তুমি ভাল আছ তো? মিসেস রীড

কোথায়? কেমন আছেন?'

'আমি ভালই আছি। মিসেসের অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার বলেছেন বড় জোর আর সপ্তাহ দুয়েক।'

আমাকে নিয়ে ভেতরে গেল বেসী। এ-ই সেই গেটশেড। নয় বছর আগে বেরিয়ে গিয়েছিলাম এ বাড়ি থেকে। কি তীব্র বিতৃষ্ণাই না জন্মেছিল এ বাড়ির মানুষগুলোর প্রতি। এখন অবশ্য তার ছিটেফোঁটাও অনুভব করছি না আমি।

আমাকে নাস্তার টেবিলে নিয়ে গেল বেসী। খানিক বাদে দুই তরুণী ঢুকল ঘরে। এলিজা আর জর্জিয়ানা। ওদের চিনতে খুব একটা কষ্ট হল না আমার।

আমরা সকলে বসলাম টেবিলে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি সবাই। ওরা আমাকে 'মিস আয়ার' বলে সম্বোধন করছে। আমার যাত্রা সম্পর্কে দুএকটা গতানুগতিক প্রশ্ন করল ওরা। আমিও জবাব দিলাম ঠাণ্ডাভাবে। এভাবে বেশ অনেকক্ষণ চলার পর জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'মিসেস রীড এখন কেমন আছেন?'

'মিসেস রীড? ও, মায়ের কথা বলছ? না, ভাল নেই,' জর্জিয়ানা বলল।

এভাবে কাটল আরও খানিকক্ষণ। আমার বিশ্রাম নেয়া দরকার। তাছাড়া মিসেস রীডের সঙ্গে এখনই দেখা করা যাবে কিনা জানার জন্যে বেসীর সঙ্গে কথা বলতে চললাম আমি। ওর সঙ্গে দেখা হল বাইরে। ওকে বললাম একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে। ঘর ঠিক হলে আমার ট্রাঙ্কটাও সেখানে নেয়ার ব্যবস্থা করলাম।

'মিসেস জেগে রয়েছেন,' বেসী বলল। 'তোমার কথা বলেছি তাঁকে। চল, দেখা যাক চিনতে পারেন কিনা।'

পরিচিত ঘরটার উদ্দেশে পা বাড়ালাম আমি। আমাকে চিনিয়ে দিতে হল না। এ ঘরে কত অসংখ্যবার যে ডাক পড়েছে আমার তার ঠিক নেই। প্রায় নিয়মিতই মন খারাপ করে বেরিয়েছি এ ঘর থেকে।

আস্তে করে ঘরের দরজাটা খুললাম আমি। ভেতরে ঢুকে সেই পরিচিত মুখটা দেখতে পেলাম। আগের মতই মনে হল আমার কাছে। কঠোর, উদ্ধত। তাঁর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলাম।

'তুমি জেন আয়ার?' বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, মামী, ভাল আছেন?' তাঁকে আর কোনদিন মামী বলে ডাকার ইচ্ছে ছিল না। এবং সেজন্যে আমার মনে কোন অন্যায়বোধও আসেনি। তাঁর একটা হাত চাদরের বাইরে। বুকের ওপর রাখা। হাতটা চেপে

ধরলাম। মিসেস রীড যা করলেন তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমি। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

চোখে পানি এসে গেল আমার। তবে সামলেও নিলাম দ্রুত। এ ব্যবহারের সঙ্গে তো আমি অভ্যস্ত। একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসলাম তাঁর শিয়রে। ঝুঁকে পড়লাম বালিশের ওপর।

'তুমি জেন আয়ার?' আবারও একই প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ। জেন আয়ার।'

'ওর মত বদমাশ মেয়ে আর দুটো দেখিনি। বেয়াড়া, বেয়াদব, বদমেজাজী। ওকে তাড়িয়ে বেঁচেছিলাম আমি। এত মেয়ে মরল লোউডে-ও মরল না। মরলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হত না।'

'ওকে এত ঘৃণা করেন আপনি?' বললাম আমি।

'ওর মা ছিল আমার দু চোখের বিষ। আমার স্বামীর একমাত্র বোন ছিল সে, খুব আদরের। বোন মারা যাওয়াতে লোকটার সে কি কান্না। বোনের বদমাশ বাচ্চাটাকে নিয়ে এল সে। আর নিজের ছেলে মেয়ের চেয়েও বেশি আদর যত্ন শুরু করল। রাগে পিত্তি জ্বলে যেত আমার।'

তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'আমার মনে হয় এখন চলে যাওয়া উচিত,' বেসীকে বললাম আমি। বিছানার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'আসলে রাতের বেলা মাথার ঠিক থাকে না ওঁর। সকালে ঠাণ্ডা হয়ে আসেন। তুমি কিছু মনে করো না,' আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল বেসী।

উঠে পড়লাম আমি। 'দাঁড়াও,' চিৎকার করে বললেন মিসেস রীড। 'আমাকে ভয় দেখায় ও। মৃত্যুভয়। টাকা কোথায় পাব আমি? কি করব? ভীষণ বিপদ।'

উল্টো-পাল্টা বকতে লাগলেন তিনি। বেসী জোর করে ওষুধ খাইয়ে দিল তাঁকে। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলেন তিনি। ঘুমিয়ে পড়লেন। চলে এলাম আমি ও ঘর থেকে।

দিন দশেক পরের কথা। এর মধ্যে আর কথা হয়নি মিসেস রীডের সঙ্গে। ইতিমধ্যে জর্জিয়ানা আর এলিজার সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে আমার।

কি মনে হতে সেদিন মিসেস রীডকে দেখার ইচ্ছে হল। কেমন আছেন জানা দরকার। উঠে গেলাম ওপরে। চলে গেলাম তাঁর ঘরে। লক্ষ্য করল না কেউ।

আমি ঘরে ঢুকতেই মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কে ওখানে?'

'মামী, আমি,' এগিয়ে গিয়ে বললাম।

'আমি কে?' আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। চিনতে পারেননি।

'আমি জেন আয়ার।'

'ও, আচ্ছা। তোমার সাথে কিছু কথা আছে। আর কেউ নেই তো ঘরে?' থেমে থেমে বললেন তিনি।

জানালাম আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

'আমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে একটা চিঠি আছে। পড় ওটা।'

ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বার করলাম আমি। ভাঁজ করা রয়েছে।

খুলে দেখলাম অল্প কিছু কথা লেখা:

'ম্যাডাম,

আমার ভাতিজি জেন আয়ারের ঠিকানাটা জানালে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি চাই ও আমার কাছে চলে আসুক। আমার সঙ্গে থাকুক। আমি বিয়ে থা করিনি। ফলে আমার মৃত্যুর পর সব সম্পত্তি তাকেই দিয়ে যেতে চাই।

ইতি–জন আয়ার, ম্যাডেরিয়া।'

তিন বছর আগের তারিখ লেখা রয়েছে ওতে।

'আমাকে আগে জানাননি কেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি চাইনি তুমি অগাধ সম্পত্তির মালিক হও। তোমার বেয়াদবি ভুলতে পারিনি আমি। পারবও না। তোমার চাহনি আমার অসহ্য লাগত– পানি! ওহ! জলদি দাও।'

পানি এনে খাইয়ে দিলাম তাঁকে। 'মিসেস রীড, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। ছোটবেলায় মানুষ না বুঝে কত কিছুই তো করে,' বললাম তাঁকে।

'ওসব শুনতে চাই না আমি। আমাকে জ্বালানর জন্যেই জন্ম হয়েছে তোমার। তুমি আরামে থাকবে তা হতে পারে না। তাই তোমার চাচাকে জানিয়ে দিয়েছি টাইফাস জ্বরে মারা গেছ তুমি। লোউড স্কুলে পড়ার সময়। এখন চাইলে তাঁকে চিঠি লিখতে পার। জানাতে পার মিথ্যে কথা লিখেছিলাম আমি। তোমার যা ইচ্ছে তাই কর গিয়ে–'

খানিক বাদে নার্স এসে ঢুকল ঘরে। মিসেস রীডের শুশ্রূষার জন্যে রাখা হয়েছে তাকে। বেসীও এল তার পেছন পেছন। এর মধ্যে আরেকবার পানি খেতে চেয়ে ছিলেন মিসেস রীড। খাইয়েছি।

রাত বারোটার দিকে মারা গেলেন মিসেস রীড। তখন অবশ্য আমি উপস্থিত ছিলাম না সেখানে। এলিজা আর জর্জিয়ানাও ছিল না ও ঘরে।

আমার প্রতি তীব্র ঘৃণা বুকে নিয়ে চিরবিদায় নিলেন মিসেস রীড।

আমাকে এক সপ্তাহের ছুটি দিয়েছিলেন মিস্টার রচেস্টার। কিন্তু গেটশেড ছাড়তে ছাড়তে পেরিয়ে গেল একটা মাস। শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার পরপরই রওনা দেয়ার ইচ্ছে ছিল আমার।

জর্জিয়ানার অনুরোধে থাকতে হল এতদিন। সে লণ্ডনে চলে যাবে তার মামার কাছে। যতদিন না যাওয়া হচ্ছে ততদিন থাকতে বাধ্য হলাম আমি। কারণ এলিজার সঙ্গে থাকতে কিছুতেই রাজি নয় সে। এলিজা নাকি ওকে বোঝে না। মন খারাপ হলে সান্ত্বনা দেয় না। লণ্ডনে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় না–এই সব আর কি।

জর্জিয়ানা চলে যাওয়ার পর এল এলিজার অনুরোধ। ফলে থাকতে হল আরও সাতদিন। সাতদিন পর এলিজা জানাল একটা আশ্রমে চলে যাবে সে। সন্ন্যাসিনীর জীবন বেছে নেবে।

এবার রওনা হতে পারব আমি।

তেরো

থর্নফিল্ড হলে ফিরে এলাম। মেহমানরা চলে গেছেন ইতিমধ্যে। কোন রকম বৈচিত্র্য ছাড়াই কেটে যেতে লাগল দিন। তারপর চব্বিশে জুন ঘটল সেই অকল্পনীয় ঘটনা।

চাঁদের আলোয় ফল বাগানে হাঁটছিলাম আমি। দূর থেকে ভেসে আসছিল নাইটিঙ্গেলের গান। সবকিছুই বড় মনোরম লাগছিল। এ সময় পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মিস্টার রচেস্টার। আমার দিকে তাঁকে আসতে দেখে বাড়ির পথে দ্রুত পা বাড়ালাম।

'জেন,' ডাকলেন তিনি। 'এমন চমৎকার রাতে ঘরে বসে থাকা বোকামি। চলুন না হেঁটে আসি।'

তাঁর কথা ফেলতে পারলাম না আমি।

'জেন,' বললেন তিনি। 'গরমের দিনে এখানে দারুণ লাগে। তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'থর্নফিল্ড নিশ্চয়ই ভাল লাগছে আপনার। এডেল আর মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকেও ভাল লাগে নিশ্চয়ই।'

'অবশ্যই, স্যার। এখানকার সবাইকেই ভাল লাগে আমার।'

'ওদের ছেড়ে যেতে খারাপ লাগবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিছু করার নেই,' বললেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন খানিক, তারপর বললেন, 'আপনাকে থর্নফিল্ড ছাড়তে হবে।'

হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল আমার। 'থর্নফিল্ড ছাড়তে হবে? কেন?'

'কারণ আছে। পরে বলব। আমি দুঃখিত, জেন।' প্রচণ্ড আঘাত পেলেও প্রকাশ করলাম না আমি। কিছুতেই মাথা নোয়াব না।

'ঠিক আছে, স্যার,' বললাম আমি। 'নির্দেশ পেলেই চলে যাব।'

'আজ রাতেই নির্দেশ পাবেন।'

'আপনি বিয়ে করছেন?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'শীঘ্রি?'

'খুব শীঘ্রি, ডার-মিস আয়ার। এডেলকে স্কুলে পাঠাব। সুতরাং আপনাকে আর প্রয়োজন পড়বে না।'

'আমি বিজ্ঞাপন দেব,' কথাটা বলার সময় গলা কেঁপে উঠল আমার।

'মাসখানেকের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলব,' বলে চললেন মিস্টার রচেস্টার। 'অবশ্য এর মধ্যে আপনার জন্যে একটা চাকরি খুঁজে দেব।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আসুন, জেন, ওখানটায় গিয়ে বসি। আর হয়ত কোনদিন এমন সুযোগ আসবে না।'

বিশাল একটা চেস্টনাট গাছের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি আমাকে। গাছটার গোড়ার চারপাশে বেঞ্চ পাতা রয়েছে। সেখানে বসলাম আমরা।

'জেন,' তিনি বললেন। 'শুনেছেন নাইটিঙ্গেলটা কি মিষ্টি সুরে গাইছে।'

আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। ফুঁপিয়ে উঠলাম। অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন মিস্টার রচেস্টার।

'আমার থর্নফিল্ডে আসাই উচিত হয়নি,' কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি।

'থর্নফিল্ড ছাড়তে কষ্ট হবে খুব?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'অসম্ভব কষ্ট হবে। আমি থর্নফিল্ডকে ভালবেসে ফেলেছি। বাড়ির লোকজনকেও। এখান থেকে চলে গেলে চিরকালের মত হারিয়ে ফেলব আপনাকে। এর চেয়ে আমার মরাও ভাল,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম।

'মরার কথা বলছেন কেন?'

'বলবই তো। আর আমি মরলে আপনিই দায়ী হবেন।'

'কেন?'

'কেন আবার? আপনার বউয়ের জন্যেই তো সরিয়ে দিচ্ছেন আমাকে। আমি কিছু জানি না মনে করেছেন?'

'আমার বউ? কে বউ? আমার কোন বউ নেই।'

'নেই। কিন্তু হবে তো।'

'তা হবে, তা তো হবেই,' দাঁত বার করে হাসলেন তিনি।

'কাজেই যেতে হচ্ছে আমাকে। তাছাড়া আপনি নিজেই যেতে বলেছেন।'

'না, যাবে না তুমি।'

'যেতে আমাকে হবেই,' প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলাম আমি। 'গরীব হতে পারি, কিন্তু মন আমারও আছে। আপনি কি ভেবেছেন আপনার অবহেলা সয়ে এখানে পড়ে থাকব আমি?'

'না, জেন,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে। তাঁর ঠোঁটজোড়া চেপে বসল আমার অধরে। 'আমি জানি তোমার মনের খবর।'

'আমাকে ছেড়ে দিন!' চিৎকার করে উঠলাম আমি। ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সোজাসুজি চাইলাম তাঁর চোখের দিকে।

'জেন,' বললেন তিনি। 'আমার সবকিছু তো শুধু তোমারই জন্যে। তুমি বোঝ না?'

'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন,' তীক্ষ্ণ গলায় বললাম আমি।

'মোটেই না,' আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

চুপ করে রইলাম। বিশ্বাস হল না তাঁর কথা।

'জেন, এদিকে এস।'

'না। আপনার বউ আমাদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এক টানে কাছে এনে ফেললেন আমাকে। 'তুমিই আমার বউ,' বললেন তিনি। 'জেন, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? বল, জেন। বল করবে?'

তবু চুপ করে রইলাম আমি। তাঁর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম আবার। তাঁর কোন কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না।'

'আমার ওপর আস্থা নেই তোমার?'

'না, একটুও নেই।'

'আমাকে মিথ্যেবাদী বলতে চাও?' আবেগে কেঁপে উঠল তাঁর গলা। 'মিস ইনগ্র্যামকে ভালবাসি না আমি। সে-ও ভালবাসে না আমাকে। ও আর ওর মা চেনে শুধু টাকা। ওদের ঘৃণা করি আমি। আমি ভালবাসি এই তোমাকে—যে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ আমার সামনে। নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।'

'মিস্টার রচেস্টার, চাঁদের আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়ান।' চোখ মুছে বললাম আমি।

'কেন?'

'আমি দেখতে চাই আপনার চোখ কি বলে।'

আমার কথামত দাঁড়ালেন মিস্টার রচেস্টার। তাঁর চোখের দিকে চাইলাম আমি। বুঝলাম মিথ্যে বলছেন না তিনি। তাঁর মনের কথাগুলোই বলেছেন এতক্ষণ।

'আপনি কি সত্যিই আমাকে ভালবাসেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'সত্যিই আমাকে স্ত্রী হিসেবে চান?'

'সত্যিই চাই। শপথ করে বলছি।'

'তাহলে আমি রাজি।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার রচেস্টার। দুজনে পাশাপাশি বসে রইলাম বেঞ্চে। দীর্ঘক্ষণ। আমার কানে কানে কথা বললেন তিনি। গালে গাল ঠেকিয়ে বসে রইলাম আমরা। কোন্ ফাঁকে পেরিয়ে গেল সময় টেরই পেলাম না।

হঠাৎ যেন ছায়া ঢেকে ফেলল আমাদের। চাঁদ রয়েছে আকাশে। তবু ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না এখন আমি। শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে শুরু করল। ভীষণভাবে দুলছে গাছগুলো।

'ঝড় আসছে,' ও বলল। 'চল, ঘরে যাই।'

'তার আগে একটা কথা বল,' বললাম আমি। 'মিস ইনগ্র্যামকে বিয়ে করবে এমন ভাব দেখিয়েছিলে কেন? কেন আমাকে এতদিন এত কষ্ট দিলে?'

'আমি তোমার মধ্যে ঈর্ষা জাগাতে চেয়েছিলাম। তোমাকে আমার প্রেমে পাগল করতে চেয়েছিলাম। প্রথম যেদিন দেখলাম তোমাকে সেদিনই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। তুমি বোঝনি, তাই না?'

আমার আর জবাব দেয়া হল না। বিজলী চমকাল আকাশে। তারপর প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। মুষলধারে নামল বৃষ্টি।

আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ছুটল রচেস্টার। তবে বাড়িতে পৌঁছনর আগেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেলাম দুজনেই।

'ঘরে গিয়ে শিগগির কাপড় পাল্টে নাও,' বলল ও। 'গুড নাইট, ডারলিং।'

কথাটা বলেই আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুলল সে। ওর বাহুডোর থেকে অতিকষ্টে নিজেকে মুক্ত করে দেখি মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাদের দেখছেন। তাঁর চোখ-মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। রাজ্যের বিস্ময় এসে জড়ো হয়েছে সেখানে।

'পরে সব জানাব তাঁকে,' ভাবলাম আমি। উঠে এলাম ওপরে। আমার ঘরে। বুকের ভেতর যেটা অনুভব করছি সেটাকে কি বলব–সুখ, আনন্দ, বিস্ময় সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একে ভালবাসা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। ভাবা উচিতও নয়।

একনাগাড়ে দুঘণ্টা প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়ল। সেই সঙ্গে বিজলীর চমকানি আর বাজের বিকট শব্দ। রচেস্টার তিনবার এসে বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল আমি ভয়-টয় পাচ্ছি কিনা। আমি আসলে এখন আর ভয় পাচ্ছি না। তার বদলে অসম্ভব নিরাপদ বোধ করছি। আমি আর একা নই। আমার পাশে দাঁড়ানর মত একজন মনের মানুষ পেয়েছি।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেছি। বিছানা ছাড়িনি তখনও। এডেল ছুটে এল আমার ঘরে। বলল চেস্টনাট গাছটায় রাতের বেলা বাজ পড়েছে। ভেঙে পড়ে গেছে ওটার অর্ধেকখানি।

চোদ্দ

একটা মাস কেটে গেল। জীবনের সেরা দিনগুলো কাটালাম আমি এ মাসটায়। তারপর এসে গেল আমার বিয়ের দিন।

সোফি মানে কাজের মেয়েটি সাতটার দিকে আমাকে বিয়ের সাজে সাজাতে এল। অনেক সময় নিয়ে সাজাল সে। ফলে রচেস্টার অধৈর্য হয়ে নিচ থেকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম আমি। সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল ওর সাথে। আমাকে নিয়ে ডাইনিংরুমে গেল ও।

'দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। নাস্তা সেরে নাও,' বলল সে।

বেল বাজাল রচেস্টার। ফুটম্যান এলে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জন

ক্যারিজ রেডি করছে?'

'ইয়েস, স্যার,' বলল ফুটম্যান।

'গির্জায় গিয়ে দেখ মিস্টার উড আছেন কিনা। ফিরে এসে জানাবে আমাকে।'

বাড়ির একেবারে কাছেই গির্জা। ফলে ফুটম্যান ফিরে এল প্রায় তখনই।

'মিস্টার উড ভেসট্রিতে রয়েছেন, স্যার। পোশাক পরছেন।'

'ক্যারিজের কি খবর?'

'ঘোড়া জোতা হচ্ছে, স্যার।'

'গির্জায় ক্যারিজ নেয়ার দরকার নেই, তবে ফেরার সময় ওটা রেডি রাখতে হবে। কোচোয়ানকে বলে রাখবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'জেন, তুমি তৈরি তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম আমি। উঠে দাঁড়ালাম। বিয়ে হতে যাচ্ছে আমাদের। কিন্তু রচেস্টার আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। কোন অতিথি নেই। ব্রাইডমেইড নেই, কেবল মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স আমরা রওনা দেয়ার সময় হলরুমে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গির্জার গেটে এসে দাঁড়াল রচেস্টার। পুরানো বাড়িটা দারুণ শান্ত আর নিঝুম মনে হল আমার কাছে। একটা কাক গির্জার চূড়া ঘিরে পাক খাচ্ছে। লাল হয়ে রয়েছে সকাল বেলার আকাশ। দুজন অপরিচিত লোককে দেখলাম দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ খানিকটা দূরে।

আমাকে নিয়ে গির্জার বারান্দায় উঠে এল রচেস্টার।

আমরা ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ধর্মযাজক তাঁর সাদা আঙরাখা পরে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যাজক। সব গতি থেমে গেছে যেন এখানে এসে। কেবল দূরে এক কোণে দুটো ছায়া নড়তে দেখলাম। সেই লোকদুটি আমাদের আগেই ঢুকে পড়েছে গির্জায়। পুরানো একটা স্মৃতিস্তম্ভের দিকে তাদের দৃষ্টি। আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পেছনে এসময় পায়ের শব্দ হল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ওদের একজন এগিয়ে আসছে গির্জার পুব কোণ থেকে।

আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ হল। চলল বেশ অনেকক্ষণ, শেষে ধর্মযাজক রচেস্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই ভদ্রমহিলাকে আপনি স্ত্রী

হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি আছেন?' রচেস্টার জবাব দেয়ার আগেই কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এ বিয়ে হবে না।'

ধর্মযাজক চমকে তাকালেন বক্তার দিকে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সামান্য নড়ল রচেস্টার। যেন তার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠেছে। তারপর পেছনে না তাকিয়েই বলল, 'আপনি চালিয়ে যান।'

কারও মুখে কথা নেই। আমার হাতটা তুলে নিল রচেস্টার। পেছনের লোকটা এগিয়ে এল সামনে।

'এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'মিস্টার রচেস্টারের স্ত্রী বেঁচে আছেন।'

আমার হাত পা অবশ হয়ে এল। মনে হল মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। রচেস্টারের দিকে চাইলাম আমি। মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে ওর। তবে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। একহাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল সে। তারপর আগন্তুকের দিকে ফিরে বলল, 'কে আপনি?'

'আমার নাম ব্রিগস। ওকালতি করি। লণ্ডনে।'

'আপনি বলতে চান আমি বিবাহিত? তবে আমার স্ত্রীর নাম বলুন। বলুন সে কোথায় থাকে।'

'বলছি,' পকেট থেকে ধীরে ধীরে একটা কাগজ বার করলেন ব্রিগস।

'পনেরো বছর আগে বিয়ে করেছেন আপনি,' বলে চললেন তিনি। 'জ্যামাইকার বার্থা অ্যান্টোইনেট ম্যাসনকে। বিয়ের দলিলের একটা কপিও রয়েছে আমার কাছে।'

'এতে প্রমাণিত হয় না যে আমার স্ত্রী বেঁচে রয়েছে।'

'তিন মাস আগেও বেঁচে ছিলেন তিনি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ব্রিগস।

'কে বলল?'

'সাক্ষী আছে।'

'আনুন তাকে।'

'তিনি এখানেই রয়েছেন। মিস্টার ম্যাসন, প্লীজ, সামনে আসুন।'

নামটা শোনামাত্রই রচেস্টারের চোয়াল শক্ত হল। দ্বিতীয় আগন্তুক এবার এগিয়ে এলেন সামনে। মিস্টার ম্যাসন। রচেস্টার তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইল। তারপর শক্তিশালী একটা হাত বাড়িয়ে দিল তাঁকে বাগে পাওয়ার জন্যে। ভয়ে পিছিয়ে গেলেন মিস্টার ম্যাসন।

'আপনার কি বক্তব্য?' জিজ্ঞেস করল রচেস্টার।

'থর্নফিল্ড হলে থাকে তোমার স্ত্রী,' বললেন ম্যাসন। 'গত এপ্রিলেও

দেখেছি তাকে।' তারপর ধর্মযাজকের দিকে ফিরে বললেন, 'মিস্টার রচেস্টার আমার বোনের স্বামী।'

'অসম্ভব!' ধর্মযাজকের কণ্ঠে বিস্ময়। 'এ হতেই পারে না! মিস্টার রচেস্টারের স্ত্রী থর্নফিল্ড হলে থাকলে আমি জানতামই।'

বাঁকা হাসি ফুটতে দেখলাম রচেস্টারের ঠোঁটে।

'কেউ যাতে জানতে না পারে তেমন ব্যবস্থাই করেছি আমি,' বলল রচেস্টার।

'উড, আজ আর বিয়ে হবে না,' ধর্মযাজককে বলল সে।

তার কথায় সায় জানালেন ধর্মযাজক। রচেস্টার বলে চলল, 'এই দুই ভদ্রলোক যা বলেছেন সবই সত্যি। আমার স্ত্রী বেঁচে আছে। মিসেস রচেস্টারের কথা কেউ কখনও শোনেনি। তবে আমার বাড়ির উন্মাদ মহিলার কথা বোধহয় সবাই জানে; যাকে তালা মেরে ঘরে আটকে রাখতে হয়। হ্যাঁ, সেই মহিলাই আমার স্ত্রী। বার্থা ম্যাসন পাগল। বিয়ের পর জানতে পারি আমি। ব্রিগস, উড, ম্যাসন–আমার বাড়িতে চলুন। মিসেস গ্রেস পুলের রোগীকে সেখানেই দেখবেন আপনারা।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'এই মেয়েটি এসবের কিছুই জানে না, চলুন আপনারা।'

আমার হাত চেপে ধরে গির্জা থেকে বেরিয়ে এল সে। আমাদের পেছনে এলেন ওঁরা তিনজন।

বেরিয়েই দেখলাম ক্যারিজ তৈরি রাখা হয়েছে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা।

'জন, ওটা আজ আর লাগছে না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রচেস্টার। আমাদের বরণ করে নেয়ার জন্যে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স, এডেল, সোফি আর লিয়া এগিয়ে এল।

'সামনে থেকে ভাগ তোমরা,' ওদের উদ্দেশ্যে কর্কশ ভাবে চেঁচাল রচেস্টার।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল সে। আমার হাত ছাড়েনি তখনও। পেছন পেছন এলেন ওঁরা। তিন তলায় উঠে এলাম আমরা। কালো একটা দরজা খুলল রচেস্টার। তালা লাগানো ছিল বাইরে থেকে। পর্দা টাঙানো সেই ঘরটায় গেলাম আমরা।

'তুমি তো চেনই এ ঘরটা,' রচেস্টার বলল। 'এ ঘরেই তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল ও।' ম্যাসনকে বলল সে।

ও পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খুলল রচেস্টার। ঘরটায় জানালা নেই। চুলোয় আগুন জ্বলছে।

আগুনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে গ্রেস পুল। সসপ্যানে কি যেন রাঁধছে। ঘরের দূর কোণে ঘন অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে একটা ছায়ামূর্তি। মাঝেমাঝে হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করছে। ছায়ামূর্তির মুখ ঢেকে আছে লম্বা চুলে।

আচমকা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল সে। 'স্যার, আপনাকে দেখে ফেলেছে,' বলল গ্রেস পুল। 'আপনি শিগ্গির চলে যান।'

ম্যাসন, উড আর ব্রিগস পিছিয়ে গেলেন ভয়ে। আমাকে নিজের পেছনে আড়াল দিল রচেস্টার। লাফিয়ে সামনে এসে পড়ল পাগলীটা।

বেশ লম্বা চওড়া, শক্তিশালী মহিলা। এক ঘুসিতেই ওকে শুইয়ে দিতে পারত রচেস্টার। কিন্তু তা না করে সে চেপে ধরল মহিলার দুহাত। তারপর গ্রেস পুলের কাছ থেকে দড়ি নিয়ে কষে বাঁধল হাত দুটো। পেছন দিক করে। তারপর আরও দড়ি নিয়ে চেয়ারে বেঁধে রাখল তাকে। চিৎকার করে সর্বক্ষণই নিজেকে ছাড়ানর ব্যর্থ চেষ্টা করল মহিলা। এবার আতঙ্কিত দর্শকদের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল রচেস্টার।

'এই হচ্ছে আমার স্ত্রী!' বলল সে। তারপর যোগ করল, 'বলুন আপনারা, এর সাথে কি সংসার করা সম্ভব?'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু আইন আইনই। স্ত্রী জীবিত থাকতে আরেক বিয়ে করতে পারেন না আপনি,' বললেন মিস্টার ব্রিগস।

পনেরো

সেদিন বিকেলে বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখি ঘরের দেয়ালে রোদ এসে পড়েছে। সকাল থেকে শুয়ে রয়েছি আমি। তিন তলার ও ঘর থেকে ফিরে এসে সেই যে ঢুকেছি আর বেরোইনি। মাথায় কেবল একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। 'আমি এখন কি করব?'

শেষ পর্যন্ত মনটাকে শক্ত করলাম। থর্নফিল্ড ছাড়ব। এই মুহূর্তে। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মাথাটা কেমন যেন করছে। দৃষ্টি ঝাপসা। সারা শরীর অসাড়। মাথা ঘুরে উঠল আমার। তবে পড়ে যাওয়ার আগেই শক্ত একটা হাত ধরে ফেলল আমাকে। রচেস্টার। আমার দরজার বাইরে চেয়ার পেতে বসে রয়েছে।

'তোমার জন্যেই বসে আছি,' বলল সে। 'জেন, আমাকে ক্ষমা করবে

না? আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।'

মন থেকে তক্ষুণি ক্ষমা করে দিলাম ওকে, কিন্তু মুখে স্বীকার করলাম না।

'আমি কখনই পারব না। আমি এখান থেকে চলে যাব,' বললাম আমি। 'খুব কষ্ট হচ্ছে। পানি খাব।'

পাঁজাকোলা করে আমাকে তুলে নিল রচেস্টার। নেমে এল নিচতলায়। খানিকটা ওয়াইন ঢেলে দিল আমার গলায়। অনেকখানি সুস্থ বোধ করলাম আমি। লাইব্রেরিতে রয়েছি এখন আমরা। আমাকে ও বসিয়েছে নিজের চেয়ারটাতে।

'জেন,' ও বলল। 'তোমাকে সব কথা খুলে বলা দরকার।' তারপর বলতে শুরু করল, 'আমার বাবা খুব লোভী মানুষ ছিলেন। তিনি চাইতেন আমি কোন বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করি। সে উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তাঁর এক পুরানো বন্ধুর কাছে পাঠান। তাঁর নাম মিস্টার ম্যাসন। প্ল্যান্টার। প্রচুর টাকার মালিক। বাবা জানতেন বিয়ের সময় মিস্টার ম্যাসনের মেয়েটি ত্রিশ হাজার পাউণ্ড পাবে। সুতরাং জ্যামাইকায় গেলাম আমি। মিস ম্যাসনের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখাও হল। তবে কথা হল না তেমন একটা। মেয়েটি সুন্দরী। তার ওপর তার পরিবার চায় আমার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিতে, ফলে গাধার মত রাজি হয়ে গেলাম আমি।

'বিয়ের পর বুঝতে পারলাম আমার স্ত্রী ভীষণ ঝগড়াটে আর নিষ্ঠুর। বছর চারেক পরে আমার বাবা আমাকে বড়লোক বানিয়ে রেখে মারা গেলেন। আর একই সময়ে ডাক্তার জানালেন আমার স্ত্রী পাগল। তাকে বন্দী করে রাখতে হবে। বুঝতেই পারছ আমার মনের অবস্থা। থর্নফিল্ডে নিয়ে এলাম তাকে। কেবল গ্রেস পুল আর ডাক্তার কার্টারকে জানালাম সব কথা। তবে আমার ধারণা মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সও আঁচ করতে পেরেছেন কিছু।

'গত দশ বছর যাযাবরের মত সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। এখানে এসেছি কেবল স্ত্রীকে দেখার জন্যে। তারপর দেখা হল তোমার সঙ্গে। ভাবলাম তোমাকে পেয়ে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাব। কিন্তু সুখ বোধহয় লেখা নেই আমার কপালে। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, জেন। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

মনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলাম আমি। ও আমাকে যেভাবে ভালবাসে সেভাবে আর কেউ কাউকে ভাল-বাসতে পারে না। আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। কিন্তু কিছু করার নেই আমার। যেতে আমাকে হবেই। আমি

দরজার দিকে হাঁটা দিতেই চেঁচিয়ে উঠল রচেস্টার, 'চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'যেয়ো না, জেন,' আকুল হয়ে বলল সে।

ফুঁপিয়ে উঠল রচেস্টার, দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম আমি। নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম।

সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। কপাল ভাল, জুলাই মাসের রাতগুলো ছোট হয়। ভোর হতেই উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। কাপড় পরে নিলাম। আমার জিনিসপত্র খুব সামান্য। সেগুলো একটা পুঁটলিতে বেঁধে নিলাম। পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম পার্সটা, মাত্র বিশ শিলিং রয়েছে ওতে। তারপর শালটা জড়িয়ে, জিনিসপত্র নিয়ে ঘর ছেড়ে চুপিসারে বেরিয়ে পড়লাম।

রচেস্টারের ঘরের সামনে আসতেই হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে এল আমার। দাঁড়াতে বাধ্য হলাম আমি। ঘরের ভেতর উদভ্রান্তের মত পায়চারি করছে রচেস্টার। খুব সম্ভব সকালের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার সঙ্গে কথা বলবে সে। আমাকে ফেরাতে চেষ্টা করবে। তবে সে সুযোগ আর পাবে না ও। আমি চলে যাচ্ছি এখনই।

পা টিপে টিপে নেমে এলাম নিচে। মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ফিসফিস করে বললাম, 'চলি, মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স,' নার্সারির দিকে চেয়ে এডেলের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আসি, প্রিয় এডেল।'

বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। উঠনে ভোরের আবছায়া। গেট বন্ধ। তালা দেয়া। তবে ছোট গেটটায় ছিটকিনি লাগানো। ওটা খুলে চলে এলাম রাস্তায়।

কতক্ষণ হেঁটেছি জানি না। অপরিচিত এক রাস্তা ধরে হেঁটেছি এতক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে বসে পড়লাম। ঘন ঝোপের সারি রয়েছে এখানে।

খানিকবাদে চাকার আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি একটা কোচ এদিকেই আসছে। হাত তুলে ওটাকে থামালাম আমি। কোচোয়ানের কাছ থেকে জানলাম বহু দূরের পথে যাচ্ছে সে। জিজ্ঞেস করলাম কত পেলে কোচে তুলে নেবে আমাকে। ত্রিশ শিলিং চাইল সে। বললাম আমার কাছে আছে মাত্র বিশ শিলিং। কি আর করা। অগত্যা রাজি হল সে। উঠে পড়লাম আমি। গড়িয়ে চলল কোচ। তার গন্তব্যে।

আমার দু চোখে কান্নার বান ডাকল।

ষোলো

দুদিন পর। সন্ধেবেলা। উইটক্রস নামে একটা জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে কোচোয়ান। চার রাস্তার মোড় ওটা। পয়সার অভাবে আর বেশিদূর যাওয়া সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।

আমার পেছনে আর দুপাশে বিরাট সব ময়দান। পাহাড়ও রয়েছে অনেকগুলো। 'কি করব এখন?' 'কোথায় যাব?' এমনি সব চিন্তা মাথায় আসছে। এসব প্রশ্নের কোন জবাব জানা নেই আমার।

রাতে বেরি খেয়ে পেট ভরালাম আমি। গায়ে ভাল করে শাল জড়িয়ে ঘুমালাম ঝোপের আড়ালে।

পরদিন সকালে উঠে আবার হাঁটা ধরলাম। যে রাস্তা ধরে হাঁটছি সেটা গিয়ে মিশেছে এক গ্রামে। হাঁটতে হাঁটতে ছোট একটা দোকান চোখে পড়ল। রুটির দোকান।

দোকানটায় ঢুকলাম গিয়ে। এক মহিলা দোকান চালাচ্ছে।

'প্লীজ,' অনুনয় করে বললাম। 'আমার রুমালটার বদলে একটা রোল দিন না।'

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চাইল মহিলা। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ওভাবে ব্যবসা করি না।'

'আমার দস্তানা জোড়া নেবেন?'

'না, ও দিয়ে করব কি আমি?'

দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সেই রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম আবার। রাত কাটালাম বনে। সকালের দিকে বৃষ্টি হল। ফলে সারাটা দিন রাস্তা ভেজা রইল।

সন্ধে হতে দেখি মাঠের ওপর দিয়ে সাদা একটা পথ চলে গেছে। পথটা পৌঁচেছে বিশাল একটা বাড়ির কাছে। পাথরের তৈরি নিচু দেয়াল দেখতে পেলাম বাড়ির সামনে। বাড়িটার একটা জানালায় আলো জ্বলছে। কোনমতে পৌঁছলাম বাড়িটার কাছে। তারপর হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে নিয়ে পেছন দরজার কাছে চলে এলাম। দরজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এল এক মহিলা।

'কি চাই?' জিজ্ঞেস করল সে।

'রাতটার জন্যে আশ্রয় আর এক টুকরো রুটি দেবেন? বড্ড খিদে পেয়েছে।'

আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না মহিলা। তার চোখ-মুখ দেখে বুঝলাম আমি।

'চোরদের গুপ্তচর নাকি তুমি?' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। 'ওসবে কাজ হবে না বুঝেছ? তোমার বন্ধুদের জানিয়ে দিয়ো আমাদের বাসায় কুকুর আছে। বন্দুকও।'

দড়াম করে মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

আর এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই আমার। খিদেয় জ্ঞান বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। সেখানেই বসে পড়লাম আমি। কাঁদতে লাগলাম হাপুস নয়নে। মিনিটখানেক পরে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক লোক।

'একি! এ আবার কে?' বলে উঠল লোকটি। তারপর জোরে জোরে নক করতে লাগল দরজায়। না থেমে।

'মিস্টার সেন্ট জন নাকি?' ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন।

'হ্যাঁ, জলদি খোল।'

খুলে গেল দরজা। খানিক বাদে দেখলাম পরিচ্ছন্ন একটা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। কাঁপছি। দুজন তরুণী, তাদের ভাই মিস্টার সেন্ট জন আর সেই মহিলা অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমার মাথা ঘুরছে তখনও। বুঝলাম পড়ে যাচ্ছি। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরে জানলাম তিন দিন তিন রাত অচেতন ছিলাম আমি। সেই দুই তরুণী আমাকে সেবা শুশ্রূষা করেছে সে সময়। জ্ঞান ফিরতে দেখি ছোট একটা ঘরে শুয়ে রয়েছি। চেয়ে দেখি পাশে একটা চেয়ারে আমার সব জিনিসপত্র রাখা রয়েছে।

এ ঘটনার দু'দিন পর ওঠার শক্তি পেলাম আমি। মিস্টার সেন্ট জন রিভার্স অর্থাৎ বাড়ির মালিক দেখতে এলেন আমাকে। তাঁকে আমার প্রায় সব কথাই বললাম। জানালাম লোউডে থাকতাম আগে। পরে গভর্নেস হিসেবে এক জায়গায় কাজ করেছি কিছুদিন। কিন্তু আমার আসল নামটা গোপন করে গেলাম। নিজেকে জেন ইলিয়ট বলে পরিচয় দিলাম।

পরের ক'দিনে স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি হল। হাঁটা চলা শুরু করলাম অল্প স্বল্প। দিন কেটে যেতে লাগল। মিস্টার জন বা তাঁর বোনেরা চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে কিছুই বললেন না। তারপর এক সকালে সেন্ট জন তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালেন আমাকে।

'মিস ইলিয়ট,' বললেন তিনি। 'আপনাকে সাধ্যমত সাহায্য করতে চাই আমি। মরটনে মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল করতে চলেছি আমরা। আপনাকে ওটার দায়িত্ব দিতে চাই। দু'কামরার একটা কটেজ দেয়া হবে আপনাকে। কটেজটা স্কুল সংলগ্ন। বেতন বছরে ত্রিশ পাউণ্ড। চাইলে দায়িত্বটা নিতে পারেন আপনি।'

'ধন্যবাদ,' বললাম তাঁকে। 'খুশি মনে দায়িত্ব গ্রহণ করছি আমি।'

এক সপ্তাহ পর নতুন বাড়িতে চলে গেলাম। বিশ জন ছাত্রী আমার। সেখানেই দিন কাটাতে লাগলাম।

পেরিয়ে গেল কয়েক মাস। প্রথম প্রথম কষ্টই হল বেশ, কিন্তু মানিয়ে নিলাম ধীরে ধীরে। এ-ও বুঝতে পারলাম প্রতিবেশীরা পছন্দ করতে শুরু করেছে আমাকে। আমাকে দেখলেই হেসে কুশল জিজ্ঞেস করে সকলে। মিস্টার সেন্ট জন রিভার্স আর তাঁর বোনদের সঙ্গে এর মাঝে অন্তরঙ্গতা অনেক বেড়ে গেছে আমার।

শীত এল। সঙ্গে নিয়ে এল তুষার আর ঠাণ্ডা বাতাস। এমনি এক শীতের বিকেলে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে বই পড়ছি আমি। বাইরে তুষার পড়ছে। এ সময় হুড়কো খোলার শব্দে চেয়ে দেখি সেন্ট জন। ঝড়ো বাতাসে উষ্কখুষ্ক দেখাচ্ছে তাঁকে। তাঁর কোটটা সাদা হয়ে গেছে, তুষার পড়ে। এমন দিনে তাঁকে ঐখানে দেখব কল্পনাও করিনি।

'আপনি এ সময়ে?' প্রশ্ন করলাম, 'কিছু হয়েছে নাকি?'

পা ঠুকে বুট থেকে তুষার ঝরালেন তিনি। গা থেকে কোটটা খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখলেন। বসে পড়ে ছোট একটা পকেট বই বার করলেন। তার ভেতর একটা চিঠি রয়েছে দেখতে পেলাম।

'কিছু কথা বলতে চাই আপনাকে,' বললেন তিনি। 'কিছুটা আপনার আগেই জানা রয়েছে। বাকিটা জানা থাকলে সাহায্য করবেন আমাকে। বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার। শুনুন তবে–'

পড়তে শুরু করলেন তিনি।

'বিশ বছর আগে এক গরীব ধর্মযাজক এক বড় লোকের মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটিও গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে তাকে। এবং পরিবারের সবার অসম্মতি সত্ত্বেও বিয়ে করে সেই ধর্মযাজককে। ফলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে। দু'বছর পেরোতে না পেরোতেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মারা যায়। তাদের কবর দেয়া হয় পাশাপাশি। তাদের একমাত্র মেয়ে তার মামী অর্থাৎ মিসেস রীড নামে এক মহিলার কাছে মানুষ হতে থাকে। গেটশেডে। মিসেস রীড বছর দশেক নিজের কাছে রাখেন মেয়েটিকে।

তারপর পাঠিয়ে দেন লোউড স্কুলে। যেখানে আপনিও পড়তেন, জেন। ছাত্রী থেকে মেয়েটি পরে সেখানকার শিক্ষিকা হয়। তারপর সেও আপনার মতই লোউড ছেড়ে অন্যখানে চলে যায়। গভর্নেসের চাকরি নিয়ে। মিস্টার রচেস্টার নামে জনৈক ভদ্রলোকের বাড়িতে।'

'মিস্টার রিভার্স!' তাঁকে থামিয়ে দিলাম আমি।

'আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা,' নরম গলায় বললেন তিনি। 'প্লীজ, পুরোটা শুনুন। মিস্টার রচেস্টার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না আমি। কেবল জানি সে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেয়েটিকে। বিয়ে পড়ানর সময় জানা যায় লোকটির আগের স্ত্রী বর্তমান। যদিও সে মহিলা পাগল। সে রাতে মনের দুঃখে মেয়েটি থর্নফিল্ড হল ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তারপর আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন তাকে খুঁজে বার করা খুবই জরুরি। মিস্টার ব্রিগস নামে এক উকিল চিঠিতে এসব জানিয়েছেন আমাকে। আপনার জীবনের সঙ্গে অদ্ভুত মিল, তাই না?'

'আমি কেবল জানতে চাই,' চাপা গলায় বললাম আমি। 'রচেস্টার কোথায় আছে, কেমন আছে, কি করছে?'

'জানি না। বাজে লোকের খবর রাখি না আমি,' মিস্টার জন বললেন।

'ও মোটেও বাজে লোক নয়। আপনি ওকে চেনেন না বলেই ওকথা বলতে পারলেন,' চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালাম আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ব্রিগস আমাকে জেন আয়ার নামে এক মহিলার কথা লিখেছেন,' বললেন তিনি। 'আমি তখনই বুঝেছিলাম যে সে আপনি ছাড়া আর কেউ নন। জেন আয়ার আপনার নাম, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'কিন্তু মিস্টার ব্রিগস আমার ব্যাপারে এত উৎসাহী কেন সেটা বলুন।'

'তিনি জানাচ্ছেন আপনার চাচা যিনি ম্যাডেরিয়ায় থাকতেন তিনি মারা গেছেন। তাঁর সব সম্পত্তি তিনি আপনাকে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আপনি এখন রীতিমত বড়লোক।'

'আমি! বড়লোক?'

'হ্যাঁ, তিনি আপনার জন্যে প্রায় বিশ হাজার পাউণ্ড রেখে গেছেন।'

আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। আমার অবস্থা দেখে সেন্ট জন রিভার্স মৃদু হেসে উঠে পড়লেন।

'একটু দাঁড়ান,' তাঁকে থামালাম আমি। 'মিস্টার ব্রিগস আমার কথা আপনাকে জানালেন কেন বুঝতে পারছি না।'

মুহূর্তখানেক স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন সেন্ট রিভার্স। মৃদু হাসলেন আবার।

'আমার মা'র নামও,' বলতে শুরু করলেন তিনি। 'আয়ার। তাঁর দু'ভাই ছিল। এক ভাই গেটশেডের মিস রীডকে বিয়ে করেছিল। অন্যজনের নাম জন আয়ার। ম্যাডেরিয়ার সওদাগর। মিস্টার ব্রিগস হচ্ছেন জন আয়ারের উকিল। গত আগস্টে তিনি আমাদের কাছে চিঠি লিখে আপনার চাচার মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছেন। আরও লিখেছেন তাঁর মক্কেল সমস্ত সম্পত্তি রেখে গেছেন ভাতিজির জন্যে। ক'দিন আগে আবার চিঠি লিখেছেন তিনি। বলেছেন মেয়েটির কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এব্যাপারে আমরা কিছু জানি কিনা জানতে চেয়েছেন। বাকিটা তো জানেনই আপনি।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'আপনার মা আমার ফুফু?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে তুমি আর তোমার বোনেরা আমার ফুফাতো ভাই-বোন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে। খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলাম। 'উফ্! দারুণ!' চিৎকার করে বললাম আমি। 'তোমার বোনদের বলবে সমস্ত সম্পত্তি আমরা সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নেব। তোমাদের বাড়িতে তোমাদের সঙ্গে থাকব আমি। কোন আপত্তি নেই তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তোমার স্কুল?'

'নতুন কাউকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব। তবে তার আগ পর্যন্ত আমি তো থাকবই।'

আবার হাসল সেন্ট রিভার্স। হাত মেলালাম আমরা। ও বেরিয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরে ফুফাতো ভাই-বোনদের বাড়িতে চলে গেলাম। ওখানেই থাকব। ওদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার পাউণ্ড করে দিয়ে দিয়েছি আমি।

সতেরো

ইতিমধ্যে মে মাস এল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে সুখেই কেটে যেতে লাগল আমার দিন। কিন্তু থর্নফিল্ড ছাড়ার পর এক মুহূর্তের জন্যেও রচেস্টারকে ভুলতে পারিনি আমি। আমার অস্তিত্বের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে ও।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। রচেস্টারের খোঁজ জানার জন্যে। কিন্তু দুসপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোন উত্তর এল না।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এভাবে কেটে গেল কয়েক মাস। চিঠি এলই না। রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেই সঙ্গে উদ্বিগ্ন।

আবার চিঠি লিখলাম। কিন্তু ছ মাস কেটে যাওয়ার পরও জবাব পেলাম না দেখে হাল ছেড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটা হারিয়ে ফেলেছি।

মে মাসের এক রাতে সবাই ঘুমোতে যাব আমরা। তার আগে মিস্টার সেন্ট জনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর তার দু বোন। বোনদের গুডনাইট বলে চুমু খেল সেন্ট জন। কিন্তু আমার দিকে বাড়িয়ে দিল হাত। ছোট বোন ডায়না চেঁচিয়ে উঠল।

'সেন্ট জন, তুমি তো বল জেন তোমার তিন নাম্বার বোন। তবে ওকে চুমু খাও না কেন?'

আমাকে সেন্ট জনের দিকে ঠেলে দিল ডায়না। তারপর দু বোন ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আমার দিকে গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে।

'শোন, জেন,' শান্ত স্বরে বলল সেন্ট জন। 'আমি মাস দেড়েকের মধ্যে ভারতে চলে যাচ্ছি। মিশনারী হিসেবে। তোমাকে বিয়ে করে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই। তুমি রাজি আছ?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তার বলা কথাগুলো ভাবলাম। মোমবাতিটার আলো নিভু নিভু। ঘরে এখন চাঁদের আলোর খেলা। আমার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হল। হাপরের বাড়ি পড়ছে যেন বুকে। হঠাৎ শুনতে পেলাম দূর থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকছে আমাকে। পরিচিত লাগল গলাটা। অতি পরিচিত।

'জেন! জেন! জেন!'

'আমি আসছি!' ছুটে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম আমি। কই, কেউ তো নেই। দৌড়ে বাগানে চলে গেলাম। শূন্য বাগান।

'কোথায় তুমি?' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

ফার বনে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। নিস্তব্ধতা ঘিরে রেখেছে পুরো পরিবেশটাকে।

সেন্ট জন আমাকে ধরে রেখেছিল। আমার পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছিল সে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে ফিরে গেলাম। দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলাম বিছানায়। কি করতে হবে বুঝে ফেলেছি আমি। ভোরের আলো ফোটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পরদিন উঠে পড়লাম খুব ভোরে। নাস্তার টেবিলে ডায়না আর মেরীকে

বললাম দিন চারেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি আমি। কাজ আছে।

সেদিন বিকেলে উইটক্রসের সাইন পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম কোচের জন্যে। থর্নফিল্ডে যাব।

ছত্রিশ ঘণ্টা একটানা চলল কোচ। তারপর ঘোড়াদের পানি খাওয়ানর জন্যে রাস্তার পাশের এক সরাইখানার কাছে থামল। ওটার সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'দ্য রচেস্টার আর্মস'। ধ্বক ধক করতে লাগল বুকের ভেতরটা। রচেস্টারের এলাকায় এসে পড়েছি। ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। ট্রাঙ্কটা সরাইখানার অশ্বরক্ষকের জিম্মায় রেখে হাঁটা ধরলাম। কি জোরেই না হাঁটছি। মাঝে মধ্যে দৌড়াচ্ছি। কখন যে বাড়িটা চোখে পড়বে। উদগ্রীব হয়ে রইলাম সারাক্ষণ।

ফল বাগানের লাগোয়া দেয়াল ঘেঁষে হাঁটলাম আমি। ওখানে একটা গেট ছিল। দুটো পাথরের পিলারের মাঝখানে। একটা পিলারের পাশ দিয়ে বাড়িটার দিকে চাইলাম। ধ্বংসস্তূপের মত মনে হল দালানটাকে। অবাক লাগল আমার।

লনটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির সামনের দিকটা যেন ভাঙা দেয়াল। জানালাগুলোয় কাঁচ নেই। ধসে পড়েছে ছাদ। সব বিধ্বস্ত।

চারদিকে যেন মৃত্যুর নীরবতা। পোড়া পাথরগুলো দেখে বোঝা যায় এ অবস্থার জন্যে দায়ী–আগুন। কিন্তু আগুন ধরল কিভাবে? রচেস্টারের কিছু হয়নি তো? সে বেঁচে আছে তো?

উত্তরগুলো জানতেই হবে আমাকে। যে করে হোক। ছুটে ফিরে এলাম সরাইখানায়। মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, 'থর্নফিল্ড হলের এ অবস্থা হল কিভাবে? জানেন কিছু?'

'জানি, ম্যাম। ফসল কাটার মৌসুমে পুড়ে গিয়েছিল ওটা। গত বছর। গভীর রাতে আগুন ধরে গিয়েছিল। দেখেছি আমি। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।'

'আগুন ধরল কিভাবে?'

'এক পাগলী থাকত বাড়িটায়। তারই কাজ। প্রথমে পাশের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। তারপর একে একে প্রত্যেকটা ঘরে। মিস্টার রচেস্টার সবার আগে বুঝতে পারেন যে আগুন লেগেছে। কাজের লোকদের প্রত্যেককে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন তিনি। তারপর তাঁর পাগল স্ত্রীকে বাঁচানর জন্যে গিয়ে দেখেন সে ছাদে চলে গেছে। হাত নাড়ছে। চিৎকার করছে। ছাদে গেলেন মিস্টার রচেস্টার। স্ত্রীর দিকে এগোতেই সে লাফিয়ে পড়ল নিচে। থেঁতলে গেল তার শরীর। সব আমার নিজের চোখে দেখা, ম্যাম।'

'মহিলা মারা গেছে?'

'হ্যাঁ,' হঠাৎ কেঁপে উঠল সে। 'উহ্! চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য!'

'আর কেউ মারা গেছে?'

'না–কেবল মিস্টার রচেস্টার–' আমার সারা শরীর হিম হয়ে এল। হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন।

'সে কি–সে কি মারা গেছে?' ফ্যাকাসে মুখে জানতে চাইলাম আমি। নিঃশ্বাস আটকে আসছে আমার।

'না, মরেননি। তবে মারা গেলেই বোধহয় ভাল হত।'

'কেন? একথা বলছেন কেন? সে কোথায়? ইংল্যাণ্ডে আছে তো?'

'আছেন, ইংল্যাণ্ডের বাইরে কোথাও যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার সময় পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে জঞ্জালের ভেতর থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কিন্তু বীম পড়ে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অন্যটি ফুলে গেছে। ওটা দিয়ে আর দেখতে পাবেন না তিনি। একটা হাত ভেঙে গিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। মিস্টার কার্টার কেটে বাদ দিয়েছেন হাতটা। তিনি এখন অন্ধ এবং পঙ্গু।'

'এখন কোথায় আছে সে?' আকুল হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'ফ্রেনডিলে। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে।'

'একাই?'

'না, জন আর তার স্ত্রী রয়েছে তাঁর সঙ্গে। ওরা বলে, মিস্টার রচেস্টার খুব অভাবে রয়েছেন।'

'একটা ক্যারিজ হবে?' দ্রুত প্রশ্ন করলাম। 'সন্ধের আগে আপনার পোস্ট বয় আমাকে ফ্রেনডিলে পৌঁছে দিতে পারলে আপনাদের দুজনকেই ডাবল পয়সা দেব।'

সন্ধের আগেই ওরা পৌঁছে দিল আমাকে। তখন বৃষ্টি পড়ছে। লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাড়িটা দেখতে পেলাম শান্ত। নীরব। ঠিক গির্জার মত। এগোলাম আমি।

'কেউ নেই নাকি?' নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম।

জবাবও পেয়ে গেলাম খানিক বাদেই। সদর দরজা খুলে গেল। এক লোক বেরিয়ে এল বাইরে। ম্লান আলোতেও চিনতে পারলাম তাকে। আমার মনের মানুষ। রচেস্টার।

ধীরে ধীরে সামনে এগোল সে। দু হাত তার সামনে বাড়ানো। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। যেন বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে যাবে। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল সে। এ সময় বাড়ির আশপাশ থেকে বুড়ো

কোচোয়ান জন বেরিয়ে এল।

'স্যার, আমার হাতটা ধরুন,' বলল সে। 'চলুন, ভেতরে যাই।'

'আমি একাই পারব,' জবাব এল।

সরে গেল জন। আমাকে দেখতে পায়নি। সেখানে খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রচেস্টার। তারপর আবার হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে নিল। বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এবার এগিয়ে গেলাম আমি। দরজায় নক করলাম। জনের স্ত্রী খুলল। আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে।

'আপনি, মিস?' তার হাত চলে গেল বুকে।

হাত ধরে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল সে। রান্নাঘরে বসে আগুন পোহাচ্ছে জন। সেখানেই গেলাম আমরা। আমাকে দেখে অবাক হল সে-ও। ওদের দুজনকে জানালাম, থর্নফিল্ডের সব ঘটনাই শুনেছি আমি। জনকে বললাম সরাইখানা থেকে আমার ট্রাঙ্কটা নিয়ে আসার জন্যে। মিনিটখানেক পরে বৈঠকখানার বেল বেজে উঠল। জনের স্ত্রী মেরী চায়ের ট্রে তুলে নিল।

'এটার জন্যে বেল বাজিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। তাছাড়া মোমবাতির জন্যেও।'

'ট্রে-টা আমাকে দাও।'

ওর হাত থেকে ট্রে নিলাম আমি। আমাকে বৈঠকখানার দরজাটা দেখিয়ে দিল ও। এগোতে গিয়ে দেখি হাত কাঁপছে। পাঁজরে সজোরে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। দরজাটা খুলে দিল মেরী।

ঘরে ঢুকলাম আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে রচেস্টার। এক পাশে শুয়ে রয়েছে তার প্রিয় কুকুর পাইলট। আমাকে দেখে কান খাড়া হয়ে উঠল ওর। তারপর হঠাৎই লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এল আমার কাছে। ওর ধাক্কা খেয়ে ট্রে-টা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল হাত থেকে। কোনমতে সামলে নিয়ে ওটা রাখলাম টেবিলে। পাইলটের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, 'শুয়ে থাক্।'

এবার রচেস্টারের দিকে এগোলাম আমি। আমার পিছু পিছু লেজ নাড়তে নাড়তে এল পাইলট মৃদু গরগর করছে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল রচেস্টারের।

'কি হয়েছে, পাইলট?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পাইলট, তুই শুয়ে থাক্,' আবার বললাম আমি।

রচেস্টারকে কেঁপে উঠতে দেখলাম। 'মেরী নাকি?' জানতে চাইল সে।

‘মেরী রান্নাঘরে,’ বললাম আমি। হাতটা বাড়িয়ে দিল রচেস্টার। খুঁজছে কাউকে। ধরলাম ওটা। চেপে ধরলাম দুহাতে।

‘সেই আঙুল!’ উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সে। ‘জেন! তুমি?’

‘হ্যাঁ, আমি। আজ বিকেলে এসেছি।’ আমাকে কাছে টেনে নিল সে। জড়িয়ে ধরল একহাতে। শক্ত করে।

‘আমি তোমাকে খুঁজে বার করেছি, রচেস্টার। আবার তোমার কাছেই ফিরে এসেছি।’

‘সত্যি বলছ? আমার কাছে ফিরে এসেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘জেন, আমি অন্ধ। পঙ্গু–’

ওর ঠোঁটে হাত চেপে ধরলাম। ‘তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমাকে ভালবাসি,’ বললাম আমি।

‘জেন,’ মৃদু গলায় বলল সে। ‘একজন গরীব অন্ধ তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি রাজি হবে?’

‘একশবার হব।’

‘গত সোমবার রাতে,’ বলল ও। ‘রাত এগারোটা-বারোটার দিকে আমার ঘরে বসে ছিলাম। জানালার পাশে। তোমাকে ভীষণভাবে কাছে পেতে চাইছিলাম। নিজেকে আর বশে রাখতে পারলাম না। তোমার নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে উঠলামঃ ‘জেন! জেন! জেন!’ শুনতে পেলাম একটা গলা–তোমার গলা–জবাব দিলে তুমিঃ ‘আমি আসছি,’ মুহূর্ত পরে শুনতে পেলাম ফিসফিস করে বলছ, ‘তুমি কোথায়?’ আমি বিশ্বাস করতাম আমাদের আত্মার মিলন হবেই। এখন দেখছি সত্যিই আমি তোমার গলা শুনেছিলাম।’

‘হ্যাঁ,’ বললাম আমি। ‘তোমার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম আমিও। তাই তো ফিরে এসেছি চিরদিনের জন্যে। তোমার কাছে। ‘আসলে মনের টান থাকলে বোধহয় এমনই হয়।’

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,’ বলল সে। ‘অসংখ্য ধন্যবাদ।’

ওর হাতটা টেনে নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলাম আমি। হাতটা নেমে এসে স্থির হল আমার কাঁধে। আমার চেয়ে কত বেশি লম্বা ও, বলিষ্ঠ। কিন্তু আমি জানি আজ থেকে ওর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আমাকেই।

দশ বছর হল বিয়ে হয়েছে আমার। আমার চেয়ে সুখী মহিলা পৃথিবীতে আর কেউ আছে বলে মনে করি না আমি। এর মধ্যে এডেলকে দেখতে

গিয়েছিলাম। ওর স্কুলে। ওর বলে ভাল লাগে না ওখানে, ফলে নিয়ে এলাম ওকে। ভর্তি করে দিলাম অন্য একটা স্কুলে। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ফেলেছে সে। আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী এখন এডেল। যাই হোক, বিয়ের পর বছর দুয়েক অন্ধ ছিল রচেস্টার। তারপর এক সকালে ওর নির্দেশ মত চিঠি লিখছি আমি এসময় কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল সে আমার ওপর। 'জেন, তোমার গলার হারটা তো চমৎকার,' বলল সে।

অবাক হয়ে গেলাম আমি।

'তুমি কি নীল রঙের কাপড় পরে রয়েছ?' আরও অবাক হওয়ার পালা। ও আমাকে জানাল বেশ কিছুদিন থেকে ওর মনে হচ্ছে একটা চোখের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে ফিরে পাচ্ছে ও।

ওকে নিয়ে লণ্ডনে গেলাম। বিখ্যাত এক চোখের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর পরামর্শ মেনে চলল ও। ধীরে ধীরে এক চোখের দৃষ্টি ফিরে এল ওর।

ও যে এখন খুব ভাল দেখতে পায় তা নয়। লিখতে পড়তেও পারে না বড় একটা। তবে একা একা চলে ফিরে বেড়াতে পারে। কারও সাহায্যের দরকার পড়ে না।

আমাদের প্রথম সন্তান মানে ওর ছেলেকে যখন ওর কোলে তুলে দেয়া হল তখন ওর চোখে যা দেখলাম তার কোন তুলনা নেই। বাচ্চার কালো, ডাগর দু চোখে চেয়ে রইল সে। তার নিজের চোখটিতে তখন বুকের সব ভালবাসা এসে জড়ো হয়েছে। স্ত্রী-সন্তান দুজনের জন্যেই।

***

লিট্‌ল্ উইমেন

লুইযা মে অলকট

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

ক্রিসমাসের আর তিনদিন বাকি।

আমেরিকার ছোট্ট একটি শহরে বাস করে মার্চ পরিবার। গত ক'সপ্তাহ ধরে তুষার পড়ছে এ শহরে। তুষার যেন সাদা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে শহরটিকে। সারা আমেরিকা জুড়ে চলছে গৃহযুদ্ধ। পুরুষরা সব চলে গেছে যুদ্ধে। ফলে এবারের ক্রিসমাস অনেকের কাছেই আনন্দের বার্তা বয়ে আনতে পারেনি। মহিলাদের মন খারাপ, তাদের স্বামীরা কাছে নেই, রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

মার্চ পরিবারের কর্তা মিস্টার মার্চও এর ব্যতিক্রম নন। সেনাবাহিনীর যাজক হিসেবে তাঁকে যেতে হয়েছে ওয়াশিংটনে। ঘরে রেখে গিয়েছেন স্ত্রী আর চার মেয়েকে। ভদ্রলোকের স্ত্রী সমাজকর্মী। অবসর পেলেই হল, কাজে নেমে পড়েন। এ মুহূর্তে বাইরে রয়েছেন তিনি। চার বোন বসে রয়েছে মায়ের অপেক্ষায়। বিষণ্ণ।

'দূর! উপহার ছাড়া ক্রিসমাস জমে নাকি!' অসন্তোষ ভরে বলল জো। ড্রইংরুমের কার্পেটের ওপর শুয়ে রয়েছে সে। লম্বা, একহারা গড়নের মেয়ে, পনেরো বছর বয়স। ওকে দেখতে লাগে ঠিক যেন ঘোড়ার বাচ্চার মত। ল্যাগবেগে হাত-পা নিয়ে কি যে করবে অনেক সময় ভেবে পায় না। চোখা নাক তার, চোখজোড়া ধূসর তার নাকটা সবার হাসির খোরাক। তবে ওর লম্বা ঘন চুলগুলোর প্রশংসা সবাই করে।

'গরীব হওয়া বড় কষ্টের রে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেগ। চাইল নিজের পুরানো পোশাকটার দিকে চার বোনের মধ্যে সে-ই সবার বড়। ষোড়শী মেগ অপরূপা। সুন্দর মুখ, ডাগর চোখ, আর নরম, বাদামি চুলের জন্যে সে গর্বিত।

'কেউ পাবে কেউ পাবে না, এটা ভাল না,' ছোট্ট অ্যামি বলল। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য সে। তার ধারণা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে। 'অনেকেই অনেকগুলো করে উপহার পাবে। পাব না কেবল আমরা।'

'কেন, বাবা-মাকে তো পাচ্ছি,' এক কোণ থেকে বলে উঠল বেথ, এ পরিবারের তৃতীয় সন্তান। লাজুক প্রকৃতির মেয়ে সে, কম কথা বলে।

'বাবাকে পাচ্ছি কই?' বিষণ্ণ শোনাল জো-এর গলা। 'আরও বহুদিন পাব না। কবে ফিরবেন ঈশ্বরই জানেন।'

মলিন হয়ে গেল সবার মুখ, মিনিটখানেক কথা বলল না কেউ। 'এজন্যেই মা বলেছেন এ বছর উপহার কেনার দরকার নেই। খুব কঠিন সময় যাচ্ছে। সৈনিকরা জীবন দিচ্ছে দেশের জন্যে,' বলল মেগ, তারপর যোগ করল, 'আমাদের উচিত উপহার না কিনে টাকাটা দেশের কাজে লাগানো।'

'আমাদের চার ডলার দেশের কোন উপকারে আসবে না,' গলা উঁচিয়ে বলল জো। বইয়ের পোকা ও। ক্রিসমাসে একটা বই কিনবে ঠিক করে রেখেছে।

'ঠিক বলেছ, জো,' সায় দিল বেথ আর অ্যামি।

'তারচেয়ে বরং যে যার ইচ্ছেমত খরচ করব টাকাটা,' ঘোষণা করল জো। 'প্রত্যেকেই খেটে রোজগার করি, একটা দিন একটু ফুর্তি করব না?'

'হুঁ,' বলল মেগ, 'সারাদিন বাচ্চাদের পড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। আর যে বদমাশ একেকটা।'

'তোমার ডবল খাটুনি আমার,' বলল জো। 'মার্চ বুড়িকে দেখাশোনা করার চেয়ে বাচ্চাদের পড়ানো অনেক সহজ। বুড়ির মেজাজ কি! বাবারে!'

'থালা-বাসন ধোয়া আর সারা বাড়ি পরিষ্কার রাখা তারচেয়েও কঠিন,' যেন নালিশ জানাল বেথ।

'তাও তো তোমাদের স্কুলে যেতে হচ্ছে না,' বলল অ্যামি। 'গরীব বাবার মেয়ে বলে টিটকিরি শুনতে হচ্ছে না। জামা-কাপড় দেখে কেউ হাসাহাসি করছে না।'

'ইস্, বাবা যদি অতগুলো টাকা নষ্ট না করতেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মেগ। সুখের দিনগুলোর কথা মনে আছে তার। 'তখন কোন চিন্তা ছিল না, ভাবনা ছিল না। কত আনন্দে ছিলাম।'

পরিবেশ ভারি হয়ে উঠছে দেখে পকেটে দু'হাত পুরল জো। তারপর ঠোঁট গোল করে শিস দিতে শুরু করল।

'কি আরম্ভ করলি ছেলেদের মত!' চেঁচাল মেগ।

'ছেলেদের মতই তো হতে চাই,' বলল জো। 'বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারতাম যদি—বুড়িদের মত ঘরে বসে উল বোনা আমার কাজ নয়।'

নীল রঙের আর্মি মোজাটা নাড়িয়ে দেখাল সে। ওটাই বুনছে। মোজাটা নাড়তেই উলের বলটা গড়িয়ে চলে গেল বেশ খানিকদূর। পিছু ধাওয়া করল জো। ঘড়িতে ছ'টা বাজল এ সময়। তার মানে মায়ের

ফিরতে আর দেরি নেই।

উঠে পড়ল বেথ, মায়ের চটীজোড়া ফায়ারপ্লেসে সেঁকতে দিল। মেগ প্রদীপ জ্বালল। ইজি চেয়ারের গদিটা জায়গামত ঠিকঠাক করে রাখল অ্যামি। জো দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলল ঘরটা।

'মায়ের চটীজোড়া ছিঁড়ে গেছে,' বলল জো। 'আমি একজোড়া কিনে দেব, আমার ডলারটা দিয়ে।'

'তুমি না, আমি দেব,' প্রতিবাদ করল অ্যামি।

'মনে রাখিস, বাবা বাড়িতে নেই। পুরুষ মানুষ বলতে এক আমিই,' বলল জো। 'কাজেই দায়িত্বটা আমার।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' বলল বেথ, 'ক্রিসমাসে নিজেদের জন্যে কিছু না কিনে সবাই মায়ের জন্যে কিনব। কেমন হবে ব্যাপারটা?'

'দারুণ বুদ্ধি বার করেছিস তো!' উচ্ছ্বসিত হল মেগ। 'মাকে এক জোড়া গ্লাভস কিনে দেব।'

'আমি তো চটী কিনছিই,' বলল জো। 'তোরা কে কি কিনবি রে?'

'কয়েকটা রুমাল কিনব,' বলল বেথ। 'মার খুব দরকার হয়।'

'আমি দেব এক শিশি সেন্ট,' বলল অ্যামি। 'মার পছন্দও হবে, দামেও সস্তা। কিছু পয়সা হাতে থেকে যাবে, নিজের জন্যে খরচ করব।'

উঠে দাঁড়াল জো। হাতজোড়া পেছন দিকে রেখে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগল।

'মাকে চমকে দেব,' বলল সে। 'মেগ, কাল বিকেলে কেনাকাটা করতে যাব আমরা। তাছাড়া ক্রিসমাসের রাতে নাটকের আয়োজন করতে হবে না?'

'এবারই শেষ বাবা,' জবাব দিল মেগ। 'আমি আর নাটক-ফাটকে নেই। আমার বয়স শেষ।'

'কি যে বল না,' হালকা গলায় বলল জো, 'তুমিই তো আমাদের সেরা অভিনেত্রী। আজ রাত থেকেই রিহার্সাল শুরু করতে হবে। এই অ্যামি, এদিকে আয় তো। অজ্ঞান হওয়ার সিনটা একটু দেখা দেখি। তুই তো আবার পড়ে যাওয়ার সময় একেবারে কাটা কলাগাছের মত পড়িস! একটু স্বাভাবিক হতে পারিস না?'

'না, পারি না,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল অ্যামি। 'সারা গায়ে কালশিটে ফেলি আরকি! আমি ওভাবে আছাড় খেতে পারব না। বড় জোর চেয়ারের ওপর পড়ে যেতে পারি।'

'বোকা, এভাবে করবি,' বলল জো। 'টলমল পায়ে সারা ঘর ঘুরে

বেড়াবি আর ভয়ঙ্করভাবে চেঁচাবিঃ "রডরিগো, বাঁচাও, বাঁচাও"।'

অভিনয়টা সে নিজেই করে দেখাল। অন্যেরা তারিফ না করে পারল না।

'এবার চেষ্টা করল অ্যামি। কিন্তু বেচারির আসলে অভিনয় আসে না, জো'কে সন্তুষ্ট করতে পারল না সে। কিন্তু উপায় নেই। এ চরিত্র থেকে অ্যামিকে বাদ দেয়া যাবে না। কারণ ভিলেন তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবে এমন একটা দৃশ্য রয়েছে নাটকে। আর ভিলেন হচ্ছে জো স্বয়ং। ছোটখাট অ্যামিকে বয়ে নিতে অসুবিধে হয় না তার। নিজের স্বার্থেই তাই নাটকে রাখতে হচ্ছে অ্যামিকে। অবশ্য এ নাটকে আরও বেশ কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করতে হবে জোকে। নাটকটা তারই লেখা কিনা। নায়ক, ভিলেন এবং যাদুকরীর ভূমিকায় দেখা যাবে ওকেই। নায়িকা অবশ্য মেগ।

'লেখা আর অভিনয় দুটোই এত চমৎকার পারো তুমি, ভাবতেই অবাক লাগে,' বলল বেথ। জো-র ভক্ত সে।

'এটা আর এমন কি,' বলল জো। ভেতর ভেতর খুশিতে ফেটে পড়েছে ও। শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের খানিকটা অংশ অভিনয় করতে শুরু করল।

অভিনয় শেষ হলে হাততালি দিয়ে উঠল সবাই।

'খুব জমে উঠেছে মনে হচ্ছে,' দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। চার বোন ছুটে গেল মায়ের কাছে। ওদের ধারণা এত ভাল মা দুনিয়ায় আর কারও নেই।

'কেমন কাটল সারাদিন?' জানতে চাইলেন মিসেস মার্চ। 'কেউ এসেছিল, বেথ? মেগের সর্দির কি খবর? খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোকে। জো, অ্যামি কেমন আছিস তোরা?'

কথা বলতে বলতে ভেজা কাপড় ছাড়লেন মিসেস মার্চ। গরম চটীজোড়া পায়ে গলালেন। বসে পড়লেন ইজি চেয়ারে। এ সময় এক কাপ গরম চা চাই তাঁর।

মেয়েরা ছোটাছুটি শুরু করল। দ্রুত চায়ের টেবিল সাজিয়ে ফেলল মেগ। ফায়ারপ্লেসের জন্যে কাঠ নিয়ে এল জো, আর চা পরিবেশন করল বেথ।

সবাই চুমুক দিল গরম চায়ে। উজ্জ্বল হাসলেন মিসেস মার্চ। 'তোদের জন্যে একটা খবর আছে।'

'চিঠি! চিঠি! নিশ্চয়ই বাবার চিঠি এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েরা। দ্রুত কাপ খালি করল ওরা। তারপর ঘিরে দাঁড়াল মাকে। উদ্‌গ্রীব হয়ে

রয়েছে সকলে।

'বাবার জন্যে গর্ব হয়,' উষ্ণ গলায় বলল মেগ। 'সৈনিক হিসেবে না পারলেও যুদ্ধে তিনি ঠিকই গেছেন, বয়সের কাছে হার মানেননি।'

'ইস্, আমি যদি বাবার সঙ্গে যেতে পারতাম। নার্স, ড্রামার বা অন্য যে কোন কাজেই আপত্তি ছিল না,' বলল জো।

'অত সহজ নয়,' বলল অ্যামি। 'থাকা-খাওয়ার অনেক কষ্ট ওখানে।'

'বাবা কবে ফিরবেন, মা?' প্রশ্ন করল বেথ।

'আরও কয়েকটা মাস অপেক্ষা করতে হবে রে। অবশ্য যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে অন্য কথা। যাক, চিঠিটা পড়ি, "ওদের সবাইকে আমার ভালবাসা আর চুমু দিও। বাচ্চাদের বলবে সব সময়ই ওদের কথা ভাবি আমি। জানি ওরা মাকে দেখেশুনে রাখবে, যার যার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে যাবে। আমি জানি, ফিরে এসে আমার ছোট্ট মহিলাদের জন্যে আগের চেয়েও বেশি গর্ব অনুভব করব"।'

মার পড়া শেষ হলে নাক টানার শব্দ হতে লাগল। কাঁদছে সবাই। জো পর্যন্ত কান্না গোপন করার চেষ্টা করল না। ওর চোখা নাকটা বেয়ে বড় এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

'আর কখনও অন্য কোথাও যেতে চাইব না,' বলল জো। 'নিজের দায়িত্ব পালন করব।'

'অন্য মেয়েদের পিয়ানো দেখে হিংসে করব না,' বলল বেথ। একটা ভাল পিয়ানোর শখ ওর দীর্ঘদিনের।

'কাপড়ের ব্যাপারে আর কোনকিছু বলব না,' অ্যামি বলল।

'আমিও বদলে যাব,' বলল মেগ, 'এখন থেকে আর কাজের কথা শুনলে বিরক্ত হব না।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মায়ের মুখ। মৃদু হাসলেন তিনি। 'ক্রিসমাসের সকালে বালিশের তলে একটা করে জিনিস পাবি তোরা, খুঁজে দেখিস।'

দুই

আজ ক্রিসমাস। জো-ই সকলের আগে ঘুম থেকে উঠল। বাইরে ভোরের আবছা আলো।

বিছানায় উঠে বসল ও। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মায়ের সেদিনকার কথা।

ওর হাত চলে গেল বালিশের নিচে। বার করে আনল ছোট্ট একটা বই। মলাটটা লাল। বাইবেল।

বইটা খুলল জো। মা কিছু কথা লিখে দিয়েছেন ভেতরে। ফলে বইটার গুরুত্ব যেন আরও অনেক বেড়ে গেল ওর কাছে। 'মেরি ক্রিসমাস,' বলে মেগের ঘুম ভাঙাল জো। বালিশের তলে খুঁজে দেখতে বলল। মেগ বার করে দেখল ওর বইটা সবুজ রঙের। বেথ আর অ্যামির ঘুম ভাঙতেও দেরি হল না। বই পেল তারাও।

'মা কোথায় রে?' প্রশ্ন করল মেগ। সে আর জো ছুটে নেমে এল নিচে, রান্নাঘরে। মাকে উপহারের জন্যে ধন্যবাদ জানাবে।

হান্না রান্না করছিল কি যেন। ভ্রূ কুঁচকে চাইল ওদের দিকে। মেগের জন্মের সময় থেকে এ পরিবারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সে। ওদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে।

হান্নাকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করল জো।

'ঈশ্বর জানেন কোথায় গেছেন,' জবাব দিল হান্না। 'এক মহিলা এসেছিল সাহায্যের জন্যে, তার সঙ্গেই গেছেন। মার মত মানুষ আর দেখিনি বাপু। মানুষকে সব বিলিয়ে দিচ্ছেন!'

'মনে হয় জলদিই ফিরবেন,' বলল মেগ। 'তুমি বরং কেকগুলো বানিয়ে ফেল।'

সে আর জো চলে এল লিভিং রুমে। উপহার কিনেছে তারা, সেগুলো দেখার জন্যে। একটা ঝুড়িতে সবগুলো জিনিস ভরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে সোফার নিচে। মা যাতে কিছুতেই জানতে না পারেন।

'অ্যামির সেন্টের শিশিটা কই?' অবাক হয়ে বলল মেগ। 'নেই দেখছি।'

'ও-ই নিয়ে গেছে খানিক আগে,' জবাব দিল জো। চটীজোড়া পরে নেচে নিল খানিকটা। শক্ত ভাবটা দূর হবে এতে। মায়ের পরতে আরাম হবে।

'রুমালগুলো সুন্দর না?' ঘরে ঢুকে বলল বেথ। 'নিজেই এমব্রয়ডারি করেছি।'

দরজা খোলার শব্দ হল এসময়। শোনা গেল পায়ের শব্দ।

'লুকা লুকা,' ফিসফিস করে বলল জো। 'মা আসছেন।' ঝুড়িটা লুকোতে হুটোপুটি লেগে গেল। মা নয়, ঘরে ঢুকল অ্যামি। বোনদেরকে ওখানে দেখে লজ্জায় লাল হল সে। মা ফেরেননি এখনও।

'কোথায় গিয়েছিলি? কি লুকোচ্ছিস রে?' প্রশ্ন করল মেগ। অবাক হয়ে

গেল সক্কাল বেলাতেই অ্যামি বাইরে বেরিয়েছে বলে। কুঁড়ের রানী তাদের এই ছোট বোনটি। বিছানা ছাড়তে মহা আপত্তি তার।

'হাসবে না কিন্তু, জো,' বলল অ্যামি। 'ছোট শিশি এনেছিলাম না? ওটা বদলে বড় দেখে একটা নিয়ে এলাম। সব খরচ করে ফেলেছি। নিজের জন্যে কিছু রাখিনি। আমাকে আর স্বার্থপর বলতে পারবে না।'

'কক্ষনো না,' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল জো। দরজা খুলল আবার। এবার নিশ্চয় মা। মেয়েরা ঝটপট গিয়ে বসে পড়ল টেবিলে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, নাস্তা করবে।

'মেরি ক্রিসমাস, মা। উপহারের জন্যে ধন্যবাদ,' সমস্বরে চেঁচাল ওরা।

মিসেস মার্চ মেয়েদের দিকে চেয়ে হাসলেন। বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে রয়েছেন তিনি।

'মেরি ক্রিসমাস,' পাল্টা বললেন তিনি। 'তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা ছিল।'

'কি কথা, মা?' সবার হয়ে প্রশ্ন করল মেগ।

'বলছি। কাছেই হামেল নামে এক জার্মান মহিলা থাকে। বিধবা। ওর একটা কোলের বাচ্চা রয়েছে। এটা সাত নম্বর। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ওর বাচ্চাগুলো একটা খাটে গাদাগাদি করে শোয়। ঘরে আগুনের ব্যবস্থা নেই, খাবার নেই। বড় ছেলেটা এসেছিল আমার কাছে। বলল শীতে আর খিদেয় বড় কষ্ট পাচ্ছে ওরা। মামণিরা, ক্রিসমাসের উপহার হিসেবে ওদেরকে তোমাদের নাস্তাগুলো দেবে?'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ সকলে। ওরা সবাই ক্ষুধার্ত। মায়ের সঙ্গে নাস্তা করবে বলে প্রায় ঘণ্টাখানেক হল অপেক্ষা করে রয়েছে। সবার আগে কথা বলে উঠল জো, 'নিশ্চয়ই দেব, মা। ভাগ্যিস আমরা খেতে শুরু করে দিইনি।'

অন্যেরা ততক্ষণে ঝুড়িতে নাস্তা ভরতে শুরু করে দিয়েছে। গর্বের হাসি হাসলেন মিসেস মার্চ।

'জানতাম আমার কথা রাখবি তোরা,' বললেন তিনি। 'ফিরে এসে দুধ আর পাঁউরুটি দিয়ে নাস্তা সারব আমরা। বাকিটা পুষিয়ে নেব ডিনারের সময়, কি বলিস?'

মেয়েরা সায় দিল তাঁর কথায়। দ্রুত তৈরি হয়ে গেল ওরা। তারপর হান্নাকে নিয়ে বেরিয়ে এল পেছনের দরজা দিয়ে, খুব কম লোকই দেখতে পেল ওদের।

একটা জীর্ণ বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা। জানালাগুলো ভাঙাচোরা,

ঘরে আগুনের ব্যবস্থা নেই, বিছানার চাদরগুলো নোংরা। চারদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন স্পষ্ট। এক অসুস্থ মহিলা লিকলিকে একটা বাচ্চাকে নিয়ে শুয়ে রয়েছে। আরও এক দঙ্গল ফ্যাকাসে, ক্ষুধার্ত বাচ্চা গুটিসুটি মেরে পড়ে রয়েছে একটামাত্র লেপের নিচে।

ওদের দেখে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বাচ্চাগুলো, ঠোঁটে মলিন হাসি।

'ক্রিসমাসে ঈশ্বর আমাদের কাছে দেবদূতদের পাঠিয়েছেন,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল মিসেস হামেল।

হান্না সঙ্গে করে কাঠ নিয়ে এসেছিল। আগুন ধরাল সে। জানালার ভাঙা শার্সিগুলো পুরানো হ্যাট আর নিজের শাল দিয়ে ঢেকে দিল। মিসেস মার্চ অসুস্থ মাকে গরম সুপ এগিয়ে দিলেন। ওদিকে টেবিল ঘিরে ছড়িয়ে পড়ল মেয়েরা। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এল আগুনের কাছে। খেতে দিল। ক্ষুধার্ত পাখিদের মত খেতে লাগল বাচ্চারা।

'আপনাদের যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব,' বলল মিসেস হামেল। 'আজকের কথা বেঁচে থাকতে ভুলব না আমি।'

মিসেস মার্চ কথা দিলেন প্রতিদিন একবার করে দেখা করে যাবেন তার সঙ্গে।

বাচ্চাদের খাওয়া শেষ। এবার ফেরার পালা। বিদায় নিয়ে ফিরে চললেন মিসেস মার্চ, হান্না আর মেয়েরা। ওদের মনে হল এ শহরের সবচেয়ে সুখী মানুষ ওরা ক'জনই। মনে মনে স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল প্রত্যেকে।

বাড়ি ফিরে দুধ আর পাঁউরুটি দিয়ে নাস্তা সারল ওরা। তারপর মেয়েরা উপহারগুলো তুলে দিল মায়ের হাতে।

মা অবাক হলেন, খুশিও। তক্ষুণি পরে নিলেন জো-র চটীজোড়া। পকেটে ঢোকালেন বেথের রুমাল। গায়ে মাখলেন অ্যামির সেন্ট। মেগের গ্লাভস চমৎকার মানাল তাঁকে।

এরপর মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাটকের প্রস্তুতিতে। থিয়েটার বানানো হল মেয়েদের শোবার ঘরটাকে। দর্শকরা বসবে খাটে। দেয়ালে ঝোলানো হল পর্দা, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন।

জো ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষের ঢোকার অনুমতি নেই থিয়েটারে। সে-রাতে ডজনখানেক মেয়ে চেপে বসল খাটে। ওটাই ড্রেস সার্কেল। পর্দা ওঠেনি এখনও। তবে পর্দার ওপারের ফিসফিসানি কানে এল দর্শকদের। অ্যামির খিলখিল হাসিও শোনা গেল।

বেলের শব্দে পর্দা উঠল। শুরু হল নাটক। প্রথম দৃশ্যে মেগকে উঠতে হবে টাওয়ারে, কাঠের মই বেয়ে। ওখানে দাঁড়িয়ে প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করবে সে। এটুকু বেশ ভালভাবেই হয়ে গেল। কিন্তু গোল বাধল খানিক বাদেই। প্রেমিকরূপী জো হাজির হতেই মই বেয়ে তড়িঘড়ি নামতে গেল মেগ। ফলে যা হবার তাই হল। কাপড়ে পা বেধে জো আর মই সহ হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল সে। প্রেমিক যুগল ঢাকা পড়ে গেল মইয়ের আড়ালে।

দর্শকরা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল। এসময় মাথা জাগাল মেগ। রেগেমেগে জোকে বলল, 'আগেই বলেছিলাম আমাকে ওখানে ওঠাস না। আমার কথা তো কানেই তুললি না তুই।'

'আরে, রাগছ কেন? ভান কর এটা নাটকেরই অংশ,' ফিসফিসিয়ে বলল জো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। স্টেজ থেকে টেনে নিয়ে গেল মেগকে।

জো-র জন্যে আরও দুঃখ অপেক্ষা করছিল। ওকে পুরোপুরি হতাশ করল অ্যামি। বান্ধবীদের সামনে কিছুতেই অজ্ঞান হবে না সে। জো-র অনুরোধে যদিও বা হল কিন্তু মাটিতে পড়েও চোখ বুজল না। কিন্তু দর্শকরা পাত্তা দিল না এসব ভুলত্রুটি। দারুণ উপভোগ করল তারা নাটকটি। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের মধ্য দিয়ে শেষ হল নাটক। তুমুল করতালি দিয়ে চার বোনকে অভিনন্দিত করল দর্শকরা। ঠিক সে মুহূর্তেই ড্রেস সার্কল অর্থাৎ খাটটা দর্শকসুদ্ধ ভেঙে পড়ে গেল। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ কুমড়ো গড়াগড়ি দিতে লাগল মাটিতে। হান্না এসেছিল সবাইকে ডিনারের জন্যে ডাকতে। এ অবস্থা দেখে ভড়কে গেল সে। টেনে টুনে দাঁড় করাতে লাগল দর্শকদের। গড়াগড়ি খাওয়া শেষে এবার সবাই চলল ডিনার খেতে। ডাইনিং রুমে ঢুকে ওদের চোখ ছানাবড়া। টেবিলময় সুস্বাদু সব খাবারের ডিশ। আইসক্রীম, কেক, নানা ধরনের ফল, ফ্রেঞ্চ বনবন, কি নেই? টেবিলের মাঝখানে সাজানো রয়েছে ফুলের বিশাল চারটে তোড়া, ক্রিসমাসের এমন চমৎকার আয়োজন এর আগে আর কখনও দেখেনি মেয়েরা। মায়ের দিকে চাইল ওরা। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। মুখে মৃদু হাসি। পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করছেন বোঝা যায়।

'নিশ্চয়ই সান্তা ক্লজ পাঠিয়েছেন এসব?' জানতে চাইল বেথ।

'উঁহুঁ,' বললেন মিসেস মার্চ। 'মিস্টার লরেন্স।'

'মানে ওই লরেন্স ছেলেটার দাদা?' চেঁচিয়ে উঠল মেগ। 'তাঁকে তো আমরা ভাল করে চিনিই না।'

'হান্না ওঁর এক কাজের লোককে সকালের সব কথা বলেছে। তোমরা যে নিজেরা নাস্তা না করে অন্যদের খাইয়েছ মনে হয় সেই লোকের মুখেই

শুনেছেন মিস্টার লরেন্স। তাই তোমাদের জন্যে এসব পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কাজের লোক নয়,' বলল জো। 'বুদ্ধিটা ওই ছেলেই ঢুকিয়েছে দাদার মাথায়। ছেলেটা কিন্তু ভাল। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও করতে চায়। মেগই তো কথা বলতে দেয় না ওর সঙ্গে।' প্লেটে আইসক্রীমের বড় একটা টুকরো তুলে নিল সে।

'ছেলেটার চালচলন খারাপ নয়,' বললেন মা। 'ওর সঙ্গে মিশতে পারিস। আমার আপত্তি নেই। ও নিজেই নিয়ে এসেছিল তোড়াগুলো। কিন্তু তোরা নাটক করছিলি বলে আর ডাকিনি। ছেলেটা মন খারাপ করে চলে গেল। তোরা ফুর্তি করছিস আর ও বেচারা তাতে যোগ দিতে পারছে না।'

'এর পরের বার ওকে নাটক দেখতে দেব,' বলল জো। 'চাই কি এক-আধটা রোলও দিতে পারি।'

'ফুলগুলো কি সুন্দর না রে?' আবারও উচ্ছ্বসিত হল মেগ।

নিজের তোড়াটায় গাল ঠেকাল বেথ।

'বাবাকে পাঠাতে পারতাম যদি,' নরম গলায় বলল সে। 'বাবা নিশ্চয়ই আমাদের মত আনন্দে নেই।'

তিন

'জো এই জো, কোথায় তুই?' হাঁক পাড়ছে মেগ। চিলেকোঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'এই যে এখানে,' জবাব দিল জো। চিলেকোঠা হচ্ছে জো-র প্রিয় জায়গা। এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে, তিন পা-অলা একটা পুরানো সোফায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে। সঙ্গে থাকে মজার কোন বই।

মেগ উঠে এল চিলেকোঠায়। ঘরে ঢুকে দেখতে পেল তার বোন একদিকে আপেল খাচ্ছে আর একদিকে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। যে উপন্যাসটা পড়ছে জো সেটা আবার খুবই বিয়োগান্তক, সেজন্যেই এ দুরবস্থা।

'একটা দাওয়াত আছে,' বলল মেগ। 'মিসেস গার্ডিনারের বাড়িতে পার্টি, কাল রাতে। মা বলেছেন যেতে দেবেন। কিন্তু কি পরে যাব বল তো রে?'

'সুতির ফ্রকগুলো পরলেই তো হয়,' জবাব দিল জো। জামা-কাপড় নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই তার। 'তাছাড়া ওগুলোর চেয়ে ভাল আর তো

কিছু নেইও আমাদের।'

'আহারে, একটা সিল্কের ড্রেস যদি থাকত,' আক্ষেপ করল মেগ। 'মা বলেছেন আমার আঠারো বছর হলে দেবেন একটা। কিন্তু সে তো আরও পাক্কা দু'বছর।'

'দুঃখ কোরো না, মেগ,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল জো। 'সুতির ফ্রকগুলো খারাপ নয়। ও হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার ফ্রকটার পেছন দিকটা পুড়ে গেছে আর সামনেটা তো আগেই ছেঁড়া ছিল। আমি কি পরব?'

'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল মেগ। 'পনেরো বছর বয়স হল এখনও নিজের জিনিস ঠিক রাখতে শিখলি না। সামনের দিকটা না হয় সেলাই করে দেব কিন্তু পেছনটার কি ব্যবস্থা হবে? উম্, এক কাজ করিস, পুরোটা সময় এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবি, বুঝেছিস? কেউ আর তাহলে পেছন দিকটা দেখতে পাবে না।'

'আচ্ছা,' বড় বোনের কথায় সায় দিল জো। 'এখন যাও তো, বইটা শেষ করতে দাও।'

'যাচ্ছি তো,' বলল মেগ। 'এই শোন, চুলে নতুন রিবন বাঁধব ভাবছি। মা মুক্তোর পিনটা দেবেন বলেছেন। জুতো জোড়াও নতুন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গ্লাভস নিয়ে, ও দুটোর অবস্থা সুবিধের নয়।'

'কিন্তু চলবে তো। আমারগুলোর কথা ভাব একবার। লেমোনেড পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। পার্টিতে গ্লাভস ছাড়াই যাব।'

'না, গ্লাভস পরতেই হবে। নইলে আমি যাব না।'

'আমার তবে আর যাওয়া হল না।'

'মার গ্লাভস ধার নে না। অবশ্য ও দুটোও নষ্ট করে ছাড়বি তুই, কোন সন্দেহ নেই। এখন উপায়?'

'উপায় একটা আছে,' বলল জো। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। 'দুজনেই ভালজোড়া একটা করে পরব। আর পচা দুটো রেখে দেব হাতে, পরব না।'

'কিন্তু তোর হাত যে বিরাট! আমারটা পরে তো ঢলঢলে করে দিবি।'

'তবে থাক। গ্লাভসের দরকার নেই,' বিরক্ত হয়ে বলল জো। 'লোকে যা বলে বলুক গে, কে পরোয়া করে?'

'পরিস,' বলল মেগ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল, 'একটাই অনুরোধ, দাগ ফেলে দিস না। আর একটা কথা, পার্টিতে গিয়ে বেশি তিড়িং বিড়িং করবি না। চুপ করে বসে থাকবি।'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না,' কথা দিল জো।

*

নববর্ষের আগের রাত। মেগ আর জো ব্যস্ত রইল পার্টির জন্যে সাজগোজের কাজে। তাদের সাহায্য করে গেল ছোট দু'বোন। চুলের কাঁটা, রিবন, সেন্ট এগিয়ে দিল তারা। মেগের ইচ্ছে গালের দু'পাশের চুল খানিকটা কোঁকড়া করে নেবে। তার মনোবাসনা পূর্ণ করতে এগিয়ে এল জো। গরম একটা চিমটে দিয়ে চুল কোঁকড়ানোর কাজ করতে লাগল সে।

'এরকম ধোঁয়া বেরয় নাকি?' প্রশ্ন করল বেথ। চুল পোড়ার গন্ধে ভয় পেয়ে গেছে সে।

'বেরয়ই তো,' আস্থার সঙ্গে বলল জো। 'ভেজা ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে আরকি।'

'কি বিকট গন্ধ রে বাবা!' বলল অ্যামি। নিজের কোঁকড়া চুলগুলোয় হাত বুলাল সে।

'এবার দেখবে কোঁকড়া চুল কাকে বলে,' মেগের বেণীর সঙ্গে পেঁচানো কাগজটা চিমটে দিয়ে খুলে দিতে দিতে বলল জো।

কিন্তু কাগজ খুলেই অবাক হয়ে গেল সে। কোথায় কোঁকড়া চুল! মেগের চুল কাগজসুদ্ধ উঠে এসেছে।

'করেছিস কি! আমার সব চুল গেছে,' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল মেগ। 'এখন পার্টিতে যাব কি করে?'

'আসলে আমার কপালটাই খারাপ,' গুঙিয়ে উঠল জো। 'যা করি তাই কেঁচে যায়। গরম চিমটের জন্যেই এই দশা।'

'দোষটা আমারই,' বলল মেগ। 'নইলে তোকে চুল ঠিক করতে দিই?'

'ভেব না, মেগ। ক'দিন পরেই গজিয়ে যাবে আবার,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল বেথ। 'রিবনটা বেঁধে ওটার কিছুটা কপালের ওপর ফেলে দিলেই হবে,' পরামর্শ দিল অ্যামি। 'লোকে ভাববে নতুন ফ্যাশন।'

অ্যামির পরামর্শ মনে ধরল মেগের। ওর কথামত রিবন বাঁধার ফলে সুন্দর দেখাচ্ছে এখন ওকে। রূপালী একটা পোশাক পরেছে সে। জো পরেছে মেরুন রঙের। একহাতে চলনসই গ্লাভ পরে অন্য হাতটা খালি রেখেছে ওরা। অবশ্য সে হাতের গ্লাভ নিতে ভোলেনি। লোকে মনে করবে ইচ্ছে করেই পরেনি। হাই হিল জুতো জোড়া মেগের পায়ে এঁটে বসেছে। কিন্তু সেকথা স্বীকার করল না ও। ওদিকে চুলের কাঁটাগুলো খোঁচাচ্ছে জো-র মাথা। মেগের ভয়ে চুপ করে সব সহ্য করতে লাগল সে।

'ভালয় ভালয় বেড়িয়ে আয়,' বললেন মিসেস মার্চ। মেয়েদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার জন্যে এলেন তিনি। বোনেরাও এল। 'বেশি খাই খাই

করবি না। হান্না তোদের এগারোটার সময় আনতে যাবে। দেরি করিস না যেন।'

হাত নেড়ে বিদায় জানাল দু'বোন। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। 'দাঁড়া, দাঁড়া, রুমাল নিয়েছিস?' চিৎকার করে উঠলেন মিসেস মার্চ।

'নিয়েছি, মা,' ঘুরে জবাব দিল জো। চাইল মেগের দিকে। 'ভূমিকম্পের সময়ও মা রুমালের কথা ভুলবেন না।'

'মা ঠিকই করেন। সত্যিকারের ভদ্রমহিলাকে চেনা যায় তার জুতো, গ্লাভস আর রুমাল দেখে,' পাল্টা বলল মেগ। মনের গভীরে 'সত্যিকারের ভদ্রমহিলা' হওয়ার আকুতি রয়েছে তার।

মিসেস গার্ডিনারের বাড়িতে ঢুকে জো বলল, 'আমাকে উল্টোপাল্টা কিছু করতে দেখলে চোখ টিপে দেবে। ব্যস, তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না।'

'ভদ্রমহিলারা চোখ টেপে না,' গম্ভীর স্বরে বলল মেগ। 'তুই কোন ভুল করলে একটা ভ্রূ তুলব আমি। আর যদি দেখিস মাথা নাড়ছি তবে বুঝবি তুই ঠিকই করছিস।'

মিসেস গার্ডিনারের ড্রইংরুমে ঢুকল দু'বোন, ওদের অভ্যর্থনা জানাল ভদ্রমহিলার ছ'মেয়ে। বড় মেয়েটির নাম স্যালি। মেগের পরিচিত। ওর সঙ্গে গল্প-গুজবে মেতে উঠল সে। কিন্তু এসব মেয়েলী গল্পে কোন আগ্রহ নেই জো-র। সে একা পড়ে গেল। ঘরের অন্য দিকটাতে জনা ছয়েক হাসিখুশি তরুণ স্কেটিং নিয়ে আলাপ করছে। জো-র খুব প্রিয় বিষয় টা। তার মন চাইছে ওদের আলোচনায় যোগ দিতে। ইচ্ছের কথাটা ফিসফিস করে জানাল মেগকে। কিন্তু মেগের ভ্রূ জোড়া আকাশে উঠতে দেখে ভয়ে আর নড়ার সাহস পেল না সে। এখন পর্যন্ত ওর সঙ্গে কথা বলতে কেউ এগিয়ে আসেনি। ঘরের এক কোণে একাকী দাঁড়িয়ে রইল জো

কিছুক্ষণ পরে নাচ আরম্ভ হল। এক কিশোর নাচতে চাইল মেগের সঙ্গে। তাকে ফেরাল না মেগ। জুতোর ব্যথা চেপে রেখে নাচল।

এ সময় জো-র দিকে এগিয়ে এল লাল চুলের এক কিশোর। ছেলেটা হয়ত নাচতে বলবে, এই ভয়ে জো লুকোল গিয়ে পর্দার আড়ালে। কিন্তু খুব একটা সুবিধে হল না তাতে। কারণ আরও একজন তখন লুকিয়ে রয়েছে ওখানে। ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ছেলেটি। লরেন্স।

'আ-আমি জানতাম না,' তোতলাতে লাগল জো। 'এখানে রয়েছে কেউ।'

ছেলেটিও অবাক হয়েছে ওকে দেখে। 'মেহমানদের চিনি না বড় একটা। অস্বস্তি লাগছিল, তাই ভাবলাম—'

'আমারও একই সমস্যা,' বলল জো।

'আমরা তো প্রতিবেশী, তাই না, মিস মার্চ?'

'জ্বী, মিস্টার লরেন্স। আপনার পাঠানো ক্রিসমাস উপহার সবার দারুণ ভাল লেগেছে।'

'দাদু পাঠিয়েছিলেন, মিস মার্চ। আমি নই,' বলল ছেলেটি। গম্ভীর ভাবটা বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে।

'আমি মিস মার্চ নই। শুধু জো।'

'আমিও মিস্টার লরেন্স নই। লরি।'

দুজনেই হেসে ফেলল এবার। কেটে গেল শীতলতা। বহু দিনের পুরানো বন্ধুর মত গল্প করতে লাগল ওরা। জো-র মুখে হাসি। পোড়া পোশাক আর নোংরা গ্লাভসের কথা মনেই নেই তার। লরির চেহারা আগে থেকেই ভাল লাগে ওর। কালো, কোঁকড়া চুল, বাদামি চামড়া, কালো চোখ আর সুন্দর নাক। সত্যিই সুদর্শন ছেলেটি। লরির বয়স কত প্রায় জিজ্ঞেস করেই বসেছিল সে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অতিকষ্টে সামলে নিল নিজেকে। বুদ্ধি খাটিয়ে কথা আদায় করতে হবে।

'কলেজে পড় নিশ্চয়ই?' প্রশ্ন করল জো।

'এখনও বছর দুয়েক বাকি। সতেরো হলে তবে যেতে পারব।'

'তোমার মাত্র পনেরো বছর?' অবাক হয়ে জানতে চাইল জো। লরির বয়স ওর সমানই, কিন্তু ওর চেয়ে অনেকখানি লম্বা সে।

'আগামী মাসে ষোলো হবে।'

'আমার না কলেজে যেতে যা ইচ্ছে করে!' দীর্ঘশ্বাস পড়ল জো-র।

'আমার কলেজের কথা ভাবতেই জঘন্য লাগে,' কঠিন শোনাল লরির গলা।

'তবে তোমার কি ভাল লাগে?'

'ইতালিতে গিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চলতে পারতাম যদি!'

'নিজের ইচ্ছেমত' কি ব্যাপার সেটা জানার জন্যে খুব কৌতূহল হল জো-র। কিন্তু লরির রাগী চেহারার দিকে চেয়ে চুপ থাকতে বাধ্য হল সে।

প্রসঙ্গ পাল্টাল জো। 'পাশের ঘরে দারুণ একটা পিয়ানো আছে। বাজাবে?'

'তুমি যদি বাজাও তবে আমিও যেতে পারি।'

'সম্ভব নয়। আসলে—' আচমকা থেমে গেল জো।

'আসলে কি?'

বলা উচিত হবে কিনা বুঝে পেল না জো। শেষমেশ জিজ্ঞেস করে বসল, 'কাউকে বলবে না তো?'

'না।'

'কথা দিচ্ছ?'

'অবশ্যই।'

'আমার ফ্রকটা না পুড়ে গেছে! তাই মেগ আমাকে বেশি ঘোরাফেরা করতে মানা করেছে, কেউ যদি দেখে ফেলে? মজার ব্যাপার না?'

লরি মজা পেল বলে মনে হল না। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। 'তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি এস।'

দু'জন মিলে খানিকক্ষণ পিয়ানো বাজাল। এসময় জো দেখতে পেল পাশের ঘর থেকে ইশারায় মেগ তাকে ডাকছে। মেগের কাছে চলে এল জো। পা চেপে ধরে রেখেছে মেগ।

'গোড়ালি মচকেছে,' বলল মেগ। 'দাঁড়াতে খুব কষ্ট হচ্ছে। বাড়ি যে কিভাবে ফিরব এখন!'

'হাই হিল পরলে তো মচকাবেই। এখন ক্যারিজ খোঁজ করতে হবে,' বসে পড়ে মেগের গোড়ালি মালিশ করতে করতে বলল জো।

'ক্যারিজের ভাড়া তো অনেক রে,' বলল মেগ। ব্যথায় গোঙাচ্ছে। 'আমরা বাড়ি ফিরব কি করে?'

'কে জানে,' জবাব দিল জো। 'হান্না আসুক। হয়ত ওকে দেখলে ব্যথা কিছুটা কমবে তোমার।'

'খুব ক্লান্তি লাগছে রে, জো,' কোনমতে বলল মেগ। 'তুই আমার জন্যে এক কাপ কফি নিয়ে আয়।'

ডাইনিং রুমের দিকে ছুটে গেল জো। এক কাপ কফি তুলে নিল। খানিকটা চলকে পড়ল সামনের দিকের কাপড়ে। পেছনটার মত সামনেটাও গেল এবার।

'আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হল না,' আপন মনেই বলে উঠল জো। মেগের গ্লাভটা দিয়ে কাপড় মুছে নিল সে। গ্লাভটাও নোংরা হয়ে গেল।

'কি হল, জো?' পরিচিত কণ্ঠস্বর। লরি। এক হাতে ধরে রেখেছে কফির কাপ, অন্য হাতে আইসক্রীমের প্লেট।

লরিকে সব কথা খুলে বলল জো।

'এ কাপটা তোমার বোনকে দেব?'

'তবে তো দারুণ হয়।'

লরি কফি দিয়ে এল মেগকে। আবার ফিরে এসে কেক আর বনবন নিয়ে গেল। পেট পুরে খেল ওরা। তারপর বসে পড়ল 'বাজ' খেলতে। এ সময় এসে হাজির হল হান্না, বাড়ি ফিরতে হবে। ব্যথার কথাটা ভুলে উঠে দাঁড়াল মেগ। কিন্তু বসে পড়তে হল তখুনি আবার।

'মচকানো পা নিয়ে হাঁটতে পারবে না,' বলল লরি। 'আমাদের ক্যারিজে করে বাসায় নামিয়ে দেব তোমাদের। চল।'

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যারিজে চেপে বসল ওরা। লাটসাহেবের মত পৌঁছে গেল বাড়ি। ঘরে পা রেখেছে কি রাখেনি কানে এল দুটো কণ্ঠস্বর। 'পার্টিতে কি কি করলে শিগ্গির বল, শিগ্গির বল।'

বোনদের জন্যে আলগোছে কয়েকটা বনবন সরিয়ে রেখেছিল জো। ওরা খেতে শুরু করলে সংক্ষেপে আজকের অভিযানের বর্ণনা দিল সে।

'গরীব হলে কি হবে, বড়লোকদের মেয়েদের চেয়ে আমরা কম ফুর্তি করিনি,' বলল জো।

মৃদু হেসে সম্মতি জানাল মেগ।

চার

পরদিন সকালের নাস্তা মোটেই জমল না। ছুটি শেষ হয়ে গেছে। এবার মেয়েদেরকে ফিরে যেতে হবে যার যার কাজে।

'একটা সপ্তাহ মজা করার পর কি আর কাজ করতে ইচ্ছে করে?' বিরক্তি ঝরে পড়ল মেগের গলায়। 'যেসব মেয়েদের খেটে খেতে হয় না তারাই দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী।' চিন্তায় পড়ে গেছে সে। দুটো পুরানো পোশাকের মধ্যে কোন্‌টা পরবে ভেবে কিনারা করতে পারছে না।

'ওসব বলে আর কি লাভ, মেগ? কাজ তো করতেই হবে,' বলল জো। 'মার্চ ফুফুর মর্জিমত চলা খুব কঠিন, কিন্তু পালিয়ে তো আর আসতে পারছি না।'

'তোর তো শুধু একটা বুড়ি, আর আমাকে যে চার চারটে বিচ্ছুকে সামলাতে হয়, সেটা একবার ভেবেছিস? আমার জায়গায় তুই হলে পাগল হয়ে যেতিস,' গজগজ করতে করতে বলল মেগ।

বাচ্চা চারটের দেখাশোনা করা ওর চোখে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম কাজ। মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে ওর। সাজতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না!

'সেজে হবেটা কি?' ক্ষোভের সঙ্গে বলল সে। 'খেয়াল করার তো কেউ নেই। এভাবে কাজ করতে করতেই বুড়িয়ে যাব। অন্যদের মত জীবনটাকে আর উপভোগ করা হবে না।'

গোমড়ামুখে নাস্তা সারল মেগ। জো-র মনটাও বিশেষ ভাল নেই। কালিদানটা ফেলে দিয়েছে সে, নিজের অজান্তেই হ্যাটের ওপর বসে পড়ে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে ওটা।

অ্যামি ওদিকে কেঁদে চলেছে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে। ছুটিতে হোমওয়র্ক সারেনি। এখন তাড়াহুড়ো করে অঙ্কগুলো মেলাতে গিয়ে ভুল করে বসছে। সব আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে।

'বেথ, তোর কুৎসিত বিড়ালগুলো সেলারে ঢোকা, নইলে সব ক'টাকে চুবিয়ে মারব,' ক্রুদ্ধস্বরে বলল মেগ। বেথের একটা রসিক বেড়াল কাঁধে চেপে বসেছে ওর।

চার বোনে মিলে চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল।

'থামবি তোরা!' ধমকে উঠলেন মিসেস মার্চ। ওদের জ্বালাতনে চিঠিটা কিছুতেই শেষ করতে পারছেন না তিনি। একটা লাইন তিনবার কাটতে হয়েছে।

যা হোক, নাস্তা সারল মেয়েরা। মেগ, জো আর অ্যামি তৈরি হয়ে নিল বাইরে যাওয়ার জন্যে।

'আমরা এতক্ষণ যা করলাম, কেবল মা বলেই সহ্য করলেন,' বলল জো। 'ফেরার সময় সবাই কিন্তু ভাল-মানুষের মত ফিরব, কেমন?'

গেটের কাছে চলে এল ওরা। পেছন দিকে ফিরে মার উদ্দেশে হাত নাড়ল। যথারীতি সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। হাত নাড়লেন। মনটা খুশি হয়ে উঠল ওদের।

মিস্টার মার্চ এক অভাবী বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে প্রচুর টাকা খোয়ান। তখন থেকেই বড় দু'মেয়ে মেগ আর জো বাবা-মাকে চেপে ধরল কাজ করতে দেয়ার জন্যে। প্রথমে তো কিছুতেই রাজি ছিলেন না তাঁরা, কিন্তু সংসারের প্রয়োজনের কথা ভেবে শেষপর্যন্ত আর রাজি না হয়ে পারেননি। নার্সারি গভর্নেসের কাজ নিল মেগ। জো চলে গেল মার্চ ফুফুর বাড়িতে, চাকরি নিয়ে। বৃদ্ধা মহিলা খোঁড়া, তাঁকে দেখাশোনার জন্যে লোক দরকার। সে কাজটাই করছে এখন জো।

মার্চ ফুফুর লাইব্রেরিটা জো-র মন কেড়ে নিয়েছে। বিশাল লাইব্রেরি, প্রচুর বই। একটু সুযোগ পেলেই হল, জো গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ে ওখানে। ডুবে যায় বইয়ের পাতায়। কিন্তু অন্য সব সুখের মুহূর্তের মত

এসময়টুকুও পেরিয়ে যায় কোন্ ফাঁকে যেন। জো-র মন যখন কেবল বইয়ের পাতায়, এরপর কি হবে জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব ঠিক তক্ষুণি ডাক পড়ে তার, 'জোসিফিন! জোসিফিন!' কি আর করা। বই ফেলে রেখে উঠে পড়ে ও। মার্চ ফুফুর চুল আঁচড়ে দেয় কিংবা তাঁর কুকুরটাকে গোসল করায়।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে এ বাড়িতে কাজ করতে এসে অনেক কিছু শিখেছে জো। মার্চ ফুফু খুব কড়া ধাঁচের মহিলা, নিয়ম মেনে চলেন। ফলে জো-কেও সারাদিন একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। তাতে আপত্তি নেই ওর। কিছু পয়সা তো অন্তত আসছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে।

ওদিকে বেথ আবার স্কুলে যেতে চায় না। যুদ্ধ শুরুর আগে বাবা ওকে বাড়িতেই পড়াতেন। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর একা হয়ে পড়েছে সে। মা সারাদিন ব্যস্ত থাকেন বাইরের কাজেকর্মে। ফলে এখন ঘরের কাজে হান্নাকে সাহায্য করে সে। সঙ্গীতে দারুণ ঝোঁক ওর। কিন্তু আর্থিক কারণে ও লাইনে পড়াশোনা করা হয়নি।

অ্যামি ভালবাসে ছবি আঁকতে। খানিকটা জেদি স্বভাবের সে, বেশি লাই দিলে যা হয় আরকি।

যাহোক, এক ব্যাপারে মিল রয়েছে চার বোনেরই। ছুটি শেষে কাজে ফিরতে প্রবল আপত্তি সবার।

শনিবারের এক ঠাণ্ডা বিকেল। জোকে রবারের বুট পায়ে ঘরময় গটমট করে হেঁটে বেড়াতে দেখা গেল। এক হাতে ঝাড়ু আর অন্য হাতে বেলচা।

'ব্যাপারটা কি বল তো,' অবাক হয়ে জানতে চাইল মেগ।

ওর দিকে চেয়ে চোখ নাচাল জো।

'বাইরে যাচ্ছি, ব্যায়াম করতে।'

'এই শীতের মধ্যে?' কেঁপে উঠল মেগ। 'তারচেয়ে বরং আগুনের পাশে বসে গরম পোহা।'

'উঁহুঁ,' বলল জো। 'আমি চাই অ্যাডভেঞ্চার, বাইরে যাচ্ছি সেজন্যেই।'

আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে গেল মেগ। আগুনের পাশে বই খুলে বসল। জো চলে গেল বাগানে। মাটি খুঁড়ে রাস্তা তৈরি করতে লাগল, সোৎসাহে। বাগানের ওপারেই মিস্টার লরেন্সের বাড়ি। দুটো বাড়ির মাঝখানে রয়েছে নিচু একসার ঝোপ, আলাদা করে রেখেছে বাড়ি দুটোকে।

গার্ডিনারদের বাসার পার্টির পর থেকে লরির প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে

গেছে জো-র। ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পরম আগ্রহী সে।

মাটি খোঁড়ার সময় জো-র চোখে পড়ল মিস্টার লরেন্স ক্যারিজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এই সুযোগ! দ্রুত রাস্তা খুঁড়ে ঝোপের কাছে চলে গেল সে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে চাইল একবার। নিশ্চুপ চারদিক। জানালাগুলোর পর্দা নামানো রয়েছে। কেবল উঁচুমত একটা জানালায় দেখা যাচ্ছে কালো একটা মাথা। জো-দের বাড়ির দিকেই চেয়ে রয়েছে মাথাটা। বেথ আর অ্যামিকে দেখছে। তুষারের বল বানিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে ওরা।

'ওই তো লরি,' ভাবল জো। 'একটা বল ছুঁড়ে দেব। তাহলেই দেখতে পাবে।'

বলটা নজরে পড়ল লরির। জো-র দিকে চাইল সে, হাসছে। পাল্টা হাসল জো, হাতের ঝাড়ুটা নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কি করছ বাড়িতে বসে? শরীর খারাপ নাকি?'

জানালাটা খুলে গেল এবার। 'ঠাণ্ডা লেগেছে, সপ্তাহখানেক হল বাড়িতে বসে রয়েছি।'

'একা?' প্রশ্ন করল জো।

'বন্ধু পাব কোথায়?'

'কেন আমরা বন্ধু নই?'

'অবশ্যই। ভেতরে আসবে?'

'মাকে জিজ্ঞেস করে নিই আগে,' বলল জো। বাড়িতে ঢুকে পড়ল সে, আপত্তি করলেন না মিসেস মার্চ। খানিক বাদে লরিদের বাসার বেল বেজে উঠল। এক কাজের মহিলা জোকে নিয়ে উঠে এল লরির ঘরে।

'চলে এলাম,' লাজুক হেসে বলল জো। 'তোমার জন্যে আচার পাঠিয়েছে মেগ। এহ্‌হে, ঘরটা এত নোংরা কেন?'

'কাজের লোকগুলো সব ফাঁকিবাজ। পরিষ্কার করে রাখে না।'

'দু'মিনিট, সব ঠিক করে দিচ্ছি,' বলল জো। কাজে লেগে পড়ল সে। কিছুক্ষণ পর সত্যিই অনেক সাজানো গোছানো দেখাল ঘরটিকে।

'চলবে?' প্রশ্ন করল জো।

'চলবে না আবার!' বলল লরি। 'অনেক ধন্যবাদ। তোমার জন্যেও তো আমার কিছু না কিছু করা উচিত।'

'কিছু করতে হবে না,' জবাব দিল জো। 'তোমাকে বই পড়ে শোনাই?'

'দরকার নেই। তারচেয়ে কথা বলতেই ইচ্ছে করছে।'

'আমি আবার একবার কথা শুরু করলে আর থামতে পারি না। অন্তত বেথ তাই বলে।'

'বেশিরভাগ সময় বাসায় থাকে যে ও-ই মেয়েটিই তো বেথ, তাই না?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল লরি।

'হুঁ।'

'কোঁকড়া চুলের মেয়েটা অ্যামি, ঠিক বলেছি না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে?'

লজ্জা পেল লরি।

'তোমরা তো বাগানে এলেই একজন আরেকজনের নাম ধরে ডাকাডাকি কর, চার বোনে মিলে কত মজা কর; তখন আর না দেখে উপায় আছে? আমি প্রায়ই দেখি তোমরা সবাই মায়ের সঙ্গে টেবিলে বসে রয়েছ। এত ভাল লাগে! আমার মা নেই, জানই তো।'

লরির কথাগুলো আহত করল জোকে। ওর দুঃখটা ভাগাভাগি করে নিতে চাইল সে।

'মাঝেমধ্যে আমাদের বাসায় চলে এলেই পার,' বলল জো। 'মা খুব খুশি হবেন। তোমার দাদাকে বললে আসতে দেবেন না?'

'তোমার মা বললে দেবেন,' বলল লরি। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখ, 'দাদু চান না আমি অচেনা লোকজনদের বিরক্ত করি।'

'আমরা তো অচেনা নই, প্রতিবেশী—আর বিরক্ত করার কথা আসছে কেন। আমরা তো মিশতেই চাই তোমার সঙ্গে। চাই তুমি বাসায় একা বসে না থেকে সবার সঙ্গে মেলামেশা কর।'

'দাদু নিজেও বেশি বাইরে যান না। সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকেন।'

'তোমাকে তো অন্তত মিশতে দিতে পারেন,' বলল জো।

'মানুষের সঙ্গে না মিশতে মিশতে লাজুক হয়ে পড়েছি। লোকজন দেখলেই পালিয়ে থাকি।'

'ওটা কিছু না,' বলল জো। 'মেলামেশা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'স্কুলে যেতে তোমার কেমন লাগে?' প্রসঙ্গ পাল্টাল লরি।

'স্কুলে যাই না তো। কাজ করি। আমার এক ফুফুকে দেখাশোনা করতে হয়—বড় বদমেজাজী মহিলা।'

মার্চ ফুফু, তাঁর ধুমসো কুকুর, তোতা এবং ও বাড়ির লাইব্রেরিটার কথা গড়গড় করে বলতে শুরু করল জো।

'একবার কি হল শোন না,' কথার খই ফুটতে শুরু করেছে এখন জো-র মুখে। 'এক বুড়ো ভদ্রলোক মার্চ ফুফুকে প্রেম নিবেদন করতে এলেন, তাঁর বাড়িতে। বেচারা ইনিয়ে বিনিয়ে বেশ খানিকটা বলেছেন, প্রায় পটিয়ে ফেলেছেন ফুফুকে; ঠিক সে সময় ফুফুর পোষা

তোতাটা কোত্থেকে যেন উড়ে এল। তারপর ভদ্রলোকের মাথা থেকে ঠুকরে তুলে নিল পরচুলাটা। বেচারা কোনমতে পালিয়ে বাঁচলেন, পরচুলা ফেলে। সেই যে হাওয়া হলেন আর ওমুখো হননি। ভাবো একবার।'

হাসতে হাসতে লরির পেট ফাটার জোগাড়। এরপর ওরা বইপত্র নিয়ে কথা বলতে লাগল। লরিরও বই পড়ার ব্যাপারে দারুণ আগ্রহ। জো শুনে অবাক হল লরি ওর চেয়েও বেশি বই পড়ে ফেলেছে।

'আমাদের লাইব্রেরিটা দেখবে চল,' বলল লরি। 'দাদু বাড়িতে নেই, ভয় পেয়ো না।'

'আমি ভয় পাই না,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জো।

'আমারও তাই ধারণা,' লরির কণ্ঠে প্রশংসা। গলে গেল জো।

বাড়িটা ওকে ঘুরিয়ে দেখাল লরি। তারপর নিয়ে এল লাইব্রেরিতে। বিশাল একখানা ঘর, বইয়ে ঠাসা। ছবি এবং মূর্তিও রয়েছে।

একখানা মখমলের গদিঅলা চেয়ারে দেবে গেল জো। 'লরি,' ডাকল সে। 'দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ তো তুমি।'

মাথা নাড়ল লরি।

'শুধু বই পড়ে কি জীবন চলে?'

ঠিক এসময় বেজে উঠল ডোরবেল, আঁতকে লাফিয়ে উঠল জো।

'বাপরে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তোমার দাদু!'

দুষ্টু হাসল লরি।

'কই?' মৃদু হেসে বলল সে, 'তোমার সাহস গেল কই?'

খুলে গেল দরজা, ঘরে ঢুকল কাজের মহিলা। ইশারায় লরিকে ডেকে বলল, 'ডাক্তার এসেছে।'

'আসছি,' বলল লরি। 'এক মিনিট, জো।'

'যাও।'

চলে গেল লরি। বইপত্র আর ছবিগুলো দেখতে লাগল জো। এ মুহূর্তে লরির দাদুর চমৎকার একটা পোরট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। দরজা খোলার শব্দ হল। ফিরে না চেয়েই জোরে বলে উঠল জো, 'এই বুড়োকে ভয় পাওয়ার কি আছে? কী মায়াময় ওঁর চোখ দুটো। চেহারাটা যদিও আমার দাদুর মত অত সুন্দর নয়, তবু এঁকে পছন্দ করা যায় নিঃসন্দেহে।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম,' পেছন থেকে গম্ভীরস্বরে বলে উঠল কে যেন।

চমকে ফিরে তাকাল জো। দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিস্টার লরেন্স।

কান গরম হয়ে গেল জো-র। ছুটে পালাতে পারলে যেন বাঁচে সে। কিন্তু উপায় নেই। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে লরির দাদু।

'তো আমাকে ভয় পাও না তুমি?' আগের চেয়েও গম্ভীর শোনাল এবার ভদ্রলোকের গলা।

'খুব একটা না, স্যার।'

'আর তোমার ধারণা আমি তোমার দাদুর মত সুন্দর নই?'

'জ্বী, স্যার।'

'তারপরও পছন্দ কর আমাকে?'

'করি, স্যার।'

এবার হেসে ফেললেন বুড়ো ভদ্রলোক। হাত মেলালেন ওর সঙ্গে। ওর চিবুকটা আঙুল দিয়ে তুলে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপর আঙুল সরিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'দাদুর সঙ্গে মনের মিল রয়েছে তোমার। যদিও তাঁর চেহারা পুরোপুরি পাওনি। চমৎকার লোক ছিলেন তোমার দাদু। বন্ধু ছিলাম আমরা। তা লরির সঙ্গে জুটলে কিভাবে?'

'ও খুব একা তো, তাই ভাবলাম–'

'ওকে সঙ্গ দেয়া দরকার।'

'ঠিক তাই, স্যার।'

'ওই যে বেল বাজল,' বললেন মিস্টার লরেন্স। 'আমাদের সঙ্গে আজ চা খাবে তুমি।'

তিনি দরজা খুলেছেন যেই অমনি ঘরে এসে ঢুকল লরি। দাদুকে দেখে চমকে গেল সে।

'আপনি কখন এলেন, দাদু?'

'সেটা তোর না জানলেও চলবে। চায়ের টেবিলে চল।'

মিস্টার লরেন্স ফিরলেন জো-র দিকে। বাড়িয়ে দিলেন হাত। লরিকে অবাক করে দিয়ে দু'জনে হাতে হাত রেখে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

জো-র খুশি ধরছে না। বাড়িতে গল্প করার মত বিরাট খোরাক পেয়েছে সে আজ।

পাঁচ

লরেন্সদের বাড়িতে অভিযান শেষে ফিরে এল জো। তার গল্প সাড়া ফেলে দিল সবার মধ্যে।

পাশের বাড়িটার প্রতি প্রবল আগ্রহ রয়েছে এদের সবার। কিন্তু এতদিন কৌতূহল মেটানর কোন সুযোগ খুঁজে পায়নি ওরা। জো-ই করে

দিল সে সুযোগ।

ও বাড়ির পিয়ানোটার কথা বোনদের বলেছে জো। বিশাল ড্রইংরুমটাতে রয়েছে জিনিসটা।

'চা খেয়ে,' বলল জো, 'লরিকে বললাম ওটা বাজাতে–চমৎকার বাজাল ও। কিন্তু কেন যেন মনে হল ও পিয়ানো বাজাক দাদু সেটা চান না। লরি যে ভাল বাজায় সেটাও স্বীকার করলেন না ভদ্রলোক। কেন, মা? তুমি জান কিছু?'

'ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি,' বললেন মা। 'ভদ্রলোকের ছেলে অর্থাৎ লরির বাবা এক ইতালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন মিউজিশিয়ান। খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন লরির দাদু। এরপর ছেলের মুখ আর দেখেননি। লরি খুব ছোট থাকতে মারা যান ওর বাবা-মা। তারপর দাদু ওকে নিয়ে আসেন নিজের কাছে। তাঁর মনে বোধহয় ভয় ঢুকে গেছে বেশি গান-বাজনা করতে দিলে লরি হয়ত বড় হয়ে মিউজিশিয়ান হতে চাইবে, সেটা চান না তিনি।'

'তাই বলে লরির ইচ্ছের কোন দাম নেই?' বলে উঠল জো।

ও-ব্যাপার নিয়ে আর কথা বাড়াল না কেউ।

দু'দিন পর মিস্টার লরেন্স এলেন জো-দের বাড়িতে। সবার সঙ্গে মন খুলে গল্প করলেন। বেথ ছাড়া অন্য তিনজনের ভয় অনেকখানি কেটে গেল ভদ্রলোক সম্পর্কে।

তিন বোন এখন প্রায় নিয়মিতই যায় ও বাড়িতে, কেবল বেথ এড়িয়ে যায়। ভদ্রলোককে ভয় পায় সে, ফলে পিয়ানোর লোভে পর্যন্ত ওমুখো হয় না। ব্যাপারটা নজর এড়াল না মিস্টার লরেন্সের। পিয়ানো সম্পর্কে বেথের আগ্রহের কথা এতদিনে জেনে গেছেন তিনি। একদিন তাই এলেন ওদের বাড়িতে। বেথকে শুনিয়ে মিসেস মার্চকে বলতে লাগলেন, 'আমাদের পিয়ানোটা খামোকা পড়ে রয়েছে। লরিরও আগ্রহ দেখি না বড় একটা। তাই বলছিলাম আপনার মেয়েরা চাইলে ওটা বাজাতে পারে, নইলে পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে জিনিসটা।'

এক পা আগে বাড়ল বেথ। উত্তেজনায় দম আটকে আসছে ওর। চোখের কোণে ব্যাপারটা লক্ষ করলেন মিস্টার লরেন্স। মৃদু হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, 'ওরা যখন-তখন আসতে পারে। অবশ্য ওদের যদি আগ্রহ না থাকে তবে বলার কিছু নেই।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চলে যাওয়ার ভঙ্গি করলেন। মনস্থির করে

ফেলল বেথ, কথা বলবে। হাত চেপে ধরল সে মিস্টার লরেন্সের। কৃতজ্ঞ চোখে চাইল ভদ্রলোকের দিকে।

'স্যার, ওদের ভীষণ আগ্রহ!'

'তুমি গানবাজনা কর নাকি?' রাজ্যের সরলতা মিস্টার লরেন্সের কণ্ঠে।

'করি, স্যার,' বলল বেথ। 'আমি বেথ। গান অসম্ভব ভালবাসি। কারও আপত্তি না থাকলে যাব আপনার বাড়িতে।'

আবেগে কাঁপতে লাগল সে।

'যখন ইচ্ছে আসবে। বাড়ি সারাদিন খালিই পড়ে থাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

লাজুক চোখে ভদ্রলোকের দিকে চাইল সে। ঝুঁকে ওর কপালে চুমু খেলেন মিস্টার লরেন্স। তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর আর কোন বাধা রইল না। বেথ এখন প্রতিদিনই যায় ও বাড়িতে। ওর জানা নেই পিয়ানো শোনার জন্যে মিস্টার লরেন্স প্রায়ই তাঁর ঘরের দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রাখেন। পিয়ানোর ওপর মাঝেমধ্যেই গানের বই পড়ে থাকতে দেখে সে। বইগুলো বিশেষভাবে তার জন্যেই কেনা এটাও তাকে বলে দেয়নি কেউ। নিজের মনেই মেতে রয়েছে আসলে বেথ। এতদিনে তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। অন্য কোনদিকে নজর দেয়ার সময় কোথায় তার?

সপ্তাহ দুয়েক পর বেথের মনে হল মিস্টার লরেন্সকে কিছু একটা উপহার দেয়া উচিত। প্রচুর খেটেখুটে একজোড়া চটী বানাল ও, পাঠিয়ে দিল মিস্টার লরেন্সের কাছে। এর বদলে চিঠি পাঠালেন ভদ্রলোক।

'প্রিয় ম্যাডাম,

জীবনে অনেক জুতো পরেছি আমি। কিন্তু এই জোড়াটির মত কোনটিই এত সুন্দরভাবে পায়ে লাগেনি। আমি তোমার কাছে ঋণী। 'বুড়ো ভদ্রলোক'টিকে ঋণশোধের সুযোগ দেবে আশা করি। তোমাকে একটি উপহার পাঠাতে চাই, আশা করি আপত্তি করবে না। জিনিসটি আমার মৃত নাতনীর। তোমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি–

জেমস লরেন্স।'

উপহারটি এল খানিক বাদেই, বিশেষ কিছু নয়–পিয়ানো!

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না বেথ। কাঁপা হাতে হাত বোলাতে লাগল পিয়ানোটার ওপর। ওর মা-বোনেরাও কম অবাক হয়নি।

'তোর উচিত এখুনি ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানানো,' হেসে বলল জো, 'যাবি না?'

'যাব, অবশ্যই যাব।'

তক্ষুণি ঘর থেকে বেরুল বেথ। বাগান পেরিয়ে চলে গেল পাশের বাড়িতে। বেল বাজাতেই খুলে গেল দরজা। ও সোজা চলে গেল মিস্টার লরেন্সের ঘরের দরজায়। নক করল।

'এস,' গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল ভেতর থেকে। মিস্টার লরেন্সের কাছে এগিয়ে গেল সে। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব–'

কথা শেষ করতে পারল না সে। মিস্টার লরেন্স মিটিমিটি হাসছেন। এবার দু'হাতে ভদ্রলোকের গলা জড়িয়ে ধরল ও, চুমু খেল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন মিস্টার লরেন্স, ছাদ ভেঙে পড়লেও বোধহয় এতখানি অবাক হতেন না তিনি। তাঁর সব গাম্ভীর্য দূর হয়ে গেল মুহূর্তে। বেথকে কোলে বসালেন। ছোট্ট নাতনীটিকে এতদিনে যেন ফিরে পেয়েছেন বুড়ো মানুষটি। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি।

ছয়

'আহারে, যদি কিছু পয়সা থাকত আমার!' এক সকালে দুঃখ করতে শোনা গেল অ্যামিকে।

'কেন রে?' নরম গলায় জানতে চাইল মেগ।

'পয়সা থাকলে ধার শোধ করতাম।'

'তোর আবার ধার কিসের?' অবাক হল মেগ।

'মেয়েরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে লাইম খায়,' বলল অ্যামি। 'আমার শোধ দিতে হবে না সেটা?'

হেসে ফেলল মেগ, 'ঠিক আছে, এটা দিয়ে শোধ করে দিস।' পার্স থেকে একটা কোয়ার্টার বার করে অ্যামিকে দিল সে।

'উফ্, মেগ, তুমি আমার জান, অনেকগুলো লাইম খেতে পারব। কাল স্কুলে যা জমবে না!'

কিন্তু মনের আশা পুরল না অ্যামির। ক্লাসের কয়েকজন দুষ্টু মেয়ে বদমেজাজী ক্লাস টিচার মিস্টার ডেভিসকে নালিশ করল, অ্যামি আজেবাজে

জিনিস খাচ্ছে। আর যায় কোথায়, মিস্টার ডেভিস কেড়ে নিলেন অ্যামির লাইমগুলো।

এতেই সন্তুষ্ট হলেন না তিনি। পরে ক্লাসে রুলার দিয়ে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন ওর হাতে। 'আমি না বলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে,' সবার সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন তিনি।

জীবনে এই প্রথম বারের মত শাস্তি পেল অ্যামি। প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করল সে। টিফিনের সময় বই-খাতা নিয়ে সোজা ফিরে এল বাসায়। মনে মনে শপথ করল আর কোনদিন যাবে না স্কুলে।

মিসেস মার্চ বাড়ি ফিরলে অ্যামি সব কথা বলল তাঁকে।

'ওই স্কুলে তোকে আর যেতে হবে না,' ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন মিসেস মার্চ।

ক'দিন পরের কথা, এক সন্ধ্যায় অ্যামি দেখল মেগ আর জো বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' প্রশ্ন করল সে।

'ছোট মানুষদের এত কৌতূহল থাকা ঠিক নয়,' দ্রুত জবাব দিল জো।

'লরির সঙ্গে বাইরে যাচ্ছ, ঠিক না?' গভীর সন্দেহ অ্যামির কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, তোর কৌতূহল মিটেছে?' খানিকটা বিরক্ত মনে হল জো-কে।

'জানি, তোমরা "সেভেন কাসলস" দেখতে যাচ্ছ। আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। নিজের পয়সাতেই টিকিট কাটব।'

'তোকে তো ডাকেনি। তুই গায়ে পড়ে যাবি নাকি?' ছোট বোনকে বোঝাতে চাইল মেগ।

ওর কথা কানেই তুলল না অ্যামি। জুতো পরতে শুরু করেছে তখন সে।

'শোন, আমাদের সিট তিনটে রিজার্ভ করা রয়েছে,' বলল জো। 'তুই গেলে তোকে একা বসতে হবে। লরি চাইবে না সেটা। নিজের সিটটা ও ছেড়ে দেবে তোকে। সেটা কি ভাল হবে?'

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল অ্যামি। এসময় নিচ থেকে শোনা গেল লরির চিৎকার। দ্রুত নেমে এল দু'বোন, অ্যামিকে ফেলে।

'আমিও দেখে নেব, জো মার্চ,' সিঁড়ির ওপর থেকে শাসাল অ্যামি।

'কি দেখবি রে? পুঁচকে ছুঁড়ি কোথাকার! বসে বসে সর্ষের ফুল দেখ,' বলল জো। দড়াম করে ওর মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজাটা।

"সেভেন কাসলস" দারুণ উপভোগ করল ওরা। তবে একটা ব্যাপার সর্বক্ষণ খোঁচাল জো-কে। অ্যামি দেখে নেবে বলেছে। ওর যা মেজাজ কি

যে করে বসবে কে জানে।

বাড়ি ফিরেই জো সোজা চলে গেল কাবার্ড পরীক্ষা করতে। এর আগের বার ঝগড়ার পরে অ্যামি ওর সমস্ত কাপড় ওখানে ঠেসে দিয়েছিল। কিন্তু কাবার্ড আজ খালি, কেউ ছোঁয়নি ওটা। জো নিশ্চিত হল এবারের মত মাফ পেয়ে গেছে সে।

পরদিন পড়ন্ত বিকেলে মেগ, বেথ আর অ্যামি আগুন ঘিরে বসে রয়েছে। এসময় হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল জো। 'আমার বই নিয়েছে কে?'

জো-র বইটি একটি রূপকথার বই। ছ'টা গল্প রয়েছে ওতে। জো-র নিজের লেখা। অসীম ধৈর্যে আর যত্নে গল্পগুলো লিখেছে সে।

'আমরা কি জানি?' জবাব দিল তিন বোন। কিন্তু অ্যামির মুখ লাল হয়ে গেছে, ব্যাপারটা নজর এড়াল না লেখিকার।

'অ্যামি, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস? শিগ্‌গির বল।'

'আমি লুকোতে যাব কেন?'

'মিথ্যে বলিস না,' বলল জো। কাঁধ ধরে ঝাঁকাল বোনকে।

'বললাম তো জানি না।'

'জানিস। ভাল চাইলে এক্ষুনি বল, নইলে–'

'তোমার পচা গল্পগুলো আর পাবে না।'

'কেন?'

'পুড়িয়ে ফেলেছি–তাই।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল জো-র মুখ।

'কি বললি?' কোনমতে প্রশ্ন করল সে। 'পুড়িয়ে ফেলেছিস! আমার এত সাধের বইটা নষ্ট করে দিলি? ভেবেছিলাম বাবা ফিরে আসার আগেই লেখা শেষ করব।' রাগে কাঁপতে লাগল সে। আচ্ছা করে মুচড়ে দিল ছোট বোনের কান।

মিসেস মার্চ বাসায় ফিরে সব শুনলেন। অ্যামিকে তক্ষুনি বললেন জো-র কাছে ক্ষমা চাইতে, মস্তবড় অন্যায় করেছে সে।

চায়ের সময় হলে অ্যামি গেল জো-র কাছে। নরম গলায় বলল, 'আমাকে মাফ করে দাও, জো। আমার ভুল হয়ে গেছে।'

'তুই কখনই মাফ পাবি না,' কঠোর গলায় বলল জো।

বিকেলটা যেনতেন ভাবে কাটল। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মা চুমু খেলেন জো-কে। ফিসফিস করে বললেন, 'অ্যামি কাজটা না বুঝে করেছে ছোট মানুষ তো, ওকে মাফ করে দিস।'

'ও যা করেছে তার মাফ নেই,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল জো।

পরদিনও জো-র মেজাজ খারাপ রইল। মার্চ ফুফুর বাসা থেকে ফিরে লরির সঙ্গে স্কেটিং করতে যাবে ঠিক করল সে। 'লরির সঙ্গে খানিকক্ষণ থাকলে,' ভাবল সে, 'মনটা ভাল হয়ে যাবে।'

কাজ থেকে ফিরে এল জো। তুলে নিল স্কেটজোড়া। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আওয়াজটা কানে গেছে অ্যামির। জানালা দিয়ে জো-র দিকে চেয়ে রইল সে।

'আমাকে ও স্কেটিং-এ নেবে বলেছিল, ক'দিন আগে,' বলল অ্যামি। 'কিন্তু এ অবস্থায় ওকে সে কথা বলব কিভাবে?'

'কিছু বলতে হবে না,' বলল মেগ। 'তুইও যা। ওদের পেছন পেছন থাকবি। তারপর জোকে একটু আড়ালে পেলেই চুমু দিয়ে দিবি। ও আর রাগ করে থাকতে পারবে না।'

চকচক করে উঠল অ্যামির চোখজোড়া।

'ঠিক বলেছ,' বলল সে। চুমু খেল মেগকে। তৈরি হওয়ার জন্যে ছুটল।

অ্যামি আসছে সেটা দেখে ফেলল জো। সে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। শুরু করল স্কেটিং। লরি অবশ্য দেখতে পায়নি অ্যামিকে। সে এগিয়ে গেছে খানিকটা, বরফ পরখ করে দেখার জন্যে।

জো শুনতে পেল স্কেট পায়ে গলানর জন্যে রীতিমত কসরত করছে অ্যামি। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না সে। নদীর উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে স্কেট করতে শুরু করল।

ওকে সাবধান করে দিয়ে চেঁচাল লরি, 'পার ঘেঁষে থাকবে, মাঝখানটা সুবিধের নয়।'

জো শুনলেও অ্যামি শুনতে পেল না লরির সতর্কবাণী। নদীর মাঝখানে, যেখানটাতে নরম বরফ রয়েছে তার ওপর দিয়ে স্কেট করতে শুরু করল সে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে তাকাল জো। দেখতে পেল নদীর পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে অ্যামি।

দ্রুত এগোতে চাইল জো। কিন্তু পা জোড়া যেন হারিয়ে বসেছে সমস্ত শক্তি। চিৎকার করে লরিকে ডাকতে চাইল সে। পারল না। গলা বুজে এসেছে।

হঠাৎ কে যেন প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে গেল তার পাশ দিয়ে। লরি। অ্যামিকে পানি থেকে উদ্ধার করল সে। অ্যামি তখন কাঁপছে, তাকে বাড়ি নিয়ে এল ওরা। অ্যামির গা থেকে ভেজা কাপড় খুলে নিয়ে ওকে ঢেকে দেয়া হল কম্বল দিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়ল অ্যামি। কিন্তু খচখচ করতে লাগল জো-র মনটা।

সব দোষ তার। তার জন্যেই ছোট বোনটা ডুবে মরতে বসেছিল। সে কেন ওকে সাবধান করল না?

'মা, লরি না থাকলে কি যে হত! অ্যামিকে আর বাঁচানো যেত না। আমার বদমেজাজের কারণেই এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে বসেছিল। আমিই দায়ী এর জন্যে,' শেষের দিকে ফোঁপাতে লাগল সে।

'কাঁদিস না,' বললেন মা। 'ও তো ভালই আছে। আর বদমেজাজ তোর একার নয়, বহু মানুষেরই আছে। ওটার রাশ টানতে চেষ্টা কর। গত চল্লিশ বছর ধরে সেই চেষ্টা করে চলেছি আমি।'

'মা, তুমি? তুমি বদমেজাজি?' বিস্মিত জো প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ রে,' বললেন মা, 'তবে কিছুতেই সেটা প্রকাশ হতে দিই না আমি।'

'ইস, মা, আমি যদি তোমার মত হতে পারতাম!'

'পারবি রে,' মৃদু হেসে বললেন মা। 'আমি জানি পারবি।'

মাকে জড়িয়ে ধরে এর জবাব দিল জো। তারপর উঠে এল ওপরতলার শোবার ঘরে। চারটে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে অ্যামি। গভীর ঘুমে মগ্ন।

ওর গালে আলতো করে চুমু খেল জো। ফিসফিসিয়ে বলল, 'অ্যামি রে, তোর কিছু হলে নিজেকে জীবনেও ক্ষমা করতে পারতাম না রে। আমাকে মাফ করে দিস, বোন।'

সামান্য খুলল অ্যামির চোখজোড়া। পিটপিট করে চাইল সে। মুখে মৃদু হাসি, বড় বোনের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল ও।

কোন কথা হল না দুবোনে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল দুজন দুজনকে। চুমুতে চুমুতে স্নাত হল দুবোনের মুখ। ধুয়ে মুছে গেল সব রাগ আর অভিমান।

সাত

এপ্রিলের একদিন।

মেগকে দেখা গেল ট্রাঙ্ক গোছাতে, বোনদের সাহায্য নিয়ে। বান্ধবী অ্যানি মোফাটের বাড়িতে বেড়াতে যাবে ও, সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে। ছুটিটা মিলে গেল হঠাৎই। বাচ্চারা গেছে মামার বাড়ি বেড়াতে। কাজেই আপাতত বেশ কয়েকদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

'আমি যদি যেতে পারতাম তোমার সঙ্গে,' আফসোস করল অ্যামি।

'সবাইকে নিয়ে যেতে পারলে তো কথাই ছিল না,' বলল মেগ, 'কিন্তু কি করব বল—'

মোফাটরা বিরাট বড়লোক। গার্ডিনারের পার্টিতে অ্যানি মোফাটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মেগের। তখনই ওকে দাওয়াত দিয়েছিল সে। মিসেস মার্চ অবশ্য ওকে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর ভয়, মোফাটদের বড়লোকি চাল দেখে মেয়ের না আবার মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু মেগ নাছোড়বান্দা। ফলে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

মেগ পরদিন চলে এল মোফাটদের বাড়িতে। সত্যিই এদের টাকার যেন শেষ নেই। বাড়িটা দেখে ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আর বাড়ির প্রত্যেকে দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত, একদম মেগের মনের মত। অবশ্য টাকার গর্ব নেই এদের। মিস্টার মোফাট হচ্ছেন মোটাসোটা হাসিখুশি ভদ্রলোক। মিসেস মোফাটের স্বাস্থ্য স্বামীর চেয়ে কম নয়। সর্বক্ষণ মুখে হাসি লেগে রয়েছে তাঁর। মেগকে চাপাচাপি শুরু করলেন ভদ্রমহিলা, তাঁকে নাম ধরে ডাকতে হবে।

যাহোক, স্যালী, অ্যানিদের সঙ্গে সময় কাটতে লাগল মেগের। ওরা আজ যায় কেনাকাটা করতে তো কাল যায় বেড়াতে। সুস্বাদু খাবার খেয়ে আর দামি ক্যারিজে চেপে ফুরফুর করে যেন উড়ে বেড়াল মেগ। এ কদিনেই সে বান্ধবীদের অনুকরণ করতে শুরু করেছে। অ্যানি মোফাটের গয়নাগাটি যতই দেখে ততই হিংসে হয় ওর, আর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ইস্, বড়লোকদের কি মজা। এসব দেখে দেখে নিজেদের ওপর রাগ হয়ে যায়। বৃথাই জীবন কাটাচ্ছে ওরা, কোন মানে হয় এভাবে বেঁচে থাকার?

কদিন পর। এক সন্ধ্যায় পার্টি দেয়া হল ও বাড়িতে। স্যালীরা তিন বোন তৈরি হতে লাগল বিকেলে। ওদের পোশাকের দিকে চেয়ে সমস্ত উৎসাহ উবে গেল মেগের। ওর পুরানো গাউনটা বড় বেমানান ঠেকবে এখানে। ওর গাউনটার দিকে আড়চোখে চাইল ওরা। লজ্জায় কান গরম হয়ে গেল মেগের। খচখচ করতে লাগল মন। ঠিক এসময় ঘরে ঢুকল কাজের মহিলা। হাতে বিশাল এক ফুলের তোড়া।

'মিস মার্চের জন্যে এসেছে,' তোড়াটা মেগের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল সে। 'চিঠিও আছে একটা।'

'কে পাঠাল?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বান্ধবীরা। 'তোমার প্রেমিক নাকি?' মেগকে ঘিরে ধরল ওরা।

'চিঠিটা পাঠিয়েছেন মা,' বলল মেগ। 'আর তোড়াটা লরি।' কথা কটা সহজ গলায় বলল সে। যদিও কৃতজ্ঞ বোধ করল মনে মনে। লরি ভোলেনি তাকে।

মন ভাল হয়ে গেল মেগের। গোটা কয়েক গোলাপ চুলে পরে নিল সে। বাকিগুলো দিয়ে ছোট ছোট আরও তিনটে তোড়া বানাল, উপহার দিল বান্ধবীদের। মোফাটদের ড্রইংরুমে যখন সে ঢুকল তখন আনন্দে ভরপুর হয়ে রয়েছে ওর মন।

জমে উঠল পার্টি। চমৎকার কাটছে সময়। অনেকেই জিজ্ঞেস করল মেগের কথা। জানতে চাইল মেয়েটি কে। কয়েকজন প্রশংসা করল ওর রূপের। এক পর্যায়ে আইসক্রীম খাওয়ার জন্যে কোণের দিকে চলে এল মেগ। এসময় কানে এল কথাবার্তা, ওঘর থেকে আসছে। স্পষ্ট শুনতে পেল সে–

'মেয়েটির বয়স কত হবে?'

'কত আর। ষোলো সতেরো। মেয়েটার মা কিন্তু খুব চালাক মহিলা,' কণ্ঠস্বরটা মিসেস মোফাটের।

'কি রকম?'

'মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়েছে মিস্টার লরেন্সের নাতির পিছে।'

'তাই নাকি?'

'তবে আর বলছি কি,' বললেন মিসেস মোফাট। 'চিঠি পাঠিয়েছে লরি, আর আমাদের বলে কিনা ওর মা পাঠিয়েছে। আমরা যেন কিছু বুঝি না।'

'ভাল পোশাকে মেয়েটিকে কিন্তু জবর মানাবে,' বলল প্রথম কণ্ঠস্বর। 'আগামী পার্টির জন্যে স্যালীর একটা পোশাক ওকে পরতে দিলেই পারেন।'

'বলে দেখব, রাজি নাও হতে পারে। অবশ্য ওর ড্রেসটার যা অবস্থা, আজই হয়ত ফেঁসে যাবে। কাজেই ও দিনের জন্যে নতুন কাপড় লাগবেই।'

'আচ্ছা, ওই লরেন্স ছেলেটাকেও দাওয়াত দিন না। দেখব ওরা দুজন কি করে।'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না মেগ। ওর সম্বন্ধে এত নীচু ধারণা এদের। ঘেন্নায় গা রি রি করে উঠল তার। চোখ ফেটে কান্না আসতে চাইছে। মন চাইছে এক ছুটে মায়ের কাছে চলে যেতে। কিন্তু মোফাটদের না বলে সে যায় কিভাবে?

পার্টির বাকি সময়টুকু কোনমতে কাটিয়ে দিল মেগ। পার্টি শেষ হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সোজা চলে গেল ঘরে। বিছানায় শুয়ে হালকা করল নিজেকে, কেঁদে।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে অ্যানি হঠাৎ বলে উঠল, 'মেগ, একটা সুখবর আছে। আমরা লরিকে দাওয়াত দিয়েছি। বৃহস্পতিবারের পার্টির জন্যে।'

'তোমরা খামোকাই কল্পনা করছ,' বলল মেগ। 'ওর বয়স মাত্র পনেরো। আর আগামী আগস্টে আমার সতেরো হবে।'

'তবে ও তোমাকে ফুল পাঠাল কেন?' সবার বড় বোন বেল প্রশ্ন করল।

'কারণ আমাদেরকে ও পছন্দ করে, তাই,' সহজ গলায় জবাব দিল মেগ। 'আমার মা আর বোনদেরকেও পাঠায়।'

'দূর!' হতাশ ভঙ্গিতে বলে উঠল স্যালী। 'সব মজাই মাটি হল।'

এসময় হেলতে দুলতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস মোফাট, পরনে সিল্কের পোশাক। 'শপিং-এ যাচ্ছি,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'তোমাদের জন্য কিছু আনতে হবে?'

'বৃহস্পতিবার গোলাপি সিল্কটা পরব। আমার কিছু লাগবে না,' বলল স্যালী। 'ওদিন তুমি কোন্‌টা পরবে, মেগ?'

'সাদাটাই পরব আবার,' জবাব দিল মেগ।

'বাড়ি থেকে অন্য কোনটা আনিয়ে নাও না,' পরামর্শ দিল স্যালী।

'ওটা ছাড়া যে আর কোন ড্রেস নেই আমার,' করুণ শোনাল মেগের গলা।

'আমার কোন একটা পরে নিও,' নরম গলায় বলল বেল। 'নীল রঙের খুব সুন্দর একটা ড্রেস আছে, সিল্কের। আমার গায়ে ছোট হয়ে গেছে। ওটা পরতে তোমার আপত্তি আছে?'

বেলের অনুরোধ ফেলতে পারল না মেগ। বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মেগকে সাজাল বেল। নীল ড্রেস পরেছে আজ মেগ। বেশ এঁটে বসেছে ওটা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ইয়ারিং, ব্রেসলেট, নেকলেস, ব্রুচ, হাই হিল জুতো সবই পরানো হয়েছে ওকে। তাছাড়া রুমাল, পাখা, রুজ, লিপস্টিক আর ফুল তো রয়েছেই।

'চল এবার,' বলল বেল। হাঁটা দিল সে। ওর পিছন পিছন এল মেগ। ইয়ারিংগুলো টুংটাং শব্দ করছে, হাওয়ায় ভাসছে চুল, শব্দ হচ্ছে ওর বুকের ভেতর। জীবনে এই প্রথমবার নিজেকে পার্টির উপযোগী মনে হল মেগের।

ড্রইংরুমে ঢুকল ওরা। সাড়া পড়ে গেল সবার মধ্যে। কয়েকজন তরুণী, যারা এর আগের দিন মেগকে পাত্তাও দেয়নি আজ তারা ছেঁকে ধরল ওকে। প্রশংসা করতে লাগল। তরুণদের কয়েকজন যেচে পরিচিত হল।

মেগ ছেলেগুলোর স্থূল রসিকতায় হেসে কুটিকুটি। হঠাৎ তার চোখ পড়ল উল্টোদিকে। ওর দিকে চেয়ে বসে রয়েছে লরি, চোখে বিস্ময়। হাসি মুছে গেল মেগের।

ওর দিকে চেয়ে হাসল লরি। লাল হয়ে গেল মেগ। লরির হাসি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে, নিজের ড্রেসটাই বেশি মানানসই ছিল ওর জন্যে।

দ্রুত ওর দিকে এগোল মেগ। হাত মেলাল।

'এসে ভাল করেছ,' রপ্ত করা ভদ্রতায় বলল সে।

'জো পাঠাল, তোমাকে কেমন লাগছে দেখে ওকে জানানর জন্যে। তাই এলাম আরকি।'

'কেমন দেখলে?' জানতে চাইল মেগ।

'ওকে বলব তোমাকে চিনতে পারিনি।'

'কেন?'

'এ কদিনে একেবারেই বদলে গেছ তুমি।'

'তাতে খারাপ দেখাচ্ছে?'

'না, তা নয়।'

'তবে?'

মেগকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লরি।

'তোমাকে এসবে মানাচ্ছে না।'

রাগে লাল হয়ে গেল মেগের মুখ। ঘুরে হাঁটা ধরল সে।

একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল ও। এক পরিচিত মাঝবয়সী ভদ্রলোক সে মুহূর্তে ওর কাছ দিয়ে হেঁটে গেলেন। মেগ শুনতে পেল ভদ্রলোক স্ত্রীকে বলছেন:

'মেয়েটাকে কিভাবে সাজিয়েছে দেখেছ? ওকে নিয়ে এরা আমোদ করছে। গরীব মানুষের মেয়ে, বেচারী বুঝতেও পারছে না।'

মরমে মরে গেল মেগ। মাথা ঠেকাল শার্সিতে। বোধবুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে ওর। কে যেন হাত রাখল ওর কাঁধে। ঘুরে দেখল মেগ লরি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কিছু মনে কোরো না, মেগ, নাচবে এস।'

মৃদু হাসল মেগ, লরির একটা হাত ধরল। 'এদের পোশাক পরা আমার উচিত হয়নি। প্লীজ, মাকে কিছু বলবে না, বোনদেরকেও না। শুধু বলবে আমি ভাল আছি, ফুর্তি করছি।'

'বলব।'

শনিবার বাড়ি ফিরে এল মেগ। সারাজীবন রোমন্থন করার মত খোরাক

নিয়ে এসেছে।

মা-বোনদেরকে জড়িয়ে ধরল সে, চুমু খেল। 'কি যে ভাল লাগছে! আমরা গরীব হলেও সুখী। বড়লোকদের এত সুখ নেই, মা।'

মেগ তার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলল বাড়ির সবাইকে। কিন্তু ওর মা বুঝতে পারলেন কিছু একটা লুকোতে চাইছে সে। বেথ আর অ্যামি ঘুমোতে গেলে মায়ের কাছে এল মেগ। মায়ের হাঁটুতে কনুই রেখে আদুরে গলায় বলল, 'মা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'জানি,' বললেন মা, 'কি ব্যাপার বল তো?'

'আমি চলে যাব?' জানতে চাইল জো।

'আরে না। তোকে তো আমি সবই বলি। মোফাটদের বাসায় কি কি করলাম না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'বলে ফেল,' বললেন মিসেস মার্চ। খানিকটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে, তবে মৃদু হাসছেন।

'ওরা আমাকে খুব করে সাজিয়েছিল, উগ্র মহিলারা যেভাবে সাজে ঠিক তেমনিভাবে।'

'ব্যস?' প্রশ্ন করল জো।

'না, আরও আছে,' বলল মেগ। 'শ্যাম্পেন খেয়েছি আমি।'

ওর দিকে চমকে তাকালেন মিসেস মার্চ, 'আরও কিছু বলার আছে নিশ্চয়ই?'

'আছে,' জবাব দিল মেগ। 'ওরা লরি আর আমাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা মশকরা করেছে। বলেছে তুমি নাকি লরির সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করছ।'

'জঘন্য!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জো।

'ভুলটা আমারই,' ধীরে ধীরে বললেন মিসেস মার্চ। 'অচেনা লোকের বাসায় তোকে পাঠানো মোটেই উচিত হয়নি।'

'মা, সত্যিই কি তোমার ওরকম কোন পরিকল্পনা আছে?' কাতর কণ্ঠে জানতে চাইল মেগ।

'আছে,' বললেন মিসেস মার্চ। 'অনেক পরিকল্পনাই আছে। তবে সেগুলো মিসেস মোফাটের সঙ্গে মিলবে না। আমি চাই আমার মেয়েরা যোগ্যতা অর্জন করুক, মানুষের মত মানুষ হোক। ভাল ঘর, ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিতে চাই তোদের। কোন ভালমানুষের ভালবাসা পাওয়াই একটা মেয়ের জীবনে সবচেয়ে সুখের ঘটনা। আমি তো চাই-ই তোদের জীবনে এই অসাধারণ ঘটনাটা ঘটুক। অপেক্ষা কর, মেগ, নিজেকে তৈরি

করতে থাক, বিয়ের পর সুখী হতে হলে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

'আমি চাই তোদের ভাল বিয়ে হোক, সব মা-ই তাই চান। তবে তার মানে এই নয় যে বিরাট বড়লোকের সঙ্গে তোদের বিয়ে হতে হবে। ভালবাসা যদি না-ই পেলি তবে আর টাকা দিয়ে করবিটা কি? আর একটা কথা মনে রাখিস, আমি তোদের বন্ধু। চিরজীবনের বন্ধু। সবসময় পাশে পাবি আমাকে। জীবনে তোদেরকে বড় হতে হবে, তোদের ওপর আমার অনেক আশা রে–' শেষ দিকে ধরে এল মায়ের কণ্ঠ।

মাকে জড়িয়ে ধরল দুবোন।

আট

বসন্ত এল, দিন এখন লম্বা। নানা ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়ল মেয়েরা। বাগানটাকে চার ভাগে ভাগ করল, প্রত্যেকে নিজের ভাগে ইচ্ছেমত চাষ করতে লাগল। বাগান করে, নদীতে নৌকাবাইচ করে কাটতে লাগল ওদের সময়।

মেগ আর জো তিনমাসের জন্যে ছুটি পেয়েছে। ওদের খুশি ধরছে না। অ্যামির তো আরও মজা, নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছে সে। এখন অনেক দিন স্কুলে যেতে হবে না।

বৃষ্টির দিনগুলোতে বেরোতে পারে না ওরা। ঘরে বসে থাকতে হয়। সেদিনগুলোতে চিলেকোঠায় জমায়েত হয় চার বোনে। ওরা আবার একটা গোপন সংস্থার সদস্য! ওদের সংস্থার নাম "পিকউইক ক্লাব"। এ সংস্থার একটা সাপ্তাহিক মুখপত্রও রয়েছে। সদস্যদের মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয় তাতে। বলাই বাহুল্য ওটার সম্পাদক হচ্ছে জো। প্রতি শনিবার ব্যাজ লাগিয়ে টেবিল ঘিরে বসে ওরা, মীটিঙে।

এমনি এক শনিবারে স্থির হল লরিকে এ সংস্থার সদস্য করে নেয়া হবে। ভোটাভুটি হল। প্রত্যেকেই লরির অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছাল।

যাহোক, লরিকে জানান হল ব্যাপারটা। সানন্দে রাজি হল সে। বলল, 'এই অমর ক্লাবের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করব আমি।'

রসিকতার আর বাচনভঙ্গির গুণে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল লরি, ক্লাবের সদস্যদের মাঝে। তাছাড়া একটি প্রস্তাবের কারণেও লরি বিশেষ প্রভাবশালী

হয়ে উঠল। সে প্রস্তাব করল বাগানের এক কোণে ছোট্ট একটি পোস্ট অফিস বসাতে। এর ফলে চিঠি, বই-পত্র, পাণ্ডুলিপি এগুলো খুব সহজেই সদস্যদের মধ্যে চালাচালি করা যাবে। প্রস্তাবটা মনে ধরল সকলের।

স্থাপন করা হল পোস্ট অফিস। ক্লাবের চাবি রইল ওটার ভেতর। যাতে যে-কোন সদস্য যে-কোন সময় ক্লাবে ঢুকতে পারে।

পোস্ট অফিস দারুণভাবে সাহায্য করতে লাগল ওদের। সব ধরনের জিনিস চালান করা যায় ওটার মাধ্যমে। টাই, গ্লাভস, কবিতা, আচার, আগাছা, চিঠি, হ্যাট, দাওয়াতপত্র এমনকি এক জোড়া কুকুর ছানা পর্যন্ত পোস্ট অফিসের কল্যাণে হাতবদল হল। লরির দাদু খুব মজা পেলেন ওদের কাণ্ডকারখানায়। পিছিয়ে রইলেন না তিনিও। যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে। মাঝেমধ্যেই রহস্যময় চিরকুট পাঠাতে লাগলেন তিনি। লরিদের মালী ইতোমধ্যে হান্নার প্রেমে পড়ে গেছে। ওকে প্রেমপত্র পাঠাল সে, পোস্ট অফিসের মাধ্যমে। কিন্তু বেচারার কপাল খারাপ। চিঠিটা পড়ল জো-র হাতে। সবাইকে ওটা জোরে জোরে পড়ে শোনাল সে। সাতটা বানান ভুল রয়েছে আট লাইনের চিঠিতে। সদস্যরা চেপে ধরল হান্নাকে। বেচারি তো লজ্জায় লাল-টাল হয়ে কোনমতে পালিয়ে বাঁচল। তখনও ওরা জানত না ভবিষ্যতে আরও কত প্রেমপত্র লোকে পোস্ট করবে ওটাতে।

বেথের প্রতিদিনকার কাজ হচ্ছে লেটার বক্স খুলে সবার চিঠি বেঁটে দেয়া। জুলাইয়ের এক বিকেলে সে এক গাদা চিঠি আর পার্সেল নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'মিস মেগ মার্চ, তোমার জন্যে চিঠি এবং গ্লাভ আছে,' জিনিস দুটো মেগের হাতে দিল বেথ।

'চিঠির জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু গ্লাভ একটা কেন? দুটোই তো থাকার কথা।'

'চিঠি পাঠিয়েছে কে?' প্রশ্ন করল জো।

'লরিকে বলেছিলাম একটা জার্মান গান ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে। কিন্তু হাতের লেখাটা ওর মনে হচ্ছে না। বোধহয় ওর স্যার মিস্টার ব্রুক করে দিয়েছেন কাজটা।'

'জো-র জন্যে এসেছে একটা চিঠি, বই আর পুরানো একটা হ্যাট। হ্যাটটা লেটার বক্সের বাইরে লাগানো ছিল,' বলল বেথ।

'লরির কাণ্ড! কদিন আগে বলেছিলাম একটা বড় হ্যাট হলে ভাল হত, রোদ থেকে মুখ বাঁচানর জন্যে। ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি বাবা ফ্যাশনের ধার ধারি না। ওটাই পরব।'

জোকে চিঠি লিখেছে লরি।

'প্রিয় জো, হো হো!

আগামীকাল কজন ইংরেজ ছেলেমেয়ে আমার বাড়িতে বেড়াতে আসছে। লংমিডোতে সবাই মিলে পিকনিক করতে গেলে কেমন হয়? ব্রুক আর কেট ফন যাবে সঙ্গে, আমাদের দেখে রাখার জন্যে। তোমরা সবাই আসছ। খরচের কথা ভাববে না।

ইতি

লরি।'

'মা, আমরা যাব না?' চিৎকার করে উঠল জো।

'নিশ্চয়ই যাবি।'

'কিন্তু কি পরে যাব?' প্রশ্নটা মেগের। 'আমার ফ্রকটা ধোয়া রয়েছে, চিন্তা নেই। তুই কোন্‌টা পরবি রে?'

'বোটিং সুট পরে নেব,' সহজ গলায় জবাব দিল জো।

'যারা আসছে তাদের চেন?' জানতে চাইল বেথ। 'ডাঁটিয়াল নয় তো?'

'আরে না,' বলল জো। 'লরি তো ওদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেট মেগের চেয়ে বড় হবে খানিকটা। ফ্রেড আর ফ্র্যাঙ্ক যমজ। ওরা আমার বয়সী। সবচেয়ে ছোটটার নাম গ্রেস। ন-দশ বছর বয়স। কাজেই তোর ভাবনার কিছু নেই।'

'আমি যেতে পারি। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে কথা বলাতে পারবে না বলে দিচ্ছি,' বলল বেথ।

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। এখন লরিকে একটা চিঠি লিখে দিই, আমরা আসছি।'

পরদিন ভোরে উঠে পড়ল মেয়েরা। পোশাক পরে সবার আগে তৈরি হয়ে নিল বেথ। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল লরিদের বাসায় কি হচ্ছে। ধারাবিবরণী দিল সে বোনদের জন্যে। টগবগ করে ফুটতে লাগল ওরা।

'লরি নাবিকের পোশাক পরেছে। ওই যে একটা ক্যারিজ আসছে, লোকে ভর্তি। লম্বামত এক মহিলা, ছোট একটা মেয়ে আর দুটো ছেলে রয়েছে ওটায়। নেড আর স্যালী মোফাটও এসে গেছে, মেগ।'

'আমি তৈরি,' বলল মেগ। চুলটা দেখে নিল একবার। 'জো, এই কুৎসিত হ্যাট পরে পিকনিকে যাবি নাকি তুই?'

'এটাই তো পরব–সবাইকে হাসাতে হবে না?'

কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গটমটিয়ে বেরিয়ে গেল জো।

অন্যরা পিছু নিল তার। সকলের মুখে মৃদু হাসি।

ওদের দিকে ছুটে এল লরি। অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে।

তাঁবু, খাবার আর ক্রোকে খেলার সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আগেই। দুটো নৌকায় চড়ে বসল সকলে। যাত্রা শুরু হল। তীরে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় জানালেন মিস্টার লরেন্স, হ্যাট নেড়ে। লরি আর জো বাইল একটা নৌকা, অন্যটার দায়িত্ব নিল ব্রুক আর নেড। মেগ রইল এ নৌকাটাতেই, মাঝিদের ঠিক মুখোমুখি বসে। ব্রুক গম্ভীর মুখের সুদর্শন এক যুবক। বাদামি চোখজোড়ায় অদ্ভুত মায়া, আর তার কণ্ঠস্বরটাও চমৎকার। ওকে পছন্দ হয়ে গেল মেগের, যদিও দুজনে কথা হয়নি বড় একটা। ব্রুকের চোখ দেখে বুঝতে পারল মেগ, ওকে পছন্দ করেছে লোকটি। স্যালী গার্ডিনার ধবধবে পোশাকটা পরিষ্কার রাখতেই ব্যস্ত রইল সর্বক্ষণ। আর চশমার ভেতর থেকে প্রত্যেককে জরিপ করে নিল কেট ফন।

লংমিডো কাছেই। ওরা পৌঁছনর আগেই তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে।

'ক্যাম্প লরেন্স-এ সবাইকে স্বাগতম,' চেঁচিয়ে বলল লরি। লাফিয়ে নামল তীরে।

তীরে ভিড়ল নৌকা দুটো। মেয়েরা নেমে এল, তক্ষুনি ক্রোকে খেলার আয়োজন করা হল। সবাই খুব উপভোগ করল খেলাটা। ব্রুক ঘড়ি দেখা অবধি খেলা চলল।

'খাওয়ার সময় হল,' বলল ব্রুক। 'এস সবাই। ভাল কফি কে বানাতে পার হাত তোল।'

'জো পারে,' বলল মেগ। বোনের কথা সুপারিশ করতে পেরে গর্ব বোধ করল ও।

জো তক্ষুনি লেগে গেল কাজে। খড়ি কুড়িয়ে আনল বাচ্চারা। ছেলেরা আগুন জ্বালল, ঝরনার পানি নিয়ে এল। কেবল মিস কেট বসে রইল একা, কুটোটি নাড়ল না। একমনে স্কেচ করে চলেছে সে।

টেবিল ক্লথ পেতে খাবার সাজানো হল। ততক্ষণে জো-র কফি তৈরির কাজও শেষ। সবাই বসে পড়ল খেতে।

তৃপ্তির সঙ্গে খেল প্রত্যেকে। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে বেশ কয়েকটা কাপ আর প্লেট ভাঙল, তবে ও নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। অনাহূত কালো পিঁপড়েরা ওদের খাবারে ভাগ বসাতে এল।

লরি এক পিরিচ বেরি এগিয়ে দিল জো-র দিকে। তারপর খেতে লাগল দুজনে।

মিস কেট, মেগ আর ব্রুক খাওয়া শেষে গল্প করতে লাগল। খানিক বাদে কেট আবার তার স্কেচ নিয়ে বসল। ওকে লক্ষ করতে লাগল মেগ। ওদিকে ব্রুক শুয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর, বই নিয়ে। যদিও পড়ছে না ওটা।

'তুমি কি সুন্দর আঁকো! ইস্, আমি যদি পারতাম!' কেটকে বলল মেগ।

'শিখলেই পার,' জবাব দিল কেট।

'কে শেখাবে বল,' বলল মেগ।

'তোমার গভর্নেসকে বললেই ব্যবস্থা করে দেবে।'

'আমার যে গভর্নেস নেই।'

'তাহলে স্কুলে শিখবে।'

'স্কুলে যাই না। আমি নিজেই তো গভর্নেস।'

বিস্মিত দেখাল কেটকে। 'তাই নাকি!' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

মেগের মনে হল এত কথা কেটকে না বললেও চলত। নিজের ওপরেই রাগ হল তার।

ওদের দিকে চাইল ব্রুক। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে বলল, 'আমেরিকার মেয়েরা স্বাধীনচেতা। কম বয়সেই রোজগার করতে শেখে।'

'তাই নাকি!' কেট বলল আবার। ওর বলার ঢং-এ আহত হল মেগ।

খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা। এবার মেগের দিকে চেয়ে হাসল ব্রুক।

'জার্মান গানটা কেমন লাগল?' জানতে চাইল সে।

'দারুণ! যে-ই করুক না কেন অনুবাদটা চমৎকার হয়েছে,' বলল মেগ। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা।

'জার্মান ভাষা পার না?' অবাক মনে হল মিস কেটকে।

'খুব একটা না। বাবা শেখাতেন, তিনি তো এখন বাইরে রয়েছেন। কাজেই আর এগোয়নি।'

'এখন শেখ,' মৃদু হেসে বলল ব্রুক, 'আমি আবার শেখাতে বড় ভালবাসি।'

মেগের কোলের ওপর বইটা রাখল সে। ওটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল মেগ, দরদ দিয়ে। লক্ষই করল না বাদামি চোখজোড়া একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'অসাধারণ!' মুগ্ধকণ্ঠে বলল ব্রুক। এড়িয়ে গেল মেগের ভুলত্রুটিগুলো, পুরোপুরি।

চশমা পরে নিয়ে ওদের দুজনকে একবার দেখল কেট। তারপর স্কেচের বইটা বন্ধ করে বলল, 'যাই দেখি আমার বোন কি করছে।' তারপর যোগ করল, 'অবশ্য দেখাশোনার কাজটা গভর্নেসের, আমার নয়।'

হনহনিয়ে হেঁটে চলে গেল সে।

'ইংরেজরা বোধহয় গভর্নেসদের দুচোখে দেখতে পারে না,' শান্তস্বরে বলল মেগ।

'কর্মজীবীদের জন্যে আসলে আমেরিকাই সেরা,' ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ব্রুক।

'ভাগ্যিস জন্মেছিলাম এদেশে,' বলল মেগ। 'নইলে যে কি হত! গভর্নেসের কাজটা অবশ্য আমার নিজেরও পছন্দ নয়। তারচেয়ে যদি আপনার মত টিচিং করতে পারতাম!'

'লরির মত ছাত্র পেলে কাজটা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য,' বলল ব্রুক। 'তবে আগামী বছর ও কলেজে চলে যাচ্ছে।'

'তখন কি করবেন?'

'সেনাবাহিনীতে যাব।'

'সত্যি?' প্রায় চিৎকার করে উঠল মেগ, 'সব ছেলেরই যুদ্ধে যাওয়া উচিত। অবশ্য মা-বোনদের তাতে কষ্ট হয় খুব,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল সে।

'আমার কেউই নেই,' করুণ শোনাল ব্রুকের গলা, 'কেবল দু-চারজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া।'

'লরি আর ওর দাদা রয়েছেন, আমরা রয়েছি। নিজেকে এত একা ভাবছেন কেন?'

হেসে ফেলল ব্রুক, কেটে গেল বিষণ্নতা।

ফ্র্যাঙ্ক একাকী বসে রয়েছে এক কোণে। ব্যাপারটা লক্ষ করল বেথ। খোঁড়া ছেলেটির চোখ দেখে তার মনে হল অনেক দুঃখ ওর, অন্যদের সঙ্গে খেলায় অংশ নিতে পারলে খুশি হত ও। ফ্র্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে এল সে।

'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' বলল বেথ।

ওর দিকে চাইল ফ্র্যাঙ্ক। হাসল। 'বস, গল্প করি।'

বসে পড়ল বেথ। কি দিয়ে শুরু করবে বুঝে না পেয়ে বলে বসল, 'তোমাদের দেশের হরিণ আমাদের মোষের চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর।'

'তা ঠিক,' খুশি হয়ে উঠল ফ্র্যাঙ্ক। খানিকক্ষণের মধ্যেই জমে উঠল গল্প, মেতে গেল দুজনে।

গোধূলি লগ্নে তাঁবু গোটাল ওরা। জিনিসপত্র নিয়ে চেপে বসল নৌকা দুটোয়। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ফিরে চলল।

লরিদের লনে এসে জমায়েত হল ওরা। সবার কাছ থেকে বিদায় নিল চার বোন। বাগান পেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল। ওদের দিকে চেয়ে কেট

বলল, 'বান্ধবী হিসেবে আমেরিকান মেয়েরা সত্যিই চমৎকার।'

কেট মন থেকে কথাগুলো বলেছে কিনা বুঝতে পারল না ব্রুক। তবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ তুমি।'

মন থেকেই কথাগুলো বলল সে।

নয়

বছর ঘুরে আবার অক্টোবর এল। বাতাসে শীতের পরশ, কমে এল দিনের আয়ু।

জো-র সময় কাটতে লাগল চিলেকোঠায়। জানালা দিয়ে রোদ ঢোকে এ ঘরে। ফলে পুরানো সোফাটায় বসে জো রোদ পোহায় আর সাহিত্য সাধনা করে। কাগজগুলো ছড়িয়ে রাখে সামনের ট্রাঙ্কটার ওপর। বেশ ক'দিন খেটেখুটে একটা পাণ্ডুলিপি দাঁড় করিয়ে ফেলল সে। শেষ পৃষ্ঠাটা লেখার পর ওতে নাম সই করল। তারপর ছুঁড়ে দিল কলমটা।

সোফায় শুয়ে পড়ল ও। মন দিয়ে লেখাটা আগাগোড়া পড়ল। তারপর লাল রঙের সুন্দর একটা রিবন দিয়ে বাঁধল পাণ্ডুলিপিটা। ওটার দিকে মিনিটখানেক একদৃষ্টে চেয়ে রইল, চিন্তামগ্ন। একটা টিনের বাক্সকে ডেস্ক বানিয়েছে জো। কাগজ আর কিছু বই রেখেছে ওটার ভেতর। আরেকটা পাণ্ডুলিপি বার করল সে, বাক্সটা থেকে। চুপিসারে নেমে এল নিচে।

সাবধানে হ্যাট আর জ্যাকেট পরে নিল ও, যাতে শব্দ না হয়। তারপর পেছন দিকের জানালাটা গলে বেরিয়ে এল বাইরে। ঘুরপথে রওনা দিল শহরের দিকে।

শহরে ওর চালচলন লক্ষ করলে যে কেউ ভাববে ওর নিশ্চয়ই কোন বদমতলব আছে। চোরের মত চাহনি ওর। দ্রুত হাঁটছে। বিশেষ একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, মিনিটখানেকের জন্যে। আবার পা চালিয়ে ফিরে গেল দ্রুত।

বার কয়েক এ কাজটা করল সে। বুঝতে পারল না ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছে আরেকজন। তৃতীয় বারের মত ফিরল জো। হ্যাটটা টেনে দিল চোখের ওপর, পৌঁছে গেল দরজার কাছে। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

দরজায় অন্যান্যের সঙ্গে ডেন্টিস্টের চিহ্নও রয়েছে। উল্টোদিকের

ছেলেটি ওটার দিকে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত। কোটটা গায়ে চড়িয়ে চলে এল দরজাটার কাছে।

মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে এল জো, মুখটা উত্তেজনায় লাল। দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা গেছে ওর ওপর দিয়ে। ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ও। নড করল।

'খুব কষ্ট হয়েছে?' প্রশ্ন করল ছেলেটি।

'খুব একটা না।'

'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলে দেখছি।'

'ঈশ্বরের দয়ায়।'

'একা আসতে গেলে কেন?'

'কাউকে জানাতে চাইনি।'

'আশ্চর্য! কটা ওঠালে?'

অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে চাইল জো। ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে। হঠাৎই যেন বুদ্ধি খুলে গেল তার, হো হো করে হাসতে লাগল।

'দুটো ওঠাতে চাই। তবে সেজন্যে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

আবার হাসিতে ফেটে পড়ল জো।

'হাসছ কেন?' জানতে চাইল লরি। এবার ওর অবাক হওয়ার পালা। 'কি ব্যাপার খুলে বল তো।'

'আগে বল তুমি এখানে কি করছ?'

'জিমনাশিয়ামে এসেছি, জানই তো ফেন্সিং শিখি।'

'ভাল,' বলল জো। 'কিন্তু আমার তো মনে হল বিলিয়ার্ড স্যালুনে এসেছ। একবার যদি ওটার ফাঁদে পড়ে যাও তবে কিন্তু আর ছুটতে পারবে না।'

'তুমি আমার জন্যে ভাব, তাই না, জো?'

'ভাবিই তো,' বলল জো। 'বিলিয়ার্ডের নেশায় পড়লে টাকা আর সময় কোথা দিয়ে উড়ে যায়, কোন খবর থাকে না। আমি চাই না তুমি ওসবে জড়াও।'

মিনিট দুয়েক জো-র পাশাপাশি নিশ্চুপ হেঁটে চলল লরি। ওর দিকে একবার চাইল জো। লরির দুচোখে রাগ, তবে মুখে মৃদু হাসি।

'সারাটা রাস্তাই উপদেশ দেবে নাকি?'

'না। কিন্তু দিলে ক্ষতি আছে?'

'আছে, আমি বাস ধরে ফিরে যাব। আর যদি মুখ বন্ধ রাখতে পার তবে মজার একটা ঘটনা শোনাব।'

'কি ঘটনা?' উৎসাহিত হয়ে উঠল জো।

'পরে বলব—আগে তুমি বল এখন কোথায় গিয়েছিলে?'

'আমি কোথাও—' এটুকু বলেই থেমে গেল জো, মিথ্যে বলে পার পাওয়া যাবে না।

'আমারটা জানতে চাইলে জলদি বলে ফেল।'

'তোমারটা শুনে মজা পাব তো?' প্রশ্ন করল জো।

'পাবে না আবার! তোমার চেনা মানুষদের নিয়েই ঘটনা। কাজেই বুঝতেই পারছ—এখন বলে ফেল তো, চাঁদ।'

'কাউকে বলে দেবে না তো?'

'আমাকে বিশ্বাস কর না?'

'করি তো। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পারবে না কিন্তু।'

'আমি ঠাট্টা করি না।'

'কর বলেই বলছি। মানুষের পেট থেকে সব বার করে নাও তুমি, তারপর খোঁচাও।'

'আচ্ছা যাও, খোঁচাব না। বলে ফেল।'

'বলছি। কাগজে দুটো গল্প দিয়েছি। ছাপা হবে কিনা জানতে পারব আগামী সপ্তাহে,' ফিসফিস করে বলল জো।

'সত্যি! আমেরিকার বিখ্যাত লেখিকা মিস মার্চকে অভিনন্দন,' চেঁচিয়ে উঠল লরি। হ্যাটটা ছুঁড়ে দিল আকাশে, লুফে নিল আবার।

'থাম থাম,' অপ্রস্তুত হয়ে গেল জো। 'কাউকে জানাইনি। আগে থেকে বলে কি লাভ? পরে যদি ছাপা না হয়?'

'প্রত্যেকদিন যেসব গল্প ছাপা হচ্ছে সেগুলোর বেশিরভাগই তোমারগুলোর চেয়ে অনেক নিচু মানের,' উষ্ণ গলায় বলল লরি। 'ছাপার অক্ষরে গল্পগুলো দেখতে কি ভালই না লাগবে। ইস্, তোমার জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে, জো।'

চকচক করে উঠল জোর চোখজোড়া, বন্ধুর প্রশংসা সব সময়ই মধুর, উৎসাহ-দায়ক।

'এবার তোমারটা বল,' বলল জো। 'সব বলতে হবে কিন্তু। কিছু গোপন রাখতে পারবে না।'

হাসল লরি।

'মেগের গ্লাভটা কোথায় আছে জানি আমি—যেটা ও গত মাসে

হারিয়েছে, আমাদের বাসায় এসে।'

হতাশ দেখাল জোকে।

'এই তোমার মজার ঘটনা?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখনও তো বলিনি কোথায় আছে ওটা,' চোখ নাচিয়ে বলল লরি।

'বল, বল।'

'ওটা রয়েছে ব্রুকের পকেটে।'

থেমে দাঁড়াল জো। চেয়ে রইল লরির দিকে। চোখে একই সঙ্গে বিস্ময় আর হতাশা। তারপর হাঁটতে লাগল আবার। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'দেখেছি। দারুণ রোমান্টিক না?'

'না,' বলল জো, 'জঘন্য।'

'কেন?'

'ও গ্লাভ ফেরত দিচ্ছে না কেন? ঘটনাটা জেনে ভাল লাগছে না আমার।'

'ভাবলাম তুমি মজা পাবে, তাই বললাম।'

'মেগ আমাদের পর হয়ে যাবে, সেজন্যে মজা পাব? উঁহুঁ।'

'বিয়ে তো তোমারও হবে, তখন?'

'বিয়ে? আমার? কার এতবড় সাহস যে আমাকে বিয়ে করতে আসবে?' ক্রুদ্ধ শোনাল জো-র গলা।

'বাবারে, ভয় লাগছে,' হেসে ফেলল লরি। 'চল, এক কাজ করি। দৌড়ে নেমে যাই পাহাড়টা থেকে, তাতে তোমার মেজাজ হয়ত খানিকটা ঠাণ্ডা হবে।'

আশেপাশে কেউ নেই। হ্যাট, চিরুনি আর চুলের কাঁটা ফেলে দিয়ে ছুটল জো। তবে নিচে আগে পৌঁছল লরি। তারপর ঘুরে দেখল হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে আসছে জো।

'আমার জিনিসগুলো নিয়ে এস তো, চাঁদু,' লরির কাছে পৌঁছে বলল জো।

একটা ম্যাপল গাছের নিচে বসে পড়ল ও।

লরি গেল জো-র জিনিসগুলো কুড়িয়ে আনতে। সে সুযোগে বেণী করে নিল জো। আশা করল ও তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এপথ মাড়াবে না কেউ। কিন্তু মাড়াল ঠিকই-মেগ।

'এখানে বসে করছিসটা কি?' অবাক গলায় জানতে চাইল সে। সেরা পোশাকটা পরে বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই গিয়েছিল কোথাও।

‘পাতা কুড়োচ্ছি,’ দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল জো।

‘চুলের কাঁটাও,’ যোগ করল লরি। কয়েকটা কাঁটা ফেলে দিল জোর কোলে। ‘এগুলো এ রাস্তাটায় জন্মায়, বুঝেছ, মেগ? চিরুনি আর হ্যাটও।’

‘ছুটোছুটি করছিলি,’ বলল মেগ। ‘কবে যে বড় হবি তুই!’

‘হব না,’ বলল জো, ‘বয়স হোক তারপর বড় হব। তার আগে নয়।’

বেশ বিরক্ত দেখাল জোকে। দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাল লরি। মেগকে জিজ্ঞেস করল, ‘এত সেজেগুজে কোথায় গিয়েছিলে?’

‘গার্ডিনারদের বাড়িতে,’ বলল মেগ। ‘বেল মোফাটের বিয়ের গল্প শুনলাম স্যালীর কাছে। এলাহি কাণ্ড! প্যারিসে বেড়াতে গেছে ওরা। ভাবাই যায় না!’

‘ওকে হিংসে হয়, মেগ?’ জানতে চাইল লরি।

‘উম্...হুঁ।’

‘শুনে খুশি হলাম,’ মৃদু কণ্ঠে বলল জো। মাথায় চড়াল হ্যাটটা।

অবাক হয়ে গেল মেগ।

‘কেন?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘তারমানে তুমি বড়লোককে বিয়ে করতে চাও। আমরা একটা পয়সাওয়ালা দুলাভাই পাব,’ বলল জো।

‘আমি কাউকেই বিয়ে করতে চাই না,’ বলল মেগ। গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

পরবর্তী সপ্তাহ দুয়েক জো-র ব্যবহার বিস্মিত করল মেগকে। পোস্টম্যান বেল টিপলেই দরজায় ছুটে যায় জো, ব্রুকের সঙ্গে দেখা হলেই রুক্ষ ব্যবহার করে, মেগের দিকে চেয়ে থাকে মলিন মুখে, লরির সঙ্গে ইশারায় কথা বলে। মেগ ভেবে পায় না কি হয়েছে তার বোনের, জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে যায় জো।

দুসপ্তাহ পর। মেগ এক রবিবারে জানালার পাশে সেলাই করতে বসেছে। হঠাৎ চোখ তুলতেই নজরে পড়ল সারা বাগানময় ছুটে বেড়াচ্ছে জো। তাকে ধাওয়া করছে লরি। শেষমেশ ধরা পড়ল জো, একটা লরেন্স ঝোপের পেছনে। হাসির শব্দ কানে এল মেগের। তারপর শুনতে পেল কাগজের খচমচ।

‘মেয়েটার ছেলেমানুষী আর গেল না!’ আপন মনেই বলল মেগ। দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

মিনিট কয়েক বাদে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল জো। শুয়ে পড়ল সোফায়,

কি যেন পড়ছে।

'কি পড়ছিস রে?' জিজ্ঞেস করল মেগ।

'গল্প। ভাল নয় খুব একটা,' জবাব দিল জো। আড়াল করল কাগজের নামটা, সতর্কতার সঙ্গে।

'জোরে পড়। আমরাও শুনব,' বলল অ্যামি।

'নাম কি গল্পটার?' জিজ্ঞেস করল বেথ। বুঝে পেল না জো কাগজটার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে কেন।

'প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'নামটা তো সুন্দর,' বলল মেগ। 'জোরে পড়।'

'হুম,' লম্বা করে শ্বাস নিল জো। পড়তে শুরু করল। আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগল মেয়েরা। গল্পটা রোমান্টিক। দারুণ দরদ দিয়ে পড়ছে জো।

গল্পটা পড়া শেষ করে কাগজটা নিচু করল জো, ওর দিকে চাইল বেথ।

'কার লেখা এটা?' প্রশ্ন করল সে।

আচমকা উঠে বসল জো। ছুঁড়ে দিল কাগজটা। চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোর বোনের।'

'তোর?' কাজ থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেগ।

'খুব সুন্দর তো গল্পটা,' বলল অ্যামি।

'জানতাম! আমি জানতাম!' চেঁচাল বেথ। ছুটে এসে বোনকে জড়িয়ে ধরল।

বোনদের খুশি আর ধরে না। লেখিকার নামটা বারবার দেখল ওরা। ওদের ডাকাডাকিতে মিসেস মার্চ আর হান্নাও ছুটে এসেছে।

'কে ভাবতে পেরেছিল আমাদের পিচ্চি জো লেখিকা বনে যাবে!' বলল হান্না। কান পর্যন্ত হাসি তার।

মিসেস মার্চের চোখে জল। গর্ব হচ্ছে তাঁর।

'গল্পটার জন্যে কত পাবি রে?' 'বাবা যা খুশি হবেন!' 'তলে তলে এতসব?' সবাই মিলে চেপে ধরল জোকে।

'বলছি বাবা বলছি,' হেসে ফেলল জো। বলল কিভাবে লুকিয়ে কাগজের অফিসে গল্পগুলো নিয়ে গেছে সে। তারপর যোগ করল, 'প্রথমটার জন্যে পয়সা দেয়া হয় না। শুধু ছেপে উৎসাহিত করা হয়। তবে আমার পরবর্তী লেখাগুলোর জন্যে পয়সা পাব।'

কাগজটাতে মুখ গুঁজল জো। ক'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে। ভিজিয়ে দিল গল্পটাকে। তখন কি ও জানত সবে শুরু হল ওর অগ্রযাত্রা? ভবিষ্যতে আরও অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে ওর জন্যে?

দশ

'নভেম্বর বছরের সবচেয়ে বাজে মাস,' মুখ কালো করে বলল মেগ।

এক বিষণ্ণ বিকেলে জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, বাইরের দিকে চেয়ে। বাগানটাকে ইতোমধ্যে ঢেকে ফেলেছে কুয়াশা।

লেখা থামিয়ে মুখ তুলল জো, ওর নাকের ডগায় কালি লেগে রয়েছে।

'সেজন্যেই এ মাসটাতে জন্ম আমার,' বলল সে।

'এক্ষুনি যদি ভাল কিছু ঘটে তবে তোমাদের মতামত বদলে যাবে,' বলল বেথ সব ব্যাপারেই আশাবাদী সে।

'আমাদের কপালে শুধু খারাপটাই আছে। ভাল নেই,' হতাশ গলায় বলল মেগ।

'আমার গল্পের নায়িকাদের মত তোমাকে যদি কলমের খোঁচায় সুখী করে দিতে পারতাম!' বলল জো।

'দশটা বছর অপেক্ষা কর,' সান্ত্বনা দিল অ্যামি। 'জো আর আমি লিখে আর এঁকে প্রচুর রোজগার করব। তখন তুমি ইচ্ছেমত খরচ করতে পারবে।'

'অত ধৈর্য নেই,' বলল মেগ। 'তবে তোদের সদিচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। ফের চাইল বাইরে, কুয়াশা ঢাকা বাগানটার দিকে।

টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে রইল জো। অন্য পাশের জানালাটার পাশে বসে রয়েছে বেথ। হঠাৎ বলে উঠল সে, 'দুটো ভাল ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে এখুনি। মা ফিরছেন আর লরিও আসছে। দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা বলতে চায় ও।'

মুহূর্ত পরে দুজনেই ঢুকল। যথারীতি প্রশ্ন করলেন মিসেস মার্চ, 'তোদের বাপের চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়ল মেয়েরা। লরি বলল এসময়, 'চল, গাড়ি করে বেড়িয়ে আসি অঙ্ক করতে করতে মাথাটা গুলিয়ে গেছে, পরিষ্কার করা দরকার জো, তুমি আর বেথ তৈরি হয়ে নাও।'

'এক মিনিট,' বলল অ্যামি 'আমরা তিনজনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' হাত ধুতে ছুটল ও

'আন্টি, আমি কি পোস্ট অফিসে খোঁজ নেব একবার?' জানতে চাইল লরি। মিসেস মার্চের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়েছে সে। ঝুঁকে পড়েছে সামনে।

'নিলে মন্দ হয় না। আজ তো চিঠি আসার তারিখ। পোস্টম্যান কেন যে আসছে না–'

ঠিক তখুনি বেজে উঠল বেল, তীক্ষ্ণ শব্দে। কয়েক সেকেণ্ড বাদে হান্না ঘরে ঢুকল, হাতে টেলিগ্রাম

'মা, টেলিগ্রাম এসেছে,' বলল হান্না। কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দিল ওটা।

টেলিগ্রামটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন মিসেস মার্চ। দু'লাইনের চিঠিটা পড়ে ফেললেন এক নিঃশ্বাসে। তারপর ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। ছোট্ট কাগজটা যেন শেল বিঁধিয়েছে তাঁর বুকে। লরি ছুটে গেল পানি আনতে। মেগ আর হান্না বাতাস করতে লাগল মাকে। জো জোরে জোরে পড়তে শুরু করল চিঠিটা, ভয়ার্ত গলায়।

'মিসেস মার্চ,
আপনার স্বামী গুরুতর অসুস্থ। শীঘ্রি আসুন।

এস. হেল
সার্ভিস হসপিটাল, ওয়াশিংটন।'

ঘন অন্ধকার যেন গ্রাস করল দিনটাকে। মেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে মাকে। দ্রুত সামলে নিলেন মিসেস মার্চ।

'কালই রওনা হতে হবে,' বললেন তিনি। 'বড় দেরিতে পেলাম খবরটা।'

কেঁদে ফেলল জো আর বেথ। ওদের দেখাদেখি মেগ আর অ্যামিও।

'কেঁদে কি হবে?' শক্ত হতে চাইল হান্না। 'মা, তুমি জলদি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।' একথা বলেই চলে গেল সে, দ্রুত হাতে গোছাতে শুরু করল প্রয়োজনীয় সব জিনিস।

'হান্না ঠিকই বলেছে,' বললেন মিসেস মার্চ। মলিন মুখটাতে দৃঢ়তা ফুটে উঠল। 'লরি কোথায়?'

'এই যে আমি।'

'টেলিগ্রাম পাঠাও, জানাও আমি যত দ্রুত সম্ভব আসছি। আর মার্চ ফুফুর কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দেবে। জো, কলমটা দে তো, কাগজও দিস।'

কাগজ আর কলম এনে দিল জো। বুঝল মা যাত্রার টাকা ধার করবেন মার্চ ফুফুর কাছ থেকে। বাবার জন্যে বুকের ভেতরটা উথালপাতাল করছে

তার। এই দুঃসময়ে মার হাতে কিছু টাকা দিতে পারলে ভাল হত।

মিসেস মার্চ চিঠিটা দিলেন লরির হাতে।

'ধীরে সুস্থে যেয়ো,' বললেন তিনি। 'হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে বোসো না।'

বেরিয়ে গেল লরি। মেগ আর অ্যামি যখন মাকে সাহায্য করছে তখন জোকে পাঠানো হল কেমিস্টের দোকানে। বেশ অনেকগুলো জিনিস কেনার জন্যে। বেথকে পাঠিয়ে দেয়া হল মিস্টার লরেন্সের কাছে।

'বোতল দুয়েক পুরানো ওয়াইন চাইবি,' বলে দিলেন মিসেস মার্চ। 'এ মুহূর্তে লজ্জা করলে নিজেদেরই বিপদ।'

মিস্টার লরেন্স খবর শুনে বেথকে সঙ্গে করে ছুটে এলেন। নানাভাবে সাহায্য করতে চাইলেন ভদ্রলোক। এমনকি ওয়াশিংটন পর্যন্ত মিসেস মার্চের যাত্রাসঙ্গীও হতে চাইলেন। মিসেস মার্চ তাতে রাজি হলেন না অবশ্য, বুড়ো মানুষটি যাত্রার ধকল সইতে পারবেন না। চলে গেলেন মিস্টার লরেন্স। বলে গেলেন পরে আসবেন আবার। মিনিট পাঁচেক পরে ব্রুক এসে হাজির হল। প্রথমেই তার দেখা হল মেগের সঙ্গে।

'খবরটা শুনেই ছুটে এলাম,' বলল সে। 'তোমার মায়ের সঙ্গে যেতে চাই আমি। মিস্টার লরেন্স এমনিতেও ওখানে কাজে পাঠাচ্ছেন আমাকে।'

চকচক করে উঠল মেগের চোখ দুটো।

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল সে। 'মা আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।'

কথা ক'টা বলেই মাথা নিচু করে ফেলল মেগ। দ্রুত চলে গেল ভেতরে। বলে গেল মাকে ডাকতে যাচ্ছে।

দ্রুত ফুরিয়ে গেল বিকেলটা। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত, কেবল জোর পাত্তা নেই। কোথায় যে গেছে কে জানে। ওরা চিন্তায় পড়ে গেল। লরি চলল ওকে খুঁজে আনার জন্যে।

লরি বেরিয়ে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরে ফিরে এল জো। অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওর চেহারা, সবাই অবাক হয়ে গেল। আরও অবাক হল যখন দেখল ওর হাতে দলা পাকানো রয়েছে বেশ কয়েকটা ডলার মার হাতে গুঁজে দিল সে ওগুলো।

প্রায় বুজে আসা গলায় বলল জো, 'বাবার জন্যে ক'টা টাকার ব্যবস্থা করেছি।'

'কোত্থেকে জোগাড় করলি, মা? পঁচিশ ডলার! কোথায় পেলি এত টাকা?'

'রোজগার করেছি, নিজের জিনিস বেচে।'

কথা বলার সময় বনেট খুলে ফেলেছে জো। সবাই চেঁচিয়ে উঠল বিস্ময়ে। ওর চমৎকার চুলগুলো ছেঁটে ছোট করা হয়েছে। এবার আর কারও বুঝতে বাকি রইল না টাকা সে কিভাবে রোজগার করেছে।

'এত সুন্দর চুলগুলো কেটে ফেললি!' বলে উঠলেন মা।

কাঁধ ঝাঁকাল জো। 'ভালই হয়েছে। বড় বিরক্ত করছিল, চুলের জ্বালায় অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিনের জন্যে এখন নিশ্চিন্ত।'

'ব্যাপারটা খুলে বল তো শুনি,' বললেন মিসেস মার্চ।

'বাবার জন্যে কিছু একটা করতে মন চাইছিল,' জবাব দিল জো। 'কেমিস্টের দোকান থেকে ফেরার পথে নজরে এল একটা সেলুন। ওটার জানালায় কয়েক গোছা চুল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, দাম সহ। একটা গোছার দাম দেখলাম চল্লিশ ডলার। হঠাৎই বুদ্ধিটা এল মাথায়। ঢুকে পড়লাম দোকানটায়। দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম চুল কিনবে কিনা। রাজি হল। ব্যস–বেচে দিলাম।'

'বাপের জন্যে মেয়ের টান দেখেছিস!' মৃদু কণ্ঠে বললেন মিসেস মার্চ।

সেরাতে বেথ আর অ্যামি তখন ঘুমিয়ে কাদা। বিছানায় শুয়ে রাজ্যের চিন্তা করছে মেগ। শুয়ে রয়েছে জোও। মেগের ধারণা ঘুমিয়ে পড়েছে সে। হঠাৎ চাপা ফোঁপানির শব্দে চমকে উঠল মেগ।

'কিরে, জো? ঘুমাসনি? বাবার জন্যে মন খারাপ করছে?'

'উঁহুঁ।'

'তবে? কাঁদছিস মনে হল!'

'আমার–আমার চুল,' এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল জো, বালিশে মুখ গুঁজল।

বোনকে জড়িয়ে ধরল মেগ।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল জো।

'ঘুম আসছে নারে–বড় চিন্তা হচ্ছে।'

'ভাল কিছু ভাবতে চেষ্টা কর, ঘুম এসে যাবে।'

'চেষ্টা করেছি, আসছে না।'

'কি ভেবেছ?'

'সুন্দর সব ছেলেদের মুখ। বিশেষ করে চোখ,' জবাব দিল মেগ। আপন মনেই হাসল।

'কোন্ রঙটা সবচেয়ে পছন্দ তোমার?'

'বাদামি, নীলও চমৎকার।'

হাসল জো।

'বেশি ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না তো, ঘুমাতে দে,' চাপা গলায় ধমক দিল মেগ।

খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়ল দুবোনে।

এগারো

শীতের আবছা ভোরে প্রদীপ জ্বালল বোনেরা। শপথ করল হাসি মুখে বিদায় জানাবে মাকে। কাঁদাকাটি করে নরম করে দেবে না তাঁকে।

নিচে নেমে এল ওরা। বড় অদ্ভুত লাগছে পরিপার্শ্ব। অস্পষ্ট, নিথর বাইরেটা।

এত ভোরে সচরাচর নাস্তা করে না ওরা। হান্নাকে পর্যন্ত অপরিচিত লাগছে ওদের। নাইট ক্যাপ পরে রান্নাঘরে আর খাবার টেবিলে ছুটোছুটি করছে সে, নাস্তা সাজাচ্ছে।

বড় ট্রাঙ্কটা রাখা হয়েছে হলরুমে। সব আয়োজন সম্পন্ন। নাস্তা সারার চেষ্টা করছেন মা, কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে, রাতে ঘুমোতে পারেননি।

চুপচাপ নাস্তা সেরে নিল ওরা। বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। এখন শুধু ক্যারিজের জন্যে অপেক্ষা। মিসেস মার্চ মেয়েদের বললেন, 'হান্না আর মিস্টার লরেন্স তোমাদের দেখে রাখবেন। আমার জন্যে চিন্তা করবে না। নিয়মিত কাজে যাবে। ঘনঘন চিঠি লিখবে কিন্তু—'

এ সময় ওদের কানে এল চাকার ঘর্ঘর শব্দ। খুব সহজভাবেই ব্যাপারটাকে মেনে নিল ওরা। একে একে প্রত্যেকে চুমু খেল মাকে, জড়িয়ে ধরল। ক্যারিজে গিয়ে উঠলেন মা। চলতে শুরু করল ওটা। হাত নেড়ে মাকে বিদায় জানাল মেয়েরা।

লরি আর তার দাদাও এসেছেন মিসেস মার্চকে বিদায় জানানর জন্যে, ব্রুকও। সে অবশ্য যাবে তাঁর সঙ্গে। ও যাচ্ছে বলে যথেষ্ট ভরসা পাচ্ছে চার বোন।

মা চলে গেলে পর প্রতিবেশীরাও চলে গেলেন নিজের বাড়িতে, নাস্তা সারতে। জো বলল এসময়, 'মনে হচ্ছে দুনিয়াটা ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।'

'ঠিকই বলেছিস,' বলল মেগ। 'বাড়িটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল।'

পরবর্তী ঘণ্টাটা সুখকর হল না ওদের জন্যে। বহু কষ্টে কান্না চাপল ওরা। মা ওদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তাঁর অবর্তমানে নিজেদেরকে বড় অসহায় মনে হল মেয়েদের।

'সবাই মিলে কফি খাওয়া যাক,' বলল হান্না। পরিবেশ হালকা করতে চাইল সে। মন খারাপ লাগছে তারও, কিন্তু প্রকাশ করল না সেটা। এ পরিবারের সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব এখন ওর কাঁধে। ওকেই সামলাতে হবে মেয়েদেরকে।

কফিপট নিয়ে এল সে। কফির মনকাড়া সুগন্ধে ভেতরটা চনমন করে উঠল ওদের। সবাই মিলে বসে পড়ল টেবিলটা ঘিরে। মিনিট দশেকের মধ্যেই হান্নার কফি ওদেরকে মনের দিক দিয়ে অনেকটা চাঙ্গা করে তুলল।

তিন দিন পর মায়ের চিঠি এল। তিনি লিখেছেন বাবা ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তবে এখন অনেকখানি সামলে উঠেছেন। এরপর থেকে প্রতিদিনই একটি করে চিঠি আসতে লাগল। বাবার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে দিনকে দিন। মেয়েদের খুশি ধরে না।

সে সপ্তাহটা চমৎকার কাটল ওদের। বাবার অসুস্থতা সম্পর্কে প্রাথমিক দুশ্চিন্তা কেটে গেল। এবার আবার তাদের খোঁচাতে লাগল ছুটির চিন্তা। ক'টা দিন ছুটি কাটাতে পারলে ভাল হত।

জো ঠাণ্ডা বাধিয়ে বসল এর মধ্যে। ফলে মার্চ ফুফুর কাছ থেকে নির্দেশ এল অসুখ না সারা পর্যন্ত ও বাড়িতে যাওয়া চলবে না। খ্যানখেনে গলায় বই পড়ে শোনানো মোটেই পছন্দ নয় তাঁর। জোও তাই চাইছিল। এই সুযোগে একগাদা বই পড়ে ফেলবে, ঠিক করল সে।

মা চলে যাওয়ার পর পুরো বাড়ির তত্ত্বাবধানে হান্নাকে সাহায্য করছে বেথ।

'মেগ, হামেলদের খবর নেয়া দরকার। মা বলে গেছেন। তুমি যাবে একবার?' বেথ বলল একদিন।

হামেলরা হচ্ছে সেই জার্মান পরিবারটি যাদেরকে ক্রিসমাসের সকালে নিজেদের নাস্তা বিলিয়ে দিয়েছিল মার্চ পরিবার।

'আমি ব্যস্ত। অন্য কাউকে পাঠা,' জবাব দিল মেগ। একমনে সেলাই করে চলেছে সে।

'তুমি যাও না, জো,' বলল বেথ।

'বলিস কি? এই সর্দি নিয়ে?'

'সেরেই তো গেছে প্রায়।'

'বাইরে যাওয়ার মত সারেনি এখনও,' দ্রুত বলল জো। 'তাছাড়া বইটা শেষ করতে হবে না?' হাতের বইটা দেখাল সে।

'তুই নিজে গেলেই তো পারিস,' বলল মেগ।

'প্রতিদিনই তো যাই,' বলল বেথ। 'কিন্তু বাচ্চা দেখাশোনা করতে পারি না যে। বাচ্চাটা অসুস্থ। মিসেস হামেল কাজে চলে যান। বাচ্চাটার ভাই বোনেরাও আমার মতই, অনভিজ্ঞ। ফলে দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে ও। আমার মনে হয় তোমার আর হান্নার যাওয়া দরকার। আমার মাথাটা ব্যথা করছে, নইলে আমিই যেতাম,' একটানা কথাগুলো বলল বেথ।

'অ্যামি ফিরুক, ওকে পাঠাব,' মন্তব্য করল মেগ।

'আমি তবে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিই,' বেথ বলল।

এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। অ্যামির দেখা নেই। মেগ চলে গেছে তার ঘরে, নতুন একটা পোশাক পরে দেখার জন্যে। ওদিকে জো ডুবে গেছে বইটার মধ্যে। নিঃশব্দে হুড পরে নিল বেথ। একটা ঝুড়িতে খাবার ভরল, গরীব বাচ্চাগুলোর জন্যে। বেরিয়ে এল বাইরে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তখন। ওর মাথায় আর হৃদয়ে পাষাণ ভার।

ওবাড়ি থেকে বেথকে ফিরতে দেখল না কেউ। চুপিচুপি ওপর তলায় উঠে গেল সে, মায়ের ঘরে। ভিড়িয়ে দিল দরজা। বেশ কিছুক্ষণ পর জো গেল মায়ের ঘরে, কি একটা কাজে যেন। বেথকে পেল সেখানেই। ওষুধের বাক্সের পাশে মনমরা হয়ে বসে রয়েছে। চোখ লাল, হাতে কর্পূরের বোতল।

'কি হয়েছে তোর?' প্রায় চিৎকার করে উঠল জো।

একটা হাত তুলল বেথ, যেন সাবধান করতে চায় জোকে। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্কারলেট ফিভার হয়েছিল না?'

'সে তো কয়েক বছর আগে, কেন?'

'বাচ্চাটা মারা গেছে, জো।'

'কোন্ বাচ্চা?'

'মিসেস হামেলের। আমার কোলে মারা গেছে, ওর মা ফেরার আগে,' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বেথ।

'আহারে! ইস্, কেন যে গেলাম না আমি,' অপরাধী দেখাচ্ছে জোকে।

'মিসেস হামেল গিয়েছিলেন ডাক্তার ডাকতে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে ছিলাম আমি। মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু হঠাৎই ককিয়ে উঠে কাঁপতে লাগল। তারপর শান্ত হয়ে গেল। হাত-পা ঘষে গরম করতে চাইলাম, দুধ খাওয়ানর চেষ্টা করলাম, কিন্তু এতটুকু নড়ল না। বুঝলাম

সব—সব শেষ।'

'কাঁদিস না, বেথ। তারপর কি করলি?'

'ডাক্তার নিয়ে মিসেস হামেল না ফেরা পর্যন্ত বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরে বসে রইলাম। ডাক্তার এসে বললেন ও মারা গেছে। তারপর চাইলেন অন্য বাচ্চাগুলোর দিকে। দুটোর নাকি গলা ব্যথা শুরু হয়েছে। "স্কারলেট ফিভার," বললেন তিনি। আমাকে তক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। নইলে আমাকেও জ্বরে ধরতে পারে।'

জোকে আতঙ্কিত দেখাল। বেথের দিকে তাকাল সে। হাত রাখল বোনের মাথায়, সেখান থেকে গলায়। তারপর শুকনো গলায় বলল, 'তোর কথা শুনে ভয় হচ্ছে রে। আমি হান্নাকে ডেকে আনছি, তুই বসে থাক। রোগ-বালাইয়ের ব্যাপারে ও অনেক জানে।'

হান্না চুলোর পাশে বসে ঘুমোচ্ছিল। ডেকে আনা হল ওকে। ও দেখে-টেখে বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। স্কারলেট ফিভার কম বেশি সবারই হয়। ঠিকমত চিকিৎসা হলে মারা যায় না কেউ।'

'সত্যি?' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল দুবোন।

'হ্যাঁ,' বেথকে আবার পরীক্ষা করে দেখল সে। 'ডাক্তার ব্যাংসকে আনাব, বেথকে একবার দেখে যাওয়ার জন্যে। অ্যামিকে কিছুদিনের জন্যে পাঠাতে হবে মার্চ ফুফুর বাড়িতে। তোমাদের মধ্যে যে-কোন একজন বেথের দেখাশোনা করবে, দিন দুয়েকের জন্যে।'

'আমি করব। ওর অসুস্থতার জন্যে আমিই দায়ী,' ঘোষণা করল জো।

অ্যামিকে যখন জানানো হল তাকে মার্চ ফুফুর বাড়িতে যেতে হবে তখন বেঁকে বসল সে। 'তার চেয়ে আমার জ্বরে পড়াই ভাল,' বলল ও।

মেগ নানাভাবে বোঝাল, অনুরোধ করল, শেষে ধমকাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অ্যামি সাফ জানিয়ে দিল ও বাড়িতে যাবে না সে। হতাশ হয়ে পড়ল মেগ। ঠিক সে সময় ওদের বৈঠকখানায় ঢুকল লরি। ঢুকে দেখে সোফায় মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছে অ্যামি। ওকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সব জানাল অ্যামি। মনোযোগ দিয়ে শুনল লরি। তারপর দুপকেটে হাত পুরে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভেতর। হালকা করে শিস দিচ্ছে, কুঁচকে রয়েছে ভ্রূজোড়া, ভাবছে। এবার অ্যামির পাশে বসে পড়ল ও। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তুমি রাজি হয়ে যাও, অ্যামি। কথা দিচ্ছি প্রতিদিন ও বাড়িতে যাব আমি। তোমাকে নিয়ে বেড়াব, থিয়েটার দেখব। চলবে না?'

'কিন্তু ওখানে আমার ভাল লাগে না যে। ওনার যা মেজাজ—'

'বললাম না প্রত্যেকদিন যাব আমি? বেথের কথা জানতে পারবে

আমার মুখে। তাছাড়া বেড়ানো তো রইলই। ভদ্রমহিলা পছন্দ করেন আমাকে, আপত্তি করবেন না।'

'বেথ সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে কিন্তু।'

'অবশ্যই।'

'আর সত্যি সত্যি থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে।'

'ভদ্রলোকের কথার নড়চড় হয় না।'

'উম্...তবে আমি...রাজি,' ধীরে ধীরে বলল অ্যামি।

'খবরটা তবে মেগকে জানিয়ে আসি,' খুশি হয়ে বলল লরি। আদর করে চাপড় মারল অ্যামির কাঁধে।

মেগ আর জো লরির মুখে খবর শুনে ছুটে নিচে নেমে এল। অবাক হয়ে গেছে তারা। অ্যামিকে রাজি করানো আর প্রকাণ্ড কোন পাথর ঠেলে সরানো একই রকম কঠিন লাগছিল ওদের কাছে। অ্যামিকে তক্ষুনি তৈরি হতে হল। ওকে মার্চফুফুর বাড়িতে পৌঁছে দেবে জো আর লরি।

ইতোমধ্যে ডাক্তার ব্যাংস এসেছিলেন। একবার দেখেই বলে দিয়েছেন বেথের স্কারলেট ফিভার হয়েছে। ওষুধের ফর্দ দিয়ে গেছেন। কথা দিয়েছেন দিনে অন্তত দুবার করে বেথকে দেখতে আসবেন।

ওদেরকে শীতল অভ্যর্থনা জানালেন ফুফু।

'কি চাই তোমাদের?' জানতে চাইলেন তিনি। চশমার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চাইলেন। তাঁর পোষা তোতাটা চেয়ারের ঠিক পেছনে এসে বসেছে।

সব কথা খুলে বলল জো।

'এইসবই তো শিখেছ। বস্তিতে গিয়ে ইল্লতদের সঙ্গে মিশলে জ্বর হবে না তো কি হবে? আমার সাফ কথা, অ্যামি থাকতে চাইলে থাকুক; তবে কাজ করতে হবে ওকে। বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। আর ও নিজেও জ্বর বাধায়নি তো? আমি বাপু লোকের উপকার করতে গিয়ে অসুখে ভুগতে চাই না।'

'তোমাদের মা খবর পাঠিয়েছে?' খানিক বাদে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা।

'হ্যাঁ, বাবা আগের চেয়ে অনেক ভাল আছেন,' জবাব দিল জো।

'তাই নাকি? তবে আমার ধারণা ও আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। বড় দুর্বল মানুষ,' ঠোঁট উল্টে বললেন ফুফু। 'জো, এবার জলদি কেটে পড়।'

'গেলি এখান থেকে?' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল তোতাটা। খিলখিল

করে হেসে ফেলল অ্যামি। ওকে রেখে রওনা দিল জো আর লরি।

মেগ ইদানীং বাড়িতে থাকছে, বাড়ির কাজকর্ম করছে। ওদিকে বেথের দেখাশোনা করছে জো, দিন রাত। কাজটা ওর জন্যে খুব একটা কঠিন কিছু নয়। কেননা অসীম ধৈর্য বেথের, সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে মুখ বুজে। কদিন পর চেতনা প্রায় লোপ পেল ওর। ওকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকা পরিচিত মুখগুলোও অচেনা এখন তার কাছে।

মৃত্যুর শীতলতা এখন পুরো বাড়ি জুড়ে। ভারি মনে বোনেরা যে যার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বেথ সারাদিন বিছানায়। মাঝেমধ্যে কাত হয়, বিড়বিড় করে কি সব যেন বলে তারপর আবার তলিয়ে যায় ঘুমের অতলে।

দিনে দুবার আসেন ডাক্তার ব্যাংস। রাতে জোর সঙ্গে হান্নাও বসে থাকে বেথের শিয়রে। ডেস্কে টেলিগ্রাম রাখে এখন মেগ, যে-কোন মুহূর্তে দরকার পড়তে পারে।

পয়লা ডিসেম্বর আজ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, শীতের বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দেয়। তুষার পড়ছে, ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে যেন তৈরি হয়ে নিচ্ছে বছরটা। সকাল বেলা ডাক্তার এলেন। দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইলেন রোগীর দিকে। বেথের গরম হাতটা তুলে নিলেন নিজের দু-হাতে। ধরে রাখলেন মিনিটখানেক, নামিয়ে রাখলেন আবার। নিচু গলায় হান্নাকে বললেন, 'সম্ভব হলে মিসেস মার্চকে আনিয়ে নিন।'

মাথা ঝাঁকাল হান্না। মুখে কথা নেই। কামড়ে ধরেছে ঠোঁট, নার্ভাস। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মেগ। মাথাটা কেমন হালকা লাগছে তার, বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে যেন। খানিকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল জো। তারপর ছুটল বৈঠকখানায়, টেলিগ্রামটা তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ঝোড়ো হাওয়া বইছে তখন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল সে। প্রায় তক্ষুনি এল লরি, চিঠি নিয়ে। মিস্টার মার্চের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। চিঠিটা পড়ল জো, মলিন মুখে।

'কি ব্যাপার? বেথ কেমন আছে এখন?' দ্রুত প্রশ্ন করল লরি।

'মাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে,' বলল জো। 'ডাক্তারের কথায়।'

কথাগুলো বলতে বলতেই দুগাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল জোর। ওর ডান হাতটা তুলে নিল লরি। মৃদু চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমার পাশে আছি, জো, থাকব।'

ওকে আঁকড়ে ধরল জো, বুকে মুখ গুঁজল। ফুঁপিয়ে চলেছে সে। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল লরি, নির্বাক। জো খানিকটা শান্ত হলে বলল ও, 'ভেব না,

জো। ঈশ্বর বেথকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না। এতখানি নিষ্ঠুর নন তিনি।'

অনেকটা স্বস্তি ফিরে পেল জো লরির কথায়।

'এবার একটু হাসো,' বলল লরি। 'জবর খবর আছে একটা, শুনবে?'

'কী খবর?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জো।

'গতকাল আন্টিকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। ব্রুক জানিয়েছে তিনি শিগ্গিরই আসছেন। আজ রাতেই। খুশি হওনি?'

লরির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল জো। তারপর হঠাৎ ওর গলা জড়িয়ে ধরল। আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'লরি, তোমার পেটে পেটে এত বদমায়েশি? বুদ্ধিটা কোথায় পেলে?'

'আমার আর তর সইছিল না,' জবাব দিল লরি। 'দাদুরও। ভাবলাম আন্টিকে বেথের অসুস্থতার কথা জানানো দরকার। ঈশ্বর না করুন একটা কিছু ঘটে গেলে তাঁকে মুখ দেখাতে পারব না আমরা। তাই আর দেরি না করে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। রাত দুটোর ট্রেনে আসছেন তিনি।'

'লরি! তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব,' ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল জো। মেগ আর হান্নাকে সুখবরটা পৌঁছে দিতে হবে।

বাড়িটাতে আবার যেন প্রাণ ফিরে এসেছে। পুরো দিনই তুষার পড়ল, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইল, ধীরলয়ে বয়ে চলল সময়। তারপরও এ বাড়ির বাসিন্দাদের মনে আনন্দ, শুভ কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে তারা।

রাত নামল। অসুস্থ বোনের বিছানার দু'পাশে চুপ করে বসে রইল মেগ আর জো। সাহায্য আসছে, মনোবল ফিরে পেয়েছে ওরা। ডাক্তার বলে গেছেন মাঝ রাতের দিকে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। ভাল নাকি মন্দ। মাঝ রাতের দিকে একবার আসবেন তিনি।

সারাদিনের ধকল শেষে পরিশ্রান্ত হান্না ঘুমিয়ে রয়েছে এ মুহূর্তে, বিছানার পায়ের কাছের সোফাটিতে।

বৈঠকখানায় অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছেন মিস্টার লরেন্স। কার্পেটের ওপর শুয়ে রয়েছে লরি, বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করছে; পারছে না। ফায়ারপ্লেসের দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রয়েছে সে, চিন্তামগ্ন।

বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে মেগ আর জো। বারোটার ঘণ্টা বাজল দেয়াল ঘড়িটাতে। তখনও বসে রয়েছে ওরা। বেথের পাণ্ডুর মুখটাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ওদের। চারদিক নিস্তব্ধ। সমস্ত বাড়িটা যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। মাঝেমধ্যে কেবল বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় নীরবতা ভাঙছে। এক ঘণ্টা পেরোল, নতুন কিছুই ঘটল না। ইতোমধ্যে লরি চলে গেছে স্টেশনে।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, কেউ এল না। মায়ের দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মেয়েরা। ঝড়ের জন্যে এই বিলম্ব, বুঝতে পারল ওরা।

দুটো বেজে গেছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল জো। অস্ফুট একটা শব্দ শুনে চকিতে চাইল বিছানার দিকে। বেথের পাশে চলে এল দ্রুত। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল বেথের মুখ থেকে মুছে গেছে যন্ত্রণার চিহ্ন।

খুব শান্ত আর গভীর দেখাচ্ছে এখন ঘুমন্ত মেয়েটিকে।

এসময় ঘুম ভেঙে জেগে উঠল হান্না। ছুটে এল বেথের বিছানার কাছে। হাত ছুঁয়ে দেখল, কান পাতল ওর ঠোঁটে। তারপর বলে উঠল, 'জ্বর চলে গেছে। স্বাভাবিক ভাবে ঘুমোচ্ছে ও। সবই ঈশ্বরের দয়া।'

মেগ আর জো সুখবরটা আত্মস্থ করার আগেই এসে পড়লেন ডাক্তার। বেথকে পরীক্ষা করলেন তিনি। দুবোনের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আর চিন্তা নেই বিপদ কেটে গেছে। ওর এখন ঘুম দরকার।'

রাত কেটে ভোর এল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মেগ আর জো। বড় পবিত্র মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে। চমৎকার লাগছে সব কিছু, এত ভাল কোনদিন লাগেনি ওদের।

'রূপকথার মত লাগছে,' আপন মনেই বলল মেগ, হাসল।

'আরে!' বলেই ছুটতে শুরু করল জো।

হ্যাঁ, নিচ তলায় বেল বেজে উঠেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল হান্না। শোনা গেল লরির উল্লসিত গলা, 'আমরা এসে পড়েছি। কোথায় তোমরা?'

বারো

মুহূর্তে আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল নিষ্প্রাণ বাড়িটা।

সেদিন সন্ধ্যায় মেগ বাবাকে চিঠি লিখতে বসল, মা ভাল ভাবে পৌঁছেছেন সে খবর জানাতে। আর জো সুড়ুৎ করে চলে গেল ওপরে, বেথের ঘরে। মা বসে রয়েছেন অসুস্থ মেয়ের পাশে। এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল জো, চুলে আঙুল বোলাল। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে।

'কিরে, কিছু বলবি?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন মা।

'হ্যাঁ, মা।'

'মেগের ব্যাপারে নিশ্চয়ই?'

'কিভাবে বুঝলে?' অবাক হয়ে গেল জো। 'হ্যাঁ, ওর ব্যাপারেই।'

'বলে ফেল,' বললেন মা। 'বেথকে জাগিয়ে দিস না আবার

মেঝেয় বসে পড়ল জো, মায়ের পায়ের কাছে।

'মেগ লরিদের বাড়িতে ভুলে এক জোড়া গ্লাভস ফেলে এসেছিল। অবশ্য পরে তার একটা আবার ফিরে এসেছে আর অন্যটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা। এই সেদিন লরি আমাকে জানিয়েছে ওটা ব্রুকের কাছে রয়েছে, ওর ওয়েস্ট কোটের পকেটে। হঠাৎ একদিন লরির সামনে পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল গ্লাভটা। লরি এ নিয়ে খুঁচিয়েছে ব্রুককে ব্রুক বলেছে ও নাকি মেগকে পছন্দ করে, কিন্তু সেকথা বলার সাহস পায়নি।

ওর আস্পর্দা দেখেছ? ব্যাপারটা তোমাকে জানানো দরকার, তাই বললাম।'

চিন্তিত চোখে ওর দিকে চাইলেন মা

'মেগ কি ওকে পছন্দ করে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কখনই না। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহ নেই, আমার মতই।'

'তারমানে তোর ধারণা জনের প্রতি আগ্রহ নেই ওর?'

'কার কথা বললে?'

'মিস্টার ব্রুক। ওকে এখন "জন" বলেই ডাকি

'ভাল! জানতাম এমনই হবে। পটিয়ে ফেলেছে তোমাদের ওর সঙ্গে মেগের বিয়ে দেয়ার জন্যে তোমরা এখন এক পায়ে খাড়া

'রাগ করছিস কেন? জন আমাদের জন্যে অনেক করেছে ওকে পছন্দ না করে উপায় আছে? আর ছেলেটা খুব খোলা মনের মেগকে ভালবাসে, সে কথা জানিয়েছে আমাদের। বলেছে রোজগারের ভাল একটা ব্যবস্থা করে তবেই মেগকে বিয়ের কথা বলবে। আমি অবশ্য চাই না এত জলদি বিয়ে হয়ে যাক মেগের।'

'আমরাও চাই না,' ঘোষণা করল জো।

'মেগের বয়স মাত্র সতেরো,' বললেন মিসেস মার্চ। 'ওরা যদি একজন আরেকজনকে ভালবেসে থাকে তবে অপেক্ষা করুক, ভালবাসার জোর পরীক্ষা করুক। তারপর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। এই, চুপ চুপ, মেগ আসছে মনে হয়।'

মুহূর্ত পরেই ঘরে ঢুকল মেগ, হাতে চিঠি। ওটা একবার পড়ে নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন মিসেস মার্চ।

'সুন্দর লিখেছিস,' বললেন তিনি। 'একটা কথা যোগ করতে হবে কেবল। লিখে দে জনকে দোয়া জানিয়েছি আমি।'

'ওঁকে তুমি "জন" বলে ডাক?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করল মেগ। তার নিষ্পাপ চোখজোড়া মায়ের মুখের ওপর স্থির।

'হ্যাঁ। ও আমাদের ছেলের মত হয়ে গেছে,' গাঢ় দৃষ্টিতে মেগের দিকে তাকালেন তিনি।

'উনি না আসলে খুব একা। আচ্ছা চলি, মা। গুড নাইট,' শান্তস্বরে কথাগুলো বলল মেগ।

ওকে চুমু খেলেন মা। ও বেরিয়ে যেতেই মিসেস মার্চ আপন মনে বললেন, 'জনকে এখনও ভালবাসে না ও, তবে শিগ্‌গিরই বাসবে।'

পরদিন জোর মুখখানা হল দেখার মত। গম্ভীর হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। যেন গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য রয়েছে ওর কাছে, বড় রহস্যময় ওর আচার-আচরণ। তবে জোর পেট থেকে কথা বার করতে বেগ পেতে হল না লরির। সব শুনে সে তো রেগে আগুন। ব্রুক তাকে কিছু জানায়নি, তলে তলে এগিয়ে গেছে এতদূর? ব্রুককে উপযুক্ত শাস্তি দেবার পরিকল্পনা আঁটল লরি।

জো একদিন মেগের কাছে একটা চিঠি নিয়ে এল।

'এটা তোমার,' বলল সে। 'দরজার কাছে পড়ে ছিল। পোস্টম্যান বোধহয় ফেলে দিয়ে গেছে।'

চিঠিটা নিল মেগ, লাজুক হাসল। তারপর পড়তে শুরু করল।

মিসেস মার্চ আর জো যার যার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে তাকাল দুজনেই। মেগ অস্ফুটে কি যেন বলে উঠেছে। এ মুহূর্তে চিঠিটার দিকে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রয়েছে সে।

'কি হল?' মা ছুটে এলেন ওর কাছে। মেগের হাত থেকে চিঠিটা নেয়ার চেষ্টা করল জো।

'ও এটা পাঠায়নি—জো, একাজটা তুই কি করে করতে পারলি?' দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল মেগ।

'আমি আবার কি করলাম! কি বলছ তুমি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জো

জ্বলে উঠল মেগের চোখজোড়া। দলা পাকানো আরেকটা কাগজ পকেট থেকে বার করল সে, ছুঁড়ে দিল জোর দিকে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুই লিখেছিস এটা, ওই বদমাশ ছোঁড়াটার সঙ্গে মিলে। আমরা দুজন তোদের কি ক্ষতি করেছি?'

ওর কথা কানে গেল না জোর। সে এবং মিসেস মার্চ তখন

গোগ্রাসে গিলছে চিঠিটা। হাতের লেখাটা অদ্ভুত।

“প্রিয়তমা মার্গারেট,

আমার ভালবাসা নিয়ো। আজ পর্যন্ত তোমার মতামত জানতে পারলাম না। আশা করি আমি ফিরে এলেই জানিয়ে দেবে। তোমার বাবা-মাকে জানাতে সাহস পাচ্ছি না। তবে আমার ধারণা তাঁরা আপত্তি করবেন না। মিস্টার লরেন্স আমার জন্যে একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপর আমি আমার প্রিয়াকে বিয়ে করব। তাকে নিয়ে আসব নিজের কাছে। তোমার পরিবারের কাউকে এ ব্যাপারে এখনও কিছু জানানর দরকার নেই। লরিকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়ো। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

শুধু তোমারই
জন।”

‘শয়তান কোথাকার!’ চেঁচিয়ে উঠল জো। ‘আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, মজা দেখাব ওকে।’

‘দাঁড়া,’ ও ঘুরতেই ডাকলেন মা। ‘এটা তোর লেখা?’

‘না, মা বিশ্বাস কর আমি এসবের কিছুই জানি না। আমি হলে এরচেয়ে অনেক সুন্দর করে লিখতাম। এটা একটা লেখা হল নাকি? আমার ধারণা ব্রুক লেখেনি চিঠিটা,’ কাগজটা ঝাঁকিয়ে বলল জো।

‘কিন্তু হাতের লেখাটা তো ওর মতই,’ কাঁপা গলায় বলল মেগ নিজের হাতের চিঠিটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখল।

‘প্রথম চিঠিটার জবাব দিয়েছিলি?’ দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন মা।

‘হ্যাঁ,’ লজ্জায় মুখ ঢাকল মেগ, চিঠিটার আড়ালে।

‘সবটা জানতে চাই আমি। খুলে বল,’ মিসেস মার্চ বললেন। মেগের পাশে চেয়ার এনে বসে পড়লেন। ধরে রেখেছেন জোকে, পাছে ছুটে বেরিয়ে যায় সে।

‘প্রথম চিঠিটা লরি দিয়েছে। ও এমন ভাব করছিল যেন কিছুই জানে না,’ বলতে শুরু করল মেগ, কারও দিকে না চেয়ে। ‘তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম। পরে ভাবলাম মিস্টার ব্রুককে পছন্দ কর তুমি, তাই ব্যাপারটা যদি নাও জানাই অসুবিধে হবে না। আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি আমাকে মাফ করে দাও, মা।’

‘চিঠিতে কি লিখেছিলি?’

‘লিখেছিলাম আমি এসবের কিছু জানি না। ও যেন বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে।’

মিসেস মার্চ মৃদু হাসলেন। সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাঁকে।

হাততালি দিল জো। 'বলে যাও, মেগ। এরপর ও কি লিখেছে?'

'লিখেছে ও কোন প্রেমপত্র পাঠায়নি। ওর ধারণা এসব করেছে জো, মজা করার জন্যে। কী অপমান!'

মাকে জড়িয়ে ধরল মেগ, অপমানে কালো হয়ে রয়েছে মুখ। গটমট করে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে জো। হঠাৎ থেমে পড়ল সে। চিঠি দুটো অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর স্থির সিদ্ধান্ত দিল, 'ব্রুক লেখেনি। দুটো চিঠিই লরির লেখা, কোন সন্দেহ নেই।'

মিসেস মার্চ তখন মেগকে খুলে বললেন ব্রুকের সত্যিকার অনুভূতির কথা।

'তোরটাও জানা দরকার,' শান্তস্বরে বললেন মা। 'ওর জন্যে অপেক্ষা করবি? নাকি ফ্রি থাকবি? ওর দাঁড়াতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।'

'ভালবাসার ব্যাপারে আমি বেশ অনেকদিন কিছু ভাবতে চাই না, মা,' জবাব দিল মেগ। 'চিঠির কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। জনকে কিছু জানিয়ো না। লরি আর জোকে বলে দিয়ো মুখ বন্ধ রাখতে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমি ও ব্যাপারে আর ভাবতে চাই না।'

এ সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লরি। ওকে দেখে মেগ ছুটে পালাল ঘর থেকে। বসে রইলেন মিসেস মার্চ আর জো।

থমকে দাঁড়াল লরি। 'আন্দাজ করতে পারছি কি নিয়ে কথা বলছিলেন আপনারা,' অপরাধীর মত শোনাল ওর গলা। 'আমার ভুল হয়ে গেছে, আন্টি। আমি ক্ষমা চাই।'

'ভুল যখন বুঝেছই তখন আর কোন কথা নেই,' শান্ত স্বরে বললেন মিসেস মার্চ। 'তবে দুষ্টুমিটাও অনেক সময় সিরিয়াস হয়ে যায়। শোন, লরি, এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে আলাপ কোরো না।'

পরিস্থিতি হালকা করতে চাইল জো। 'মা, ও আসলে মজা করার জন্যেই কাজটা করেছে। অতটা বুঝতে পারেনি।'

'সে আমি জানি।'

ওদের কথা বলতে শুনে ঘরে ফিরে এল মেগ। ওর দিকে এগিয়ে গেল লরি।

'আমাকে মাফ করে দিয়ো,' করুণ শোনাল ওর গলা।

'চেষ্টা করব,' বলল মেগ।

জোর দিকে বার কয়েক চাইল লরি। চোখ টিপে প্রত্যুত্তর দিল জো। লরি বাউ করল মিসেস মার্চ, মেগ আর জোকে। তারপর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। বাগান পেরিয়ে সোজা চলে গেল নিজের বাড়িতে,

গোমড়া মুখে। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ সে। নিজের ওপরেই। ওকে পিছু ডাকার সাহস পেল না জো।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করল সে, ফন্দি আঁটল। তারপর বই ফেরত দেয়ার ছুতোয় চলে এল পাশের বাড়িতে।

'মিস্টার লরেন্স আছেন?' কাজের মহিলাদের একজনকে প্রশ্ন করল ও।

'হ্যাঁ। তবে মনে হয় না তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে।'

'কেন? অসুস্থ নাকি?'

'না, লরির সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে তাঁর। দুজনেরই মেজাজ খুব খারাপ দেখলাম।'

'লরি কোথায়?'

'ওর ঘরে। দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে। নক করেছিলাম, জবাব পাইনি। ডিনার তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু খাওয়ার লোক নেই।'

'আমি দেখছি।'

ওপরে উঠে এল জো। নক করল লরির ঘরের দরজায়।

'গেলে এখান থেকে!' হুঙ্কার ছাড়ল লরি।

এবার দরজায় ধাক্কা দিল জো। দড়াম করে খুলে গেল ভেজানো দরজাটা। হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল জো। আঁতকে উঠল লরি।

'লরি, কি হয়েছে তোমার?' প্রশ্ন করল জো।

'আমাকে অপমান করেছে, আমি সহ্য করব না,' আবার হুঙ্কার ছাড়ল ক্রুদ্ধ লরি।

'কে অপমান করেছে?'

'দাদু। অন্য কেউ হলে আমি তাকে–' মুঠো পাকিয়ে কথা শেষ করল সে।

'কিন্তু কেন করলেন?'

'তোমার মা কেন ডেকেছিলেন বলিনি বলে। তাঁকে কথা দিয়েছি কাউকে বলব না। দাদুকে বলি কিভাবে?'

'দাদুকে বুঝিয়ে বললে হত না?'

'না। উনি শুধু সত্যি কথাটা জানতে চান। আমি চুপ করে সব সহ্য করছিলাম। কিন্তু কলার ধরে ঝাঁকাতে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। দুকথা শুনিয়ে চলে এসেছি।'

'উনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভুল বুঝতে পেরেছেন। নিচে যাই চল, মিটমাট করে নেবে।'

'অসম্ভব! দাদু মাফ না চাওয়া পর্যন্ত তার প্রশ্নই ওঠে না।'

‘একটু বোঝার চেষ্টা কর, লরি। দাদু বুড়ো মানুষ!’

‘ওসব বুঝি না। আমি ওয়াশিংটনে চলে যাব, ব্রুকের কাছে। তুমিও আসতে পার আমার সঙ্গে। হঠাৎ হাজির হয়ে তোমার বাবাকে চমকে দিতে পারবে। ব্রুকও অবাক হয়ে যাবে আমাকে দেখে। একটা চিঠি লিখে সবাইকে জানিয়ে যাব। টাকারও অসুবিধে হবে না। কি, যাবে?’

রাজি হয়ে যেতে মন চাইছে জোর। এমন লোভনীয় প্রস্তাব জীবনে জোটে না বড় একটা। এটা হারানো কি ঠিক হবে? দোনামনা যখন করছে তখন চোখ চলে গেল পাশের পুরানো বাড়িটার দিকে। নাহ্, সম্ভব নয়, মাথা নাড়ল সে।

‘যতোসব পাগলামি চিন্তা,’ বলল সে। ‘তোমার দাদুকে যদি রাজি করাই আমি?’

‘কোন্ ব্যাপারে?’

‘কলার ধরার জন্যে উনি যদি দুঃখ প্রকাশ করেন, তবে পালানর চিন্তা ছাড়বে তুমি?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু ওটা পারবে না। খামোকাই ভাবছ।’

বেরিয়ে এল জো। একটা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে রয়েছে তখন লরি।

‘এসো,’ মিস্টার লরেন্সের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। তাঁর দরজায় টোকা দিয়েছে জো।

‘একটা বই নিতে এসেছিলাম,’ হেসে বলল জো।

‘নিয়ে যাও,’ বললেন ভদ্রলোক। অস্থির দেখাচ্ছে তাঁকে।

বই খুঁজতে শুরু করল জো। ভান করছে আরকি। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মিস্টার লরেন্স। পায়চারি করলেন খানিক।

‘ছোঁড়ার মতলবটা কি জান কিছু?’ আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি। ‘ওর মুখ দেখেই বুঝেছি কিছু একটা গোলমাল পাকিয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও মুখ খোলাতে পারলাম না। উল্টো রেগে মেগে ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছে।’

‘না বুঝে ভুল করে ফেলেছিল,’ বলল জো। ‘শাস্তিও পেয়েছে সেজন্যে। ব্যাপারটা মিটে গেছে। আপনি ও নিয়ে আর ভাববেন না।’

‘চড়িয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয় বদমাশটার,’ খেঁকিয়ে উঠলেন দাদু।

‘ও কথা দিয়েছিল কাউকে কিছু জানাবে না। আপনাকেও তাই জানাতে পারেনি। ওকে তো দোষ দিতে পারেন না।’

‘হুম্! ছোঁড়াটা কথা রেখে থাকলে অবশ্য আলাদা ব্যাপার,’ বললেন মিস্টার লরেন্স। ‘ওকে মাফ করে দেয়া যায় বোধহয়।’ ভদ্রলোক আঙুল

চালাতে লাগলেন চুলে।

'ওর খুব অভিমান হয়েছে,' বলল জো। 'ওকে একটু আদর করে দিন। সব ভুলে যাবে।'

'আদর করি না বলতে চাও?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন মিস্টার লরেন্স।

'আমি তা বলিনি। আপনি ওকে অনেক আদর করেন। মাঝেমধ্যে কেবল ওর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে পড়েন। ঠিক বলেছি না?'

বুড়ো ভদ্রলোক তাঁর চশমাটা সশব্দে নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। 'ঠিকই বলেছ। ওকে আমি খুবই ভালবাসি। কিন্তু ব্যাটা এমন সব কাণ্ড করে বসে—এভাবে ভুল বোঝাবুঝি চলতে থাকলে কি যে হবে কে জানে।'

'ও পালাবে।'

কথাটা বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারল জো। নিজের ওপর রাগ হয়ে গেল প্রচণ্ড। কি দরকার ছিল তার এত বকবক করার।

মিস্টার লরেন্সের লাল মুখটার রঙ বদলে গেল হঠাৎ। হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন চেয়ারে।

'ওকে খেতে নিয়ে এসো,' বললেন তিনি। 'বলবে আমার রাগ পড়ে গেছে।'

'ও আসবে না। মনে বড় দুঃখ পেয়েছে। আপনি কলার ধরে ঝাঁকিয়েছেন তো।'

দুঃখ দুঃখ চেহারা করতে চেষ্টা করল জো। তবে তক্ষুনি বুঝল ব্যর্থ হয়েছে সে। কারণ ঘর ফাটিয়ে অট্টহাসি করছেন তখন মিস্টার লরেন্স। জিত হয়ে গেল জোর।

'ব্যাটা চায়টা কি?' হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'আমার মনে হয় লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেই খুশি হয়ে যাবে ও। লিখুন না। আমি ওপরে পৌঁছে দেব।'

ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইলেন মিস্টার লরেন্স। পরে নিলেন চশমা। ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি খুব চালু মেয়ে। দাও, কাগজ দাও।'

লিখলেন মিস্টার লরেন্স। জো তাঁর টাকে চুমু খেয়ে কাগজ নিয়ে ছুটল ওপরে। দরজার তলা দিয়ে ওটা গলিয়ে দিল লরির ঘরে। কী হোল দিয়ে উপদেশ বর্ষণ করল। নিচে নেমে আসতে বলল ভদ্র ছেলের মত।

কথাগুলো বলে নামতে শুরু করল জো, নিচতলায়। সে পৌঁছনর আগেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে হলরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লরি। বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার।

'জো, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ,' বলল সে। 'দাদুকে পটালে

কিভাবে? ওনার মেজাজ এখন কেমন?'

'খুব ভাল। সোজা ডিনার খেতে বসে পড়, দাদুকে নিয়ে। পেটে খিদে থাকলে ছেলেদের মেজাজ সপ্তমে ওঠে,' বেরিয়ে গেল জো। ওকে অনেক বলে কয়েও খেতে রাজি করাতে পারল না লরি।

চিঠি লেখালেখির ব্যাপার পুরোটাই ভুলে গেল সবাই। কেবল একজন বাদে, সে হচ্ছে মেগ। বিশেষ একজন সম্পর্কে কোন কথা বলে না ও। তাই বলে যে তাকে পছন্দ করে না তা নয়। করে এবং আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। ইদানীং কল্পনার জাল বুনতেও শুরু করেছে সে, সেই বিশেষ মানুষটিকে ঘিরে।

সে ঘটনার কিছুদিন বাদে জো স্ট্যাম্প খোঁজার জন্যে মেগের ডেস্ক ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। হঠাৎ ওর হাতে পড়ল এক টুকরো কাগজ। ওতে লেখা রয়েছে 'মিসেস জন ব্রুক।'

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল জো। ভাবল ওটাও লরির এক রঙ্গ। কাগজটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও।

তেরো

প্রবল ঝড়ের পর সূর্যকিরণের মত আলো ছড়াল পরের কয়েকটা সপ্তাহ। মিস্টার মার্চ চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি আগামী বছরের গোড়ার দিকে বাড়ি ফিরে আসতে চান।

বেথও সেরে উঠছে ধীরে ধীরে। সারাদিন সোফায় শুয়ে সেলাই করে কাটে তার সময়। রোগে ভোগা বোনের জন্যে খাবার তৈরি করে মেগ, নিজের ইচ্ছেতেই। তাকে কিছু বলে দিতে হয়নি। ওদিকে অ্যামি আবার ফিরে এসেছে বাড়িতে, জানে বেঁচে গেছে সে।

দিন গড়িয়ে এগিয়ে আসছে ক্রিসমাস। জো আর লরি নানা ধরনের উদ্ভট সব পরিকল্পনা আঁটছে, ক্রিসমাসকে আনন্দমুখর করে তোলার জন্যে। লরির ইচ্ছে বনফায়ার করবে আর হাউই ছুঁড়বে। সানন্দে মত দিয়েছে জো। ওরা দুজন একসঙ্গে হলেই উঁচু স্বরে হাসির শব্দ কানে যায় অন্যদের।

ক্রিসমাস এখন দোরগোড়ায়। মিস্টার মার্চ লিখেছেন আর কদিনের মধ্যেই চলে আসছেন।

আজ ক্রিসমাস। বেথের মনে খুশি ধরে না, মায়ের দেয়া নরম গাউনটা

পরেছে সে। ওকে কোলে করে আনা হল জানালায়, স্নোম্যান দেখার জন্যে। লরি আর জো বানিয়েছে ওটা, বাগানে।

'বাবা আমাদের সঙ্গে থাকলে ষোলো কলাই পূর্ণ হত,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বেথ। জো ওকে বয়ে নিয়ে এল ভেতরে। বিশ্রাম দরকার ওর।

'ঠিকই বলেছিস রে,' বলল জো।

'একদম ঠিক,' প্রতিধ্বনি তুলল অ্যামি।

'আমরাও একমত। কি বলিস, মেগ?' প্রশ্ন করলেন মিসেস মার্চ।

'অবশ্যই, মা,' জবাব দিল মেগ। সিল্ক ড্রেসটার কুঁচি ঠিক করছে সে। মিস্টার লরেন্স জোরজার করে ওকে উপহার দিয়েছেন ওটা। এ পোশাকটাই মেগের জীবনের প্রথম সিল্ক ড্রেস।

কিছুক্ষণ পরে খুলে গেল বৈঠকখানার দরজা। লরির মাথা উঁকি দিল ভেতরে।

'মার্চ পরিবারের জন্যে বিরাট একটা উপহার রয়েছে,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে। লাফিয়ে উঠল মেয়েরা।

দরজা থেকে সরে গেল লরি। ভোজবাজির মত সেখানে উদিত হলেন লম্বামত এক লোক। আপাদমস্তক গরম কাপড়ে ঢাকা, ভর দিয়েছেন অন্য আরেকজন লম্বা লোকের ওপর।

দ্বিতীয় লোকটি কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, পারল না। মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সকলে। পরক্ষণেই চার জোড়া হাত জড়িয়ে ধরল মিস্টার মার্চকে। জো-র প্রায় অজ্ঞান হওয়ার দশা। পরিস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গেল ব্রুক। চুমু খেয়ে বসল মেগকে। বাপের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল অ্যামি। সবার আগে সামলে উঠলেন মিসেস মার্চ। হাত তুলে সাবধান করলেন, 'চুপ চুপ! বেথ!'

তবে দেরি হয়ে গেছে তখন। ঘরের দরজা খুলে গেল পুরোটা, ছুটে এসে বাপের বুকে মুখ লুকাল বেথ। এর পরের কয়েক মিনিট নীরবতা, আনন্দাশ্রু গড়াতে লাগল নিঃশব্দে।

কার হাসির শব্দে যেন হুঁশ ফিরল ওদের। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে হান্না, মুখে হাসি।

মিসেস মার্চের হঠাৎ খেয়াল হল ব্রুকের কথা। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন তিনি। তারপর স্বামীর আর বেথের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। বড়সড় একটা চেয়ারে একসঙ্গে বসল বাপ-বেটী।

'বাবা, আমাদের কিছু জানাওনি কেন?' সবার হয়ে জানতে চাইল মেগ।

'তোদের চমকে দেয়ার জন্যে,' মৃদু হেসে বললেন মিস্টার মার্চ। 'গত দুসপ্তাহ ধরেই সেরে উঠছিলাম। ফলে ডাক্তার আর আপত্তি করলেন না, ছেড়ে দিলেন।'

দুপুরে খেতে বসল সবাই মিলে। মিস্টার লরেন্স, লরি আর ব্রুকও অবশ্য দাওয়াত পেয়েছে, যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে।

'মনে আছে গত বছরের কথা? ক্রিসমাসের কদিন আগে কি রকম মন খারাপ করে বসে ছিলাম?' অতিথিরা চলে গেলে বলল জো।

'হুঁ। তবে মন্দ কাটেনি বছরটা,' জবাব দিল মেগ।

'কি যে বলে! একদম পচা ছিল গত বছরটা,' মুখ বাঁকিয়ে বলল অ্যামি।

'বুঝতে পারছি খুব একটা ভাল কাটেনি তোদের,' বললেন মিস্টার মার্চ। 'তবে এটাও ঠিক, এক বছরে অনেক বদলে গেছে আমার মেয়েরা, আজ বুঝলাম সেটা।'

'কি বুঝেছ, বাবা? বল না,' আবদার জুড়ল অ্যামি।

মেগের হাতজোড়া তুলে নিলেন বাবা, হাত বোলালেন। 'দেড় বছর আগে যখন বাড়ি ছেড়েছিলাম তখন এই হাতগুলো ছিল নরম তুলতুলে। এখন দেখছি এগুলো অনেকখানি শক্ত হয়ে উঠেছে। তারমানে মেয়ে আমার কাজের হয়েছে। আগেকার চেয়ে এখনকার হাতগুলো আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। মেয়ের জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে।'

বাবার দিকে চেয়ে লাজুক হাসল মেগ। পরিশ্রমের পুরস্কার এতদিনে পেল সে। বাবার প্রশংসার চেয়ে বড় আর কিছু নেই তার কাছে।

'জোও বদলে গেছে অনেক। ওর চুল এখন যদিও ছোট কিন্তু কিছুতেই আর ওকে আগের মত ছেলে ভাবা যাবে না। তার বদলে দায়িত্বশীল এক তরুণী হয়ে উঠেছে ও। যে পঁচিশ ডলার পাঠিয়েছে আমার জো তা আমার জীবনের বিরাট উপহার।'

চোখ ছলছল করে উঠল জোর।

'এবার বেথের কথা বল,' বলল অ্যামি। অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে কখন ওর পালা আসবে।

'ওর ব্যাপারে বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। পালিয়ে যায় যদি,' হেসে ফেললেন মিস্টার মার্চ। 'এমনি বললাম। আমার বেথ এখন আর অত লাজুকলতাটি নয়।' চোখ মুদলেন মিস্টার মার্চ। জড়িয়ে ধরলেন বেথকে। নরম গলায় বললেন, 'অল্পের জন্যে মেয়েকে ফিরে পেয়েছি। আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।'

এক মিনিট নিশ্চুপ রইলেন তিনি। এবার চাইলেন অ্যামির দিকে।

কার্পেটে বসে রয়েছে সে, বাবার পায়ের কাছে। চোখে রাজ্যের কৌতূহল আর আশা। ওর চুলে বিলি কাটতে লাগলেন মিস্টার মার্চ।

'ছোট্ট মেয়েটার ধৈর্য অনেক বেড়েছে, কাজেরও হয়েছে। নিজের চেয়ে অন্যের কথা অনেক বেশি করে ভাবতে শিখেছে।'

আনন্দে বুক ভরে উঠল মেয়েদের। তবে আনন্দ আরও বাড়ল যখন বেথ ধীরপায়ে চলে গেল পিয়ানোটার কাছে। পিয়ানোর চাবিগুলোর ওপর খেলে বেড়াতে লাগল ওর আঙুলগুলো। এক স্বর্গীয় সুর যেন আবিষ্ট করে রাখল মার্চ পরিবারকে। মিষ্টি গলায় গান গাইল বেথ। আবার কখনও ওর গান শুনতে পাবে এ কথা ভাবতে পারেনি ওরা কেউ।

চোদ্দ

পরদিন বিকেলে দেখা মিলল লরির। জোদের বাড়িতে আসছিল সে। হঠাৎ তার নজর গেল জানালায়। মেগ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাঁটু গেড়ে তুষারে বসে পড়ে বুক চাপড়াতে লাগল সে। অনুনয়ের ভঙ্গিতে জোড় করে রেখেছে হাত।

'এমন করছ কেন?' জানতে চাইল মেগ।

জবাব দিল না লরি, রুমাল বার করে শুকনো চোখ মুছতে লাগল। কান্নার ভান করছে।

'ও কি দেখাচ্ছে রে?' এবার জোকে প্রশ্ন করল মেগ। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'দেখাচ্ছে তোমার জন দিনকে দিন কিভাবে তোমার অনুগত হয়ে উঠবে। কি রকম লাগছে?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল জো।

'আমার জন বলছিস কেন? বলেইছি তো ওকে বন্ধু ছাড়া আর কিছু ভাবি না আমি।'

'বিশ্বাস করি না,' বলল জো। 'তুমি আর আগের মত নেই, অনেক পাল্টে গেছ। জনের ব্যাপারে ঢাক ঢাক গুড়গুড় করে পার পাবে না। আমি সবই বুঝি। দেরি না করে এবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও।'

'আমি ঢাক ঢাক গুড়গুড় করছি না,' অসহিষ্ণু গলায় বলল মেগ। 'সিদ্ধান্ত তো নেয়া হয়েই গেছে।'

'কি সিদ্ধান্ত নিলে আমাকে জানাতে আপত্তি আছে?' প্রশ্ন করল জো।

'মোটেই না। দেখিস যখন প্রেমে পড়বি তখন আমার এই ব্যাপারটা তোর অনেক কাজে আসবে।'

'প্রেমে পড়তে যাচ্ছেটা কে?' প্রায় তেড়ে উঠল জো।

'আমি ওকে কি বলব শুনবি না?'

'শুনতেই তো চাইছি।'

'ওকে বলব, "শুনুন মিস্টার ব্রুক, আপনার প্রস্তাবে রাজি হওয়া এ মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই বিষয়টা আপাতত ভুলে যান।" তারপর গটমটিয়ে বেরিয়ে যাব ঘর ছেড়ে।'

মেগ সেলাই করছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিভাবে সদম্ভে বেরিয়ে যাবে জোকে হেঁটে দেখাল।

এসময় সামনের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল ব্রুক। চটপট চেয়ারে গিয়ে বসল মেগ। গভীর মনোযোগে সেলাই করতে লাগল। যেন তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে ওটার ওপর। ব্রুককে দেখেও না দেখার ভান করল জো। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'কেমন আছ? ছাতাটা ফেলে গিয়েছিলাম–মানে দেখতে এলাম তোমার বাবা–' কথা শেষ করতে পারল না ব্রুক।

'বাবা ভালই আছেন, র‍্যাকে রয়েছেন। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি,' জবাব দিল মেগ। গুলিয়ে ফেলল সে কথাগুলো। ব্রুকের মত নার্ভাস হয়ে পড়েছে সেও।

মেগ সোজা দরজার দিকে হাঁটা দিল।

'মাকে ডেকে দিচ্ছি,' বলল সে।

'দাঁড়াও, মেগ। ভয় পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল ব্রুক। আহত মনে হল তাকে।

লাল হল মেগ। হাত বাড়িয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, 'ভয় পাব কেন? আপনি বাবার জন্যে যা করেছেন, তা বলার ভাষা নেই আমার।'

'ভাষা জুগিয়ে দেব?' বাড়ানো হাতটা নিজের হাতে নিল ব্রুক।

'আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, মেগ। শুধু জানতে চাই তুমিও আমাকে ওভাবে ভাব কিনা।'

মেগের বক্তৃতা এবং হেঁটে দেখানর সুযোগ এসে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তালগোল পাকিয়ে ফেলল সে। মৃদু স্বরে কেবল বলতে পারল, 'আমি জানি না।'

'জানতে চেষ্টা করবে না?'

'ভয় করে। আমার বয়স যে কম,' ফিসফিস করে বলল মেগ। কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

দরজা খোলার শব্দে সচকিত হল ওরা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকে পড়লেন মার্চ ফুফু। ভূত দেখার মত চমকে উঠল মেগ। ব্রুক পালাল ভেতর দিকে।

'হচ্ছেটা কি এসব!' খেঁকিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। মেঝেতে আছড়ালেন হাতের লাঠিটা।

'উনি বাবার কাছে এসেছেন! আপনাকে দেখে যা ভয় পেয়েছি!' তোতলাতে লাগল মেগ।

'বাবার কাছে এসেছেন?' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন মার্চ ফুফু। বসে পড়লেন চেয়ারে। 'তবে তোমার সঙ্গে এত গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর কিসের? একেবারে লাল হয়ে গেছ দেখছি। ব্যাপারটা বলে ফেল তো, বাছাধন।'

আবার লাঠির আঘাত পড়ল মেঝেতে।

'মিস্টার ব্রুক তাঁর ছাতা নিতে এসেছিলেন,' বলতে শুরু করল মেগ।

'ব্রুক? মানে ওই ছোঁড়াটাকে যে পড়ায়? ও, এবার বুঝেছি। জো ভুলে তোমার বাপের চিঠির বদলে ওর একটা চিঠি আমাকে দিয়ে ফেলেছিল। জোর কাছ থেকে সব শুনেছি। ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছ নাকি?' প্রায় চিৎকার করে কথাগুলো বললেন মার্চ ফুফু। রেগে গেছেন প্রচণ্ড।

'আস্তে বলুন, শুনবে তো,' তাঁকে শান্ত করতে চাইল মেগ। 'মাকে ডেকে দেব?'

'পরে ডেক। আগে আমার কথার জবাব দাও। এই কুক লোকটাকে বিয়ে করতে চাও? চাইলে আমার কাছ থেকে ভবিষ্যতে একটা ফুটো পয়সাও পাবে না। মনে থাকে যেন।'

এবার সরাসরি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার চোখের দিকে চাইল মেগ।

'আমার যাকে ইচ্ছে তাকেই বিয়ে করব, ফুফু,' বলল সে। 'আর আপনার টাকা আপনি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যেতে পারেন।'

ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে চাইলেন ভদ্রমহিলা।

'এত বড় কথা?' গর্জে উঠলেন তিনি। 'এর ফল বুঝবে ভবিষ্যতে। পেটে খাবার না থাকলে ভালবাসা কোত্থেকে আসে দেখব।'

'সেটার ভার আমার ওপরই ছেড়ে দিন।'

চশমা পরে নিলেন মার্চ ফুফু। আপাদমস্তক জরিপ করলেন মেগকে, অবাক হয়েছেন তার এই নতুন রূপ দেখে।

এবার কৌশল বদলে নিলেন ভদ্রমহিলা। নরম গলায় বললেন, 'বোকামি করিস না, মা। তুই বাড়ির বড় মেয়ে, তোর অনেক দায়িত্ব।

সচ্ছল ঘরে বিয়ে না হলে তোর বাপ-মা বোনদের দেখবি কি করে?'

'বাবা-মা মেয়েদের সাহায্য চান না। জন গরীব হলেও তাঁরা ওকে পছন্দ করেন।'

'তোমার বাপ-মা তো অবুঝ।'

'সেই-ই ভাল,' বলল মেগ। অপমানিত বোধ করছে সে। বাবা-মার সমালোচনা শোনার কোন ইচ্ছে তার নেই।

'রুকের আত্মীয় স্বজনদের কি খবর? ওদের টাকা-পয়সা আছে নাকি সবার একই অবস্থা?'

'ওর খুব ভাল কয়েকজন বন্ধু আছে।'

'বন্ধু? আরে বাপু বন্ধুদের দিয়ে হবেটা কি? ওরা তোমাদের খাওয়াবে পরাবে? রুক কাজকর্ম কিছু করছে?'

'এখনও শুরু করেনি। তবে মিস্টার লরেন্স ওকে সাহায্য করবেন বলেছেন।'

'জেমস লরেন্সের কথার কোন ঠিক নেই। তার ওপর ভরসা রাখা যায় না।'

'ব্রুক নিজেই ওর ব্যবস্থা করে নেবে। প্রচুর খাটতে পারে ও। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা ও আমাকে ভালবাসে।'

'তা তো বাসবেই। তোমার আত্মীয়দের টাকা আছে, তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করবে না তো কাকে করবে?'

'বাজে কথা বলবেন না। আমার জন টাকার জন্যে বিয়ে করবে না, আমিও না। খাটনিকে আমরা ভয় পাই না। দুজন মিলে কাজ করব, খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

মার্চ ফুফুর ইচ্ছে ছিল মেগকে কোন বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা কাঁচের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। 'বেশ, তবে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়ো। আর বলে যাচ্ছি আমার কাছে কখনও হাত পাততে এসো না, ব্রুকের বন্ধুদের কাছে যেয়ো,' ক্রুদ্ধ গলায় বললেন তিনি।

মেগের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কারও সঙ্গে দেখা করলেন না।

একা দাঁড়িয়ে রইল মেগ। হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারছে না। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল ব্রুক। তুলে নিল ওর একটা হাত।

'আমি সবই শুনেছি, মেগ। আমার হয়ে কথা বলার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ অবশ্য মার্চ ফুফুকেও জানানো দরকার। তিনি আজ না

এলে জানা হত না তুমি আমাকে নিয়ে ভাব,' এক নিঃশ্বাসে বলল ব্রুক।

'আমিও জানতে পারতাম না,' নরম গলায় বলল মেগ। 'তোমার সম্বন্ধে বাজে কথা সহ্য করতে পারলাম না তো।'

'আমার প্রস্তাবে আর আপত্তি করবে না তো?'

'না, জন,' ফিসফিস করে বলল মেগ। মুখ লুকাল ব্রুকের বুকে।

পনেরো মিনিট পর লঘু পায়ে নিচে নেমে এল জো। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বৈঠকখানার দরজার সামনে। ভেতরে কোন শব্দ হচ্ছে না। মৃদু হাসল ও, সন্তুষ্ট। মনে মনে বলল, 'যাক, ব্রুককে তাড়িয়েছে তাহলে। গল্পটা মেগের মুখে শুনব, হাসা যাবে।'

জো বেচারীর আর হাসা হল না। এক ধাক্কায় ভেজানো দরজাটা খুলে ফেলল সে। তারপর বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানটাতেই। হাঁ হয়ে গেছে মুখ, চোখ জোড়া বিস্ফারিত। প্রেমিক যুগল সোফায় পাশাপাশি বসে রয়েছে। প্রায় দম আটকে আসার জোগাড় জোর। ততক্ষণে সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে মেগ। তবে খুব একটা অপ্রস্তুত মনে হল না ব্রুককে। 'এসো, ভেতরে এসো,' বলল সে।

কোন কথা না বলে ঘুরে দৌড়াল জো। এক ছুটে উঠে এল ওপর। হাঁপাচ্ছে। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তোমরা কেউ নিচে গিয়ে দেখে এসো। ব্রুক আর মেগ কি সব পাগলামি করছে!'

মিস্টার এবং মিসেস মার্চ তখুনি নেমে এলেন বৈঠকখানায়, হন্তদন্ত হয়ে। ওদিকে বেথ আর অ্যামিকে সব জানানো হয়ে গেল জোর। কোথায় ওরা রেগে যাবে তা নয় উল্টো খুশি হয়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে জো সোজা চলে গেল চিলেকোঠায়, বই পড়বে সে।

সেদিন বিকেলে বৈঠকখানায় কি হল জানল না জো, বেথ আর অ্যামি। শুধু এটুকু জানল অনেক কথাবার্তা চালাচালি হয়েছে। ব্রুক তার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে মেগের বাবা-মাকে এবং রাজি করিয়ে ফেলেছে তাঁদের।

সবাই মিলে তৃপ্তির সঙ্গে বিকেলের নাস্তা সারল ওরা। জোও বেশিক্ষণ মুখ ভার করে রাখতে পারল না।

'নানা ঘটনায় কেটে গেল বছরটা,' বললেন মিসেস মার্চ। 'ভালভাবেই কাটল বলা যায়।'

'আগামী বছরটা আরও ভাল কাটবে,' বিড়বিড় করে বলল জো।

'তার পরের বছরটা আরও,' মেগের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল ব্রুক। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এখন সে।

'এতদিন অপেক্ষা করব আমরা? বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে না?' বোনের

বিয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে অ্যামি।

'আমার যে অনেক কিছু শেখা বাকি,' ছোট বোনকে সান্ত্বনা দিল মেগ।

'তুমি কেবল অপেক্ষা করবে, কাজ করব আমি,' বলল ব্রুক। মেগের ন্যাপকিনটা তুলে নেয়ার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করে দিল সে। ওর ভাবসাব দেখে মাথা নাড়ল জো। খানিক বাদে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল লরি। ওকে ঢুকতে দেখে হাঁফ ছাড়ল জো। ওর পক্ষে কথা বলার মত কাউকে পাওয়া গেছে। কিন্তু লরির হাতের দিকে চেয়ে হতাশ হতে হল তাকে। বিশাল এক ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে লরি। তাতে কাগজ সাঁটানো 'মিসেস জন ব্রুক।'

মেগের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে। তোড়াটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'জানতাম ব্রুক তোমাকে পটিয়ে ফেলবেই। ও যা ভাবে তাই করে ছাড়ে।'

'আমার বিয়েতে তুমি বেস্ট ম্যান হবে,' লরির দিকে চেয়ে উজ্জ্বল হাসল ব্রুক।

'ধন্যবাদ,' বলল লরি। 'জো, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? তুমি খুশি হওনি?'

'মেগ আমাদের পর হয়ে যাবে, ব্যাপারটা আমি মানতে পারছি না।'

'পর হবে কেন? বোন তো তোমাদেরই থাকবে। শুধু দাবিদার বাড়ল একজন।'

'প্রিয় বন্ধুকে হারানর জ্বালা তুমি বুঝবে না।'

'আমি তো আছি, জো,' বলল লরি। 'ভাল ছেলে হয়ত নই, কিন্তু সারাজীবন তোমার পাশে পাবে আমাকে, কথা দিচ্ছি।'

'জানি সেটা,' বলল জো। 'তুমিও আমার প্রিয় বন্ধু।'

'তাহলে আর ভাবনা কিসের? সবাই খুশি, তুমি একা গোমড়া মুখে বসে থাকবে কেন? একটু হাসো।'

লরির কথা ফেলতে পারল না জো।

ঘরের এক কোণে বসে নিচু গলায় কথা বলছে মেগ আর ব্রুক। ওদের ছবি আঁকতে ব্যস্ত অ্যামি। সোফায় শুয়ে রয়েছে বেথ, পাশে বসে রয়েছেন বাবা-মা। সবাইকে বড় সুখী আর পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে।

কার্পেটে বসে রয়েছে জো, ওর কোলে মাথা রেখে শুয়েছে লরি। একসঙ্গে কাটানো আনন্দময় মুহূর্তগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসছে ওদের স্মৃতিতে।

***

ভ্যানিটি ফেয়ার

ডব্লিউ. এম. থ্যাকারে

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

জুন মাস, রোদ ঝলমলে চমৎকার এক বিকেল। বড়সড় একটা ফ্যামিলি কোচ থামল এসে চিসউইকের বিশেষ একটি বাড়ির গেটে। গেটটিতে লাগানো রয়েছে পিতলের নেমপ্লেট। তাতে লেখা:

অ্যাকাডেমি ফর ইয়াং লেডিস,
হেডমিস্ট্রেস, মিস পিঙ্কারটন

কোচোয়ানের পাশে বসে থাকা নিগ্রো কাজের লোকটি নেমে এসে বেল বাজাল। অমনি ছোট আকারের জানালাগুলো দিয়ে উঁকি মারল এক ঝাঁক মাথা। আর মিস জেমিমা পৌঁছে গেলেন মিস পিঙ্কারটনের নিজস্ব ড্রইংরুমে।

'মিসেস সেডলির কোচ এসে গেছে, সিস্টার,' ঘোষণা করলেন মিস জেমিমা। 'নিগ্রো চাকরটা এইমাত্র বেল বাজাল।'

'মিস সেডলিকে তৈরি রেখেছেন তো?' জানতে চাইলেন মিস পিঙ্কারটন। তাঁর কথায় স্পষ্ট ফুটে উঠল হেডমিস্ট্রেস-সুলভ গাম্ভীর্য।

'ইয়েস, সিস্টার। মেইডরা আজ ভোর চারটেয় উঠে ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছে। আর আমি ওর ট্রাঙ্কে আপনার চিঠি, বিল আর ডক্টর জনসন্স ডিকশনারি দিয়ে দিয়েছি।'

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা নাড়লেন মিস পিঙ্কারটন।

'সিস্টার,' ভীরু গলায় ডাকলেন মিস জেমিমা, 'আমরা কি...মানে আপনি বললে...আমি...বেকি শার্পকেও এককপি ডিকশনারি দেব? ও-ও তো আজ চলে যাচ্ছে, সেডলিদের সঙ্গে একটা সপ্তাহ কাটাবে।'

'মিস জেমিমা!' গর্জে উঠলেন মিস পিঙ্কারটন, 'আপনার বোধবুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? বেকি শার্পকে ডিকশনারি দেব? কক্ষনো নয়!'

'আমি বলছিলাম কি, সিস্টার,' নরম গলায় বোঝাতে চাইলেন মিস জেমিমা, 'দাম তো বেশি নয়। মাত্র দুশিলিং নয় পেন্স। বেচারী হয়ত আশা করে রয়েছে, না পেলে মনে দুঃখ পাবে। স্কুল ছাড়ার সময় সব মেয়েই তো একটা করে পায়।'

'আর কোন কথা নয়,' বরফ শীতল কণ্ঠে বললেন মিস পিঙ্কারটন।

মিস অ্যামেলিয়া সেডলির বাবা লণ্ডনের একজন প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী। ওদিকে মিস বেকি শার্প নিতান্তই দরিদ্র এক মেয়ে। ফরাসী ভাষা শিখিয়ে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হয় তাকে। মিস পিঙ্কারটনের ধারণা বেকিকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন তিনি। কাজেই বিদায় উপহার হিসেবে ডিকশনারি প্রাপ্য হয় না তার। অ্যামেলিয়া তাঁর অতি প্রিয় ছাত্রী। আর একথা সবাই জানে যে রেবেকা অর্থাৎ বেকিকে পছন্দ করেন না হেডমিস্ট্রেস।

এ গল্পে অ্যামেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাঠকদের সঙ্গে এবার তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। মিষ্টি স্বভাবের এই মেয়েটিকে ভালবাসে প্রত্যেকে। ওর চোখজোড়া বড় মায়াময়, সবার প্রতি ভালবাসায় টইটম্বুর। অবশ্য মাঝে মধ্যে মন খারাপ হলেও ছলছল করতে থাকে তার দু চোখ। মরা পাখি বা ইঁদুরও অনেক সময় কাঁদিয়ে ছাড়ে তাকে। আর কেউ একটু কড়া কথা বললে তো কথাই নেই, কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে বান্ধবী পরিবেষ্টিত অ্যামেলিয়া। বান্ধবীরা কাঁদছে। বলাবাহুল্য, অ্যামেলিয়াও। প্রচুর ফুল আর উপহার সামগ্রী পেয়েছে সে, ওগুলো রাখা হয়েছে কোচে, তার ট্রাঙ্কগুলোর পাশে। ওগুলোর পাশে রয়েছে আরও একটি ট্রাঙ্ক। বহু পুরানো, চামড়ার তৈরি। ওতে লেখা 'মিস রেবেকা শার্প।'

এবার সেই মেয়েটিও নেমে এল নিচে। একা। তার বাহুতে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালেন মিস জেমিমা।

'বেকি,' বললেন তিনি, 'মিস পিঙ্কারটনের কাছ থেকে বিদায় নেবে না?'

'নেয়া উচিত বোধ হয়,' বলল বেকি। মিস পিঙ্কারটনের দরজায় টোকা দিল সে, ঢুকে পড়ল। বিশুদ্ধ ফরাসি উচ্চারণে বলল, 'মিস পিঙ্কারটন, আমি চলে যাচ্ছি।'

মিস পিঙ্কারটন ফরাসি বোঝেন না। কিন্তু সে কথা স্বীকার করতেও রাজি নন, অহং-এ লাগে তাঁর। বিশেষ করে এই মেয়েটির সামনে তো বটেই।

'গুড মর্নিং, মিস শার্প,' ঠাণ্ডা শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। অ্যামেলিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি। আদর করে চুমু খেলেন।

'ঈশ্বর তোমার ভাল করুন, মা,' উষ্ণ গলায় বললেন মিস পিঙ্কারটন। অ্যামেলিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে চকিতে চাইলেন বেকির দিকে, বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে। ব্যাপারটা লক্ষ করলেন মিস জেমিমা, হাত ধরে টানলেন বেকিকে।

'যাবে এসো,' বললেন তিনি। ওকে নিয়ে চললেন সেডলিদের কোচের দিকে। বেকির বিদায়ে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলল না কেউ।

কান্নারত অ্যামেলিয়া শেষমেশ বিদায় নিল বান্ধবীদের কাছ থেকে। নিগ্রো লোকটি বন্ধ করে দিল ক্যারিজের দরজা। তারপর লাফিয়ে উঠে বসল কোচোয়ানের পাশে।

'হেট হেট,' ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল কোচোয়ান, চাবুক চালাল।

'দাঁড়াও,' চিৎকার করলেন মিস জেমিমা। একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে ছুটে এলেন ক্যারিজের কাছে।

'এতে কটা স্যাণ্ডউইচ আছে,' অ্যামেলিয়াকে বললেন তিনি। 'পথে খিদে লাগতে পারে। আর বেকি, এই বইটা সিস্টার তোমাকে...এটা...ডক্টর জনসন্স ডিকশনারি...নিয়ে যাও। গুডবাই, ভাল থেকো।' নরমমনা মিস জেমিমা দাঁড়িয়ে রইলেন বাগানে, আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি।

চলতে শুরু করল কোচ, জানালা গলিয়ে মাথা বার করল মিস শার্প। বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিল বইটা। ঠিক মিস জেমিমার পায়ের কাছে এসে পড়ল ওটা। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রায় মূর্ছা যাওয়ার দশা হলো ভদ্রমহিলার।

ক্যারিজ ততক্ষণে চলে গেছে অনেকটা দূরে। স্কুলের বিশাল লোহার গেটগুলো বন্ধ হয়ে গেল। স্কুল ছাড়ল মেয়ে দুটি। পা বাড়াল নতুন জীবনের পথে।

দুই

ডিকশনারিটা ছুঁড়ে দেয়ার পর ওটা হতচকিত মিস জেমিমার পায়ের কাছে পড়তেই হাসি ফুটল বেকির ফ্যাকাসে মুখে। নিজের আসনে আয়েশ করে বসল এবার সে। সন্তুষ্ট।

'ডিকশনারির গুষ্টি মারি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! চিসউইক ছাড়তে পেরে জানে বাঁচলাম,' একটানা বলল সে।

'বেকি, অমন কাজটা করলে কিভাবে?' জানতে চাইল অ্যামেলিয়া। বেকির কাণ্ড দেখে মিস জেমিমার চেয়ে সে-ও কম অবাক হয়নি।

'জায়গাটা আমার অসহ্য লাগত! ওখানকার সবাইকে আমি ঘৃণা করি,'

বলে উঠল ক্রুদ্ধ বেকি। 'ওদের মুখ জীবনেও আর দেখতে চাই না। চাকর বাকরদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার পেয়েছি। তুমি ছাড়া আর কোন বন্ধু ছিল না সব শত্রু। বাচ্চা মেয়েদের ফ্রেঞ্চ পড়াতে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে। মাতৃভাষাটার ওপর পর্যন্ত ঘেন্না ধরে গেছে। মিস পিঙ্কারটন মরলে খুশি হই আমি,' দম নেয়ার জন্যে সামান্য থামল বেকি। তারপর ক্রূর হেসে আবার বলতে শুরু করল, 'মিস পিঙ্কারটনকে ফ্রেঞ্চ পড়াতে গেলেই চিত্তির। একটা বর্ণও বুঝত না. মেয়েলোকটা। সেজন্যেই বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে আমাকে। জিন্দাবাদ ফ্রেঞ্চ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ! বোনাপার্ট জিন্দাবাদ!'

'ছিঃ, রেবেকা,' অ্যামেলিয়া শান্ত করতে চাইল বান্ধবীকে। ইংল্যাণ্ড তখন ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তখন ফ্রান্সের সম্রাট। সেসময় 'ফ্রান্স জিন্দাবাদ!' বা 'বোনাপার্ট জিন্দাবাদ!' বলার অর্থ, 'শয়তানের জয় হোক!'

'রেবেকা, তোমার এত আক্রোশ কিসের?' জানতে চাইল অ্যামেলিয়া।

'আক্রোশ থাকাটা খুব স্বাভাবিক,' জবাব দিল রেবেকা। 'আমি তো আর দেবদূত নই।' রেবেকা কিন্তু সত্যি কথাটাই বলল। আসলেই সে খুব একটা সুবিধের মেয়ে নয়।

রেবেকার অভিযোগ, কেউ তাকে দেখতে পারে না। কিন্তু সেও যে কাউকে পছন্দ করে না এ কথাটা একবারও মাথায় আসে না তার। পৃথিবীটা আয়নার মত। নিজেদের মুখচ্ছবি ফুটে ওঠে সেখানে। আমরা ভ্রূ কুঁচকালে অথবা হাসলে প্রত্যুত্তরে ঠিক তেমনটিই দেখতে পাই। বান্ধবীদের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা বেকির মনে। তার জীবনের গোড়ার দিককার বছরগুলোর দিকে চাইলে আমরা অবশ্য এর কারণও পেয়ে যাব।

বেকির বাবা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন ব্যর্থ চিত্রশিল্পী। মিস পিঙ্কারটনের অ্যাকাডেমিতে ড্রইং শেখাতেন ভদ্রলোক। বুদ্ধিমান, হাসিখুশি মানুষটি প্রায়ই মদে চুর হয়ে থাকতেন। প্রচুর দেনা ছিল তাঁর। বিয়ে করেছিলেন এক ফরাসি তরুণীকে, যাঁর পেশা ছিল অভিনয়। বেকি অবশ্য কখনও স্বীকার করে না সে কথা। বলে বেড়ায় তার মা ফ্রান্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে।

রেবেকাকে খুব ছোট অবস্থায় রেখেই মারা যান তার মা। ক' বছর বাদে বাবাও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মিস পিঙ্কারটনকে তিনি অনুরোধ করলেন মেয়েকে দেখাশোনা করতে। রেবেকার যখন সতেরো বছর বয়স তখন মারা গেলেন বাবা। মিস পিঙ্কারটন রেবেকাকে স্কুল শিক্ষিকার কাজ

দিলেন। ফরাসি ভাষা শেখাবে সে। বিনিময়ে পাবে বিনে পয়সায় থাকার, খাওয়ার আর পড়ার সুবিধে।

রেবেকা বরাবরই ছোট, হালকা-পাতলা, দুর্বল গড়নের মেয়ে। তার সমস্ত সৌন্দর্য জমা হয়েছে চোখজোড়ায়। সবুজ চোখ দুটো মানুষকে অসম্ভব আকর্ষণ করে। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় রেবেকাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে হয়। তবে একথা ঠিক, ওইসব মেয়েদের চেয়ে জীবন সম্পর্কে ইতোমধ্যেই অনেক বেশি জানা হয়ে গেছে রেবেকার। বাবার পাওনাদারদের সঙ্গে অসংখ্যবার বোঝাপড়া করতে হয়েছে তাকে। তাদের বলতে হয়েছে এ মুহূর্তে ঋণ শোধ করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে, ভবিষ্যতে অবশ্যই সে সবার পাওনা মিটিয়ে দেবে। মাতাল বাবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমালে অনেক অসংলগ্ন, অশ্লীল কথা কানে এসেছে, ওর বয়সী অন্যান্য মেয়েরা যা কল্পনাও করতে পারে না।

স্কুলের জীবন অসহ্য ঠেকত বেকির। হেডমিস্ট্রেসের মিথ্যে অহংকার, মিস জেমিমার ভালমানুষী; সিনিয়র মেয়েদের ফালতু কথাবার্তা– সব অসহ্য তার কাছে। অ্যামেলিয়া ছাড়া আর কাউকে ভাল লাগত না তার। (কে না পছন্দ করে তাকে?) অন্য মেয়েদের হিংসে করত রেবেকা। ওদের বাবার টাকা আছে কিনা তাই। ওই 'জেলখানা' থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরোনোর জন্যে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল সে।

তবে সুযোগ একটা এসেওছিল। সঙ্গীতে ওর ঝোঁক আছে জেনে মিস পিঙ্কারটন ওকে বলেছিলেন গান শেখাতে। কিন্তু প্রস্তাবটায় রাজি হয়নি বেকি।

'আমার কাজ ফ্রেঞ্চ শেখানো,' বলেছে সে, 'গান শেখানো নয়। আপনার পয়সা বাঁচাতে ঠেকা পড়েনি আমার। পয়সা ছাড়ুন, শেখাব। পয়সা দেবেন না, আমিও নেই।'

'এতবড় স্পর্ধা তোমার?' রাগে লাল হয়ে গেছে মিস পিঙ্কারটনের মুখ। পাত্তাই দিল না বেকি, হাসল।

'পয়সা দিন নইলে আমাকে যেতে দিন,' বলল সে। 'কোন ভদ্রলোকের বাসায় গভর্নেসের কাজ খুঁজে দিতে পারেন কিনা দেখুন।' তার বেয়াড়াপনা দিনকে দিন বেড়েই চলল। হাল ছেড়ে দিলেন মিস পিঙ্কারটন। স্যার পিট ক্রলির বাড়িতে গভর্নেসের কাজ জুটিয়ে দিলেন বেকিকে। তবে কাজে যোগ দেয়ার আগে অ্যামেলিয়াদের বাড়িতে একটা সপ্তাহ কাটিয়ে যাবে ও।

কোচ ইতোমধ্যে রাসেল স্কয়্যারে সেডলিদের বাড়ির গেটে পৌঁছে গেছে। বাড়ির মেয়েকে অভ্যর্থনা জানাতে হল-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে কাজের

লোকেরা। অ্যামেলিয়া আর বেকিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন মিস্টার ও মিসেস সেডলি।

অ্যামেলিয়া বান্ধবীকে বাড়ির সব কটা ঘর এবং তার নিজস্ব জিনিসপত্র– বই, পিয়ানো, কাপড়-চোপড়, গয়না সব দেখাল।

বোনের জন্যে জোস সেডলি ভারত থেকে যে শালটা নিয়ে এসেছে সেটা দেখে না বলে পারল না বেকি, 'ভাই থাকাটা ভাগ্যের ব্যাপার।' ওর কথা শুনে মুখ কালো হয়ে গেল অ্যামেলিয়ার। এতিম, নিঃসঙ্গ বান্ধবীটির জন্যে মনটা বড্ড পোড়ে তার।

'তোমার ভাই খুব বড়লোক, তাই না?' জানতে চাইল বেকি।

'আমার তো তাই ধারণা,' জবাব দিল এমি।

'তোমার ভাবীটা কি খুব সুন্দরী?'

'ভাবী? জোসেফ তো বিয়েই করেনি,' হেসে ফেলল অ্যামেলিয়া।

মুহূর্তে চুপ করে গেল বেকি। দ্রুত চিন্তা চলছে তার মনে। 'জোসেফ সেডলি বড়লোক এবং অবিবাহিত। আমি ওকে বিয়ে করি না কেন? এখানে মাত্র এক সপ্তাহ থাকার সুযোগ পাচ্ছি। সময়টা একটু কমই হয়ে গেল, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

বেকিকে দোষ দেয়া যায় না। এমন চিন্তা সে করতেই পারে। ওকে দেখার কেউ নেই। নিজে চেষ্টা না করলে বিয়ের ভাগ্য হয়ত কোনদিনই হবে না তার। বিয়েটা তো আর মুখের কথা নয়! তার হয়ে ঝক্কি পোহাবে কে?

জোসেফ সেডলি বোনের চাইতে বারো বছরের বড়। ভারত থেকে ছুটিতে সদ্য বাড়ি এসেছে সে। ট্যাক্স অফিসার হিসেবে কাজ করছে ভারতে। অলস আর পেটুক মানুষ বলে পরিচয় তার। দেহখানাও দশাসই। অবশ্য নিজের বিশাল বপুটি খুব একটা পছন্দ নয় তার। মাঝে মধ্যেই ওজন কমানোর জন্যে মরীয়া হয়ে ওঠে সে কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ অলসতা বারবার একাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। খেতে বড় ভালবাসে জোসেফ, সে কথা আগেই বলেছি। ফলে অনেক চেষ্টা করেও বিপুল খাবারের পরিমাণ কমাতে ব্যর্থ হয়েছে ও। অন্যান্য মোটা মানুষদের মত সেও আঁটোসাঁটো পোশাক পরতে ভালবাসে। তাছাড়া তার কাপড় চোপড় আবার বাহারী রঙের আর কেতাদুরস্তও হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে তরুণীদেরও হার মানিয়ে দেয় সে। সম্ভবত মিথ্যে অহংকার তাকে লাজুক আর উদ্যমহীন করে দিয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে জোসেফকে জয় করা রেবেকার জন্যে খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়।

তিন

দুবান্ধবী বাড়ি পৌঁছানোর দু দিন পর বাড়ি এল জোসেফ সেডলি। রেবেকা হতাশা চেপে রেখে কাজে নেমে পড়ল। ইতোমধ্যেই অ্যামেলিয়ার বাবা-মার মন কেড়ে নিয়েছে সে। মিস্টার সেডলি ওর ওপর অত্যন্ত খুশি। তাঁর প্রতিটি কৌতুকেই হেসে কুটিকুটি হয় বেকি। বাসার প্রত্যেকের ধারণা তার মত লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না। জোসেফও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমবার যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চাইল বেকি তখন বুকের ভেতর ঢোলের বাড়ি অনুভব করল জোসেফ। ওর লাল মুখটা আরও বেশি রক্তিমবর্ণ ধারণ করল।

'বেকি এখানে আরও এক সপ্তাহ থাকলে ভাল হত,' বলল অ্যামেলিয়া। সম্মতি জানাল জোসের মুখখানা। তক্ষুণি ছুটি বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠানো হলো স্যার পিট ক্রলিকে। সেদিন সন্ধেয় দু বান্ধবীকে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাল জোস। ভক্সহল-এ পার্টি হবে। সবাই মেতে উঠল আনন্দে।

'এমিকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে একজন পুরুষ মানুষ দরকার,' বললেন মিস্টার সেডলি, 'জর্জ অসবর্নকে খবর পাঠাব?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। মৃদু হাসলেন মিসেস সেডলি। লজ্জায় লাল হলো অ্যামেলিয়া।

ডিনারে এল জর্জ অসবর্ন। ডিনার শেষে সবাই যখন ভক্স-হলের উদ্দেশে রওনা দেবে ঠিক তখুনি শুরু হলো ঝড়। ওরা চারজন বাড়িতেই থাকবে ঠিক করল।

জর্জ অসবর্ন এখন লেফটেন্যান্ট অসবর্ন মিস্টার সেডলির ধর্মপুত্র সে। এই তেইশ বছরের জীবনে সব সময়ই সেডলি পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসেবে গণ্য হয়েছে ও। জোসেফের আর অ্যামেলিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার। অ্যামেলিয়া ভালবাসে এই সুদর্শন অফিসারটিকে। জর্জও প্রেমে পড়েছে সুন্দরী অ্যামেলিয়ার। সেডলি আর অসবর্ন, দুটি পরিবারেরই সম্মতি রয়েছে তাদের ব্যাপারে। ভবিষ্যতে দুজনের বিয়ে হবে, এমনটিই ভেবে রেখেছেন ওদের অভিভাবকরা।

'অ্যামেলিয়া, পিয়ানোটা আমাদের জন্যে বাজাবে?' জানতে চাইল জর্জ। হাত ধরে অ্যামেলিয়াকে আবছায়া ড্রইংরূমের পেছন দিকটাতে নিয়ে

গেল ও, পিয়ানোটা রয়েছে ওখানে। ফলে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেল জোসেফ আর রেবেকা।

'পারিবারিক ব্যাপার জানতে চাই না,' বলল রেবেকা, 'তবে ওরা দুজন সব ফাঁস করে দিয়েছে।'

'জর্জ ক্যাপ্টেন হয়ে গেলেই বোধহয় ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে। দারুণ ছেলে ও।'

'আপনার বোনেরও তো তুলনা নেই। ভদ্রলোক সত্যিই ভাগ্যবান,' দীর্ঘশ্বাস পড়ল বেকির।

অবিবাহিতা কোন মহিলা যখন অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনা করে তখন আপনা থেকেই তাদের মধ্যে আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। অদৃশ্য এক সুতো যেন কাছে এনে দেয় দুটি মানুষকে। জোসেফও ব্যাপারটা অনুভব করল। জীবনে এই প্রথমবারের মত সে নির্দ্বিধায় এবং নিঃসংকোচে বিপরীত লিঙ্গের কারও সঙ্গে আড্ডা জমাতে পারল। বেকি ভারত প্রসঙ্গে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল; তাতে সুবিধেই হলো জোসেফের। নিজের জ্ঞান সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা দেয়ার সুযোগ জুটে গেল তার। দারুণ খুশি হয়ে উঠল ও।

'জোস খুব ফুর্তিতে আছে মনে হচ্ছে,' ফিসফিস করে অ্যামেলিয়াকে বলল জর্জ। 'তোমার বান্ধবী দারুণ দেখাল!'

'ভালই তো,' পাল্টা ফিসফিসিয়ে বলল অ্যামেলিয়া। অধিকাংশ মহিলার মত সে-ও মনে মনে জোড়া তৈরি করে। ঘরে ভাবী এলে যারপরনাই খুশি হবে সে।

এ সময় এলেন মিস্টার ও মিসেস সেডলি। ওরা চারজন তখন আনন্দে মাতোয়ারা, টেরই পেল না ওঁদের উপস্থিতি।

'আপনার গলাটা বড় চমৎকার, মিস শার্প! ও গানটা এত সুন্দর করে আর কাউকে গাইতে শুনিনি,' বলল জোস।

'বেশ, জোস! চালিয়ে যাও,' বললেন মিস্টার সেডলি। ছেলেকে খুঁচিয়ে মজা পান তিনি। বাবার গলা শুনে বোবা বনে গেল জোস, তক্ষুণি পালাল বাড়ি ছেড়ে।

ঠিক হলো পরদিন রাতে ভক্সহলে যাবে ওরা। রেবেকাকে চুমু খেল অ্যামেলিয়া, গুডনাইট জানাল।

'দেখবে জোস কাল মুখ খুলবে,' ফিসফিস করে বলল অ্যামেলিয়া।

সে রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে নিজের মনেই বলল জোস, 'কাল ভক্সহলে প্রশ্নটা করব।'

পরদিন সকালে সেডলিদের বাসায় এল জর্জ অসবর্ন। সে জানতে চায় তার বন্ধু উইলিয়াম ডবিনকে ডিনারের জন্যে সঙ্গে করে আনতে পারবে কিনা। সানন্দে মত দিলেন মিস্টার সেডলি।

উইলিয়াম ডবিন জর্জের পুরানো বন্ধু। স্কুলে সহপাঠী ছিল, এখন একই রেজিমেন্টে কাজ করে। স্কুল জীবনে ডবিনের ধারণা ছিল জর্জের মত চালাক, সাহসী আর সুদর্শন ছেলে দুনিয়ায় আর দুটো নেই। জর্জের অসম্ভব ভক্ত সে। জর্জ অবশ্য লাজুক এবং খানিকটা বোকা ধরনের ডবিনকে নিয়ে মজা করতে ছাড়ে না। তবে এ কথা ঠিক, তার প্রতি আকর্ষণের জন্যে ডবিনকে পছন্দও করে। তাছাড়া ডবিন এমন একজন মানুষ যে বন্ধুর জন্যে সব কিছুই করতে রাজি।

'ও চমৎকার সৈনিক, যোগ্য অফিসার– তবে দেখতে একেবারে সাদামাঠা,' সেদিন সকালে মেয়েদের উদ্দেশে বলল জর্জ। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখল ও, সন্তুষ্টির হাসি হাসল।

সেদিন সন্ধ্যায় লঘু পায়ে নিচে ড্রইংরুমে নেমে এল অ্যামেলিয়া। পরনে তার সাদা মসলিন, কণ্ঠে গান। তাজা গোলাপের মত পবিত্র দেখাচ্ছে ওকে। ড্রইংরুমে ও একজন ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখতে পেল। ভদ্রলোক আর কেউ নয়, ক্যাপ্টেন ডবিন। সে এঘরে বসে রয়েছে জানলে অ্যামেলিয়া কখনই গান গাইতে গাইতে নেমে আসত না। ওর মিষ্টি গলা সোজা গিয়ে ঢুকেছে ডবিনের হৃদয়ে।

বাউ করল ডবিন, কিছুটা অপ্রস্তুত। অ্যামেলিয়া যখন করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল তখন হ্যাটটা খসে পড়ল ডবিনের হাত থেকে।

'তুমিই কি সেই ছোট্ট মেয়েটা? জর্জ অসবর্ন তোমাকেই বিয়ে করবে? সত্যিই কপাল ওর!' মনে মনে বলল সে।

জর্জ আর জোস এল মিনিট কয়েক বাদে। ডিনার শেষে ভক্সহলের উদ্দেশে রওনা দিল উদ্দীপ্ত পাঁচ যুবক যুবতী।

চার

ভক্সহলে পৌঁছে ক্যারিজ থেকে নেমে এল জোস। তার দেহভার মুক্ত হওয়ার সময় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে উঠল ক্যারিজটা। বিশালদেহী জোস অতি সহজেই মানুষজনের দৃষ্টি কেড়ে নিল। রোগা এক তরুণীকে বগলবন্দী

করে রেখেছে সে, ব্যাপারটা সবার কাছেই কৌতুককর। জর্জ আর অ্যামেলিয়া পাশাপাশি হাঁটছে। চমৎকার মানিয়েছে ওদের। ফুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছে অ্যামেলিয়াকে।

'ডবিন,' বলল জর্জ, 'শালগুলো তোমার জিম্মায় থাকুক।' মিস সেডলিকে নিয়ে গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল ও। কোনমতে জায়গা করে নিয়ে গেট পেরল জোসেফ। রেবেকাকে নিয়ে এল ওদের পেছন পেছন। সবার শেষে এল ডবিন, শালগুলো বইছে। সবার হয়ে গেটে পয়সা মেটাতে হলো তাকেই। ইচ্ছে করেই দূরে দূরে থাকল সে। অন্যদের মাঝে নাক গলিয়ে বিরক্ত করতে চাইল না। জোসেফের আর রেবেকার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ অনুভব করছে না সে। তার সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অ্যামেলিয়া আর জর্জ। অ্যামেলিয়াকে খুশি দেখে ভরে উঠল ওর মন।

ভিড়ের মধ্যে সহজেই হারিয়ে গেল দু জোড়া নারী-পুরুষ। কিন্তু পরে আবার মিলিত হলো সাপারের টেবিলে। ডবিন লক্ষ করল টেবিলে চারজনের জন্যে খাবার সাজানো হয়েছে, ফলে সরে গেল সে। ওরা চারজন গল্পে মশগুল। ডবিনের কথা মনেই রইল না তাদের। ডবিনের মনে হলো তার অস্তিত্বই যেন নেই এই পৃথিবীতে। তবে সেজন্যে কিছু মনে করল না ও।

এ মুহূর্তে জোসের বাহাদুরীর শেষ নেই। বেয়ারাদের কর্তৃত্বের সুরে অর্ডার দিয়ে চলেছে সে। খাবার আর পানীয়ের বেশিরভাগটাই গেল তার পেটে। এরপর এক বাটি পানশ আনানোর জন্যে চাপাচাপি শুরু করল সে।

'ভক্সহলে এলে সবাই পানশ খায়,' যুক্তি দেখাল জোস। তার কথায় আনানো হলো পানশের বাটি। ওটা স্রেফ বিপদ নিয়ে এল। মেয়েরা পানশ খায় না, অসবর্নও পছন্দ করে না। ফলে পেটুক জোসেফ নিজেই পুরো বাটিটা সাবড়ে দিল। খানিক বাদেই স্পষ্ট বোঝা গেল ওষুধে ধরেছে। পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেছে জোসেফ। চিৎকার করে গান গাইতে লাগল সে। উৎসাহী লোকের ভিড় জমতেও সময় লাগল না। আকাশ থেকে যেন পতন হলো জোসের, বেকি শার্পের সমস্ত আশাও সেদিনকার মত ধুলোয় লুটাল।

'থামবে তুমি!' গর্জে উঠল জর্জ, 'চলো সবাই।' মেয়েরা দাঁড়িয়ে পড়ল তক্ষুণি, যাওয়ার জন্যে তৈরি। কিন্তু জোসেফকে নড়ায় কার সাধ্য! সিংহের তেজ এসে গেছে তার মধ্যে। এক হাতে বেকির কোমর পেঁচিয়ে ধরল সে, যেতে দেবে না ওকে।

'যেয়ো না, সোনামণি,' অনুরোধ করল জোস।

জোসের হাত ছাড়িয়ে সরে যাওয়ার জন্যে রীতিমত কসরৎ করতে হলো রেবেকাকে। জনতার অট্টহাসির বেগ আরও বাড়ল এতে। ওদিকে তখনও চিৎকার করে গান গেয়ে চলেছে জোস। হঠাৎই সে হাতের গেলাসটা নাড়তে লাগল, সবাইকে মদপানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যার ইচ্ছে সে-ই তার সঙ্গে বসে মদ খেতে পারে। উৎসাহী সঙ্গীর অভাব হলো না। কয়েকজন আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। তাদের ফেরাতে ব্যর্থ হলো জর্জ। সৌভাগ্যক্রমে ক্যাপ্টেন ডবিন এগিয়ে এল এসময়।

'আপনারা দূর হন এখান থেকে!' বলল সে। উত্তেজিত জনতার মধ্য দিয়ে ঠেলে পথ করে নিল ও। লোকজন ওর ইউনিফর্ম ও ক্রুদ্ধ চাহনি দেখে একে একে কেটে পড়ল।

'কোথায় ছিলে, ডবিন?' জানতে চাইল জর্জ অসবর্ন, বন্ধুর হাত থেকে কেড়ে নিল সাদা শালটা, পরিয়ে দিল অ্যামেলিয়াকে।

'একটু হাত লাগাও তো,' বলল জর্জ। 'জোসকে সামলাও। আমি ওদেরকে ক্যারিজে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ডবিনের ওপর জোসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনার গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিল জর্জ। আর নিজে মেয়েদের নিয়ে হাজির হয়ে গেল বাড়িতে।

দু বান্ধবী সোজা গেল বিছানায়।

'কাল নিশ্চয়ই প্রস্তাব দেবে,' ভাবল রেবেকা। 'আমাকে ও চারবার "সোনামণি", বলে ডেকেছে। অ্যামেলিয়ার সামনে হাতও চেপে ধরেছে। আগামীকাল বিয়ের প্রস্তাব পাচ্ছিই।' অ্যামেলিয়ার ভাবনাও বান্ধবীর অনুরূপ।

দুজনেই ভুল কল্পনা করল। পরদিন সকালে জোস তখন সোফায় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর গোঁ গোঁ করছে। ওকে দেখতে এল জর্জ। অবশ্য ও পৌঁছনোর আগেই এসেছে ডবিন, সাধ্যমত চেষ্টা করছে জোসের মাথা ব্যথা দূর করতে।

'কেমন আছ, জোস?' প্রশ্নটা করেই হাসিতে ফেটে পড়ল জর্জ। 'খুব দেখালে!' তারপর জোসের গতকালকের কাণ্ডকারখানাগুলো আরও বেশি রঙ চড়িয়ে শোনাতে লাগল। জোসকে নির্বোধ লোক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে। ও চায় জোসকে অস্বস্তিতে ফেলতে, নিজের অপকর্মের জন্যে লজ্জা পেতে শেখাতে। আরও একটা উদ্দেশ্যও অবশ্য আছে ওর। গত রাতটা চিন্তায় চিন্তায় কেটেছে তার। জোস যদি বেকি শার্পকে বিয়ে করে বসে তবে? ও এমন কি মেয়ে? সামান্য একজন গভর্নেস

বই তো নয়। যে পরিবারে লেফটেন্যান্ট অসবর্ন বিয়ে করতে চলেছে সেখানে এ মেয়ে বড়ই বেমানান।

'সবাইকে হাসিয়ে মেরেছ তুমি,' অসুস্থ জোসকে শোনাল জর্জ। 'ওই গানটার কথা মনে নেই? গাও না আরেকবার– '

'কোন্ গান? কিসের গান?' জানতে চাইল জোস। কপাল টিপে ধরে রেখেছে।

'ওই যে প্রেমের গানটা গাইছিলে...রোসা...রেবেকা...কি যেন নাম মেয়েটার? আরে সোনামণি বলে ডাকছিলে যাকে–' জর্জ চেপে ধরল ডবিনের একটা হাত। তারপর অভিনয় করে দেখাল কালকের দৃশ্যটা। আঁতকে উঠল আসল নায়ক।

'ওকে নিয়ে তো খুব মজা করলে,' বন্ধুকে বলল ডবিন, জোসের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর।

'করবই তো। ভক্সহলে আমাদেরকে সবার সামনে হাসির খোরাক বানিয়েছে। এই গভর্নেস মেয়েলোকটা, যাকে ও বিয়ে করতে চায় সে কোথাকার কে? কোন পরিচয় নেই ওর। আমি চাই কোন ভদ্রঘরের মেয়ে ও বাড়ির বউ হোক।'

পরদিন জোস একটা চিঠি লিখল অ্যামেলিয়াকে। ওতে লেখা:

'প্রিয় অ্যামেলিয়া,

আমি আজই চেলটেনহ্যাম চলে যাচ্ছি। মিস শার্পের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি আমি। ভক্সহলের সন্ধেটার কথা যেন ভুলে যান উনি।

তোমারই,
জোস।'

কাঁচের মত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল রেবেকার সমস্ত আশা আর পরিকল্পনা। ওর মলিন মুখটার দিকে চাইতে সাহস হচ্ছে না অ্যামেলিয়ার। বান্ধবীর কোলে চিঠিটা ফেলে দিয়ে এক ছুটে ঘরে চলে গেল ও। কেঁদে কেটে হালকা করল নিজেকে। ওদিকে জর্জ অসবর্নের প্রতি তীব্র ক্ষোভে দগ্ধ হতে লাগল রেবেকা। সে অনুভব করল, সব নষ্টের গোড়া অ্যামেলিয়ার এই প্রেমিকটি।

'একদিন এর প্রতিশোধ নেব,' শপথ করল সে।

পাঁচ

কদিন পর রাসেল স্কয়্যার ছেড়ে ক্রলিদের বাড়িতে যেতে হলো বেকিকে, কাজে যোগ দেয়ার জন্যে। স্যার পিট ক্রলির গ্রামের বাড়ি ওটা। বিদায় নেযার সময় অ্যামেলিয়াকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদল বেকি, তবে আবার সামলেও নিল দ্রুত। চোখের পানি মুছে ভাবতে লাগল, কেমন হতে পারে তার নতুন আবাসস্থল আর তার লোকজন।

'স্যার পিট ক্রলি দেখতে কেমন হবেন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল ও। 'কর‍্যানিট পরে থাকেন নাকি ভদ্রলোক? নিশ্চয়ই আজ ধোপদুরস্ত পোশাক পরে থাকবেন। আমার সঙ্গে চাকরানীর মত ব্যবহার করবেন হয়ত। যাকগে, অসুবিধা নেই! ভদ্রলোকদের সঙ্গে তো অন্তত থাকতে পারব। শহুরে, ফালতু লোকজনদের অসহ্য লাগে আমার।'

'শহুরে, ফালতু লোকজন' বলতে ও বোঝে রাসেল স্কয়্যারের বাসিন্দাদের। ওদেরকে এখন দু চোখে দেখতে পারে না সে।

স্যার পিট ক্রলি একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ। রেবেকার কল্পনার সঙ্গে একরত্তি মিল নেই তাঁর। এ ব্যাপারে প্রমাণ হচ্ছে অ্যামেলিয়ার কাছে লেখা রেবেকার প্রথম চিঠিটি।

'প্রিয় অ্যামেলিয়া,

আমাদের কল্পনার সঙ্গে কোন মিলই খুঁজে পাইনি স্যার পিট ক্রলির। বুড়ো মতন এক লোক তিনি। খাটো। নোংরা এবং ফালতু ধরনের মানুষ। সর্বক্ষণ মলিন পোশাক পরে রয়েছেন, আর ঠোঁটে ধরা রয়েছে জঘন্য একটা পাইপ। কাজের লোকদের চেয়েও বাজে ওঁর ইংরেজি। মুখও খুব খারাপ। লেডি ক্রলি (ভদ্রলোকের দ্বিতীয় স্ত্রী। আমার দুই শিষ্যের মা।) অসম্ভব ভয় পান স্বামীকে, মেয়ে দুটোও। ওদের নাম হচ্ছে ভায়োলেট আর রোজ। একটার বয়স আট, আরেকটার দশ। দুটোই হ্যাংলা, হতকুচ্ছিত দেখতে।

বাড়িটা অবশ্য বিশাল। বড় হলরুমটায় মিস পিঙ্কারটনের পুরো স্কুলটাই অনায়াসে এঁটে যাবে। এক কোণে রয়েছে সুবিস্তৃত সিঁড়ি। গুণে দেখেছি দোতলায় বিশটা বেডরুম। পড়ার ঘরটা তিন তলায়। ওটার একদিকে আমার বেডরুম আর অন্যদিকটায় মেয়ে দুটোর। এ ছাড়া মিস্টার পিট (বড়

ছেলে) এবং মিস্টার রডনের ঘরও রয়েছে। দ্বিতীয় জন স্যার পিট ক্রলির ছোট ছেলে। রেজিমেন্টের সঙ্গে রয়েছেন এখন তিনি। স্যার পিট ক্রলির প্রথমা স্ত্রীর সন্তান এঁরা। এঁদের ছোট রেখে মারা যান ভদ্রমহিলা।

বাড়ির পরিবেশ খুব একটা সুখকর নয়। বড় ছেলেটি- মিস্টার ক্রলি- বিষণ্ন, কুৎসিত, লিকলিকে এবং চুপচাপ। পাগুলো সরু সরু, পাখির মত বুক, জুলফি আর মাথার চুল খড় রঙা। লেডি ক্রলি কাঁদুনে মহিলা, দেখে মনে হয় রাজ্যের অসুখ তাঁর। কেউ পাত্তা দেয় না তাঁকে। স্যার পিট প্রতি রাতেই মাতাল হন। খানসামার সঙ্গে মদ খেয়ে আর আড্ডা মেরে সময় কাটান। মিস্টার ক্রলি সন্ধে বেলাটা সার্মন পড়ে কাটান। আর সকালে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকেন। সৈনিক ভাইটি হয়ত অন্যরকম, হয়ত এঁদের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কিন্তু খুব একটা নাকি আসেন না তিনি। বাবা আর বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া তাঁর। আরও শুনেছি, স্যার পিটের নাকি খুব বড়লোক এক বোন আছেন। ভদ্রমহিলা বিয়ে করেননি। টাকা পয়সা সব রডনকেই দিয়ে যাবেন বলে জেনেছি। তাঁর টাকার পরিমাণ সত্তর হাজার পাউণ্ড। রডনকে খুব ভালবাসেন তিনি, অপছন্দ করেন বড় ভাতিজাকে।

প্রিয় অ্যামেলিয়া, আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। তোমার বাবা মাকে আমার ভালবাসা জানিয়ো। ওঁদের কথা কখনও কি ভোলা সম্ভব? তোমার কথা বড্ড মনে পড়ে। শুধু ভাবি, আবার যদি দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারতাম!

তোমার চিরদিনের বান্ধবী,
রেবেকা।'

চিঠিটা শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রেবেকা।

'উফ্!' বলল সে, 'রাসেল স্কয়্যারের মত পচা জায়গায় ভাগ্যিস থাকতে হচ্ছে না আমাকে!' তারপর কল্পনা করতে এমনকি পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে দিল রেবেকা, কি করে স্যার পিট ক্রলির ছোট ছেলের মন ভজাবে। প্রথম দেখায় কি বলবে বা করবে তাও ভেবে নিল।

'সত্তর হাজার পাউণ্ড! মুখের কথা নয় বাপু!' আপন মনে বলে উঠল ও।

ক্রিসমাসের পরপরই স্যার পিট ক্রলির বোন মাটিল্ডা ফুফু ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। বৃদ্ধা মহিলার খুব একটা আসার ইচ্ছে ছিল না অবশ্য। কেননা তাঁর কাছে গ্রামের জীবন কখনই ভাল লাগে না। রেবেকা কিন্তু মাতিয়ে তুলল ভদ্রমহিলাকে। দুজনই দারুণ উপভোগ করতে লাগল পরস্পরের সঙ্গ। বাড়ির লোকজন এবং গ্রামের প্রতিবেশীদের নিয়ে ঠাট্টা

ইয়ার্কি করে ওরা, হাসাহাসি করে। ফলে সুন্দর কেটে যায় সময়। রেবেকা তার বুদ্ধি আর আকর্ষণী ক্ষমতা দিয়ে সহজেই পটিয়ে ফেলেছে ফুফুকে।

'মাই ডিয়ার, তুমি সত্যিই একটা রত্ন,' মিস ক্রলি বললেন ওকে। 'আমার সঙ্গে লণ্ডনে চলো না। আমার সঙ্গী, মিস ব্রিগস বোকার হদ্দ। ওর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই না।'

এসময় মিস ক্রলির মেইড মিসেস ফারকিন বেগম সাহেবার পাতলা চুলগুলো আঁচড়ে দিচ্ছিল। মাথাটা ঝাঁকি মেরে বিদ্রূপ করে বলল সে, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। মিস শার্প সত্যিই খুব বুদ্ধিমতী।'

কাজের লোকেরা মিস শার্পকে পছন্দ করে না। সে নাকি অতিরিক্ত চালাক। আসলে ওর মতলব বুঝতে বাকি নেই কারও!

সবাই ঠিকই ভেবেছে। বেকি আবার চিঠি লিখে অ্যামেলিয়াকে জানাল যে ক্রিসমাস বল-এ তার দেখা হয়েছে রডনের সঙ্গে। তার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে রডন। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। সেদিনের আগেই আসলে রডনের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে বেকি। এক সন্ধেয় ওর পিয়ানোর ওপর বার বিশেক ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে এ বাড়ির ছোট ছেলে। করিডরে পঞ্চাশ বারের মত চক্ষুমিলন হয়েছে ওদের। চাঁদের আলোয় কমপক্ষে ছদিন ঘুরে এসেছে ওরা। প্রেমের তাগিদ অনুভব করার জন্যে ছদিনই যথেষ্ট। ওরা পৌঁছেও গেছে রোমান্সের বিশেষ একটি পর্যায়ে– যদিও মুখ ফুটে এখনও কিছু বলতে পারেনি ক্যাপ্টেন সাহেব। মনের ভাষা প্রকাশে মোটেই দক্ষ নয় সে।

'তারাগুলো কি সুন্দর না?' প্রায় প্রতিদিনই বলে উঠেছে রেবেকা। সবুজ চোখজোড়া মেলে দিয়েছে আকাশের পানে। 'চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন জাদু করেছে আমাকে।'

'ওহ্…আহ্…হ্যাঁ, আমাকেও, একদম ঠিক, মিস শার্প,' কোনমতে আওড়াতে পেরেছে ক্যাপ্টেন। হাতড়ে বেড়িয়েছে উপযুক্ত শব্দ, নিজেকে রোমান্টিক প্রমাণ করার জন্যে। 'অ্যাঁ…চুরুট… খেতে পারি, মিস শার্প?'

'নিশ্চয়ই। চুরুটের গন্ধ খুব ভাল লাগে আমার,' উৎসাহ জোগাল মিস শার্প। তারপর নিজেও টান দিল একবার। মৃদু শব্দ করে হাসল সে, চুরুটটা ফিরিয়ে দিল ক্যাপ্টেনকে। গোঁফ মুচড়ে চুরুটে লম্বা টান মারল রডন। অন্ধকারে দপ করে জ্বলে উঠল আগুনটা।

'এটাই আমার জীবনের সেরা চুরুট, ঈশ্বরের কসম!'

ক্যাপ্টেনের কথাবার্তায় বুদ্ধিমত্তার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বুড়ো স্যার পিট একদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর পড়ার ঘরের জানালায়। তিনি দেখে ফেললেন ওদের। প্রিয় সঙ্গী সেই খানসামাকে বললেন

ভদ্রলোক, 'বোনটার জন্যে কিছু বলতে পারি না ছোঁড়াটাকে। নইলে কবেই কানটা ধরে বার করে দিতাম। বদমাশ কোথাকার!'

'আস্ত শয়তান একটা,' সায় দিল খানসামা। 'তবে মেয়েটাও কিন্তু কম যায় না। ভীষণ ধুরন্ধর।'

খানসামা সত্যি কথাটাই বলল।

ছয়

মিস রেবেকাকে এখন কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে যাব আমরা। ফিরে যাব লণ্ডনে। অ্যামেলিয়ার খবরও তো নেয়া দরকার।

বেচারীর মন ভাল নেই। জর্জের বোনদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় তার। কিন্তু তাতে কি আর মন ভরে? আসল মানুষটির দেখা বড় একটা পায় না সে। জর্জের বোনেরা ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। মুখ ফসকে মাঝেমধ্যে অবশ্য বেফাঁস কথাও বলে বসে। অ্যামেলিয়ার মনে হয় ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত। জর্জ যে ওর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য সে কথাটাই রেখেঢেকে বলে দেয় তার বোনেরা। মুখ বুজে সব সহ্য করে অ্যামেলিয়া। হবু স্বামীর বোনদেরকে আপন করে নেয়ার অনেক চেষ্টা করেছে ও, প্রায়ই গেছে ওদের বাড়িতে, কিন্তু বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কেমন যেন একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ ও বাড়িতে।

অ্যামেলিয়া চলে গেলে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে জর্জের দু বোন। চোখে থাকে বিস্ময়। এই অতি সাধারণ মেয়েটির মধ্যে কি পেয়েছে তাদের ভাই? সম্ভবত ঈর্ষা থেকেই এ প্রশ্নটা জন্ম নিয়েছে তাদের মনে। সুদর্শন ভাইটি বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকে। তাকে কাছে পায় না ওরা, অবহেলিত বোধ করে।

তবে জর্জ বাইরে গেলেই যে সেডলিদের বাসায় সময় কাটায়, তার বোনদের এ ধারণাটা ঠিক নয়। ড্রইংরুমে একাকী বসে থাকে অ্যামেলিয়া। জর্জকে দেখার জন্যে অন্তরে হাহাকার ওঠে। অপেক্ষা করে বসে থাকে ও, আশায় বুক বেঁধে। কিন্তু কোথায় জর্জ? এ বাড়িতে বলতে গেলে একদম একা সে। জোসেফ এখনও চেলটেনহ্যাম থেকে ফেরেনি। মায়ের কাজের শেষ নেই, প্রতিদিন ক্যারিজ নিয়ে বেরিয়ে যান তিনি; এবাড়ি ওবাড়ি করে সুন্দর সময় কাটিয়ে দেন। লণ্ডনের ধনী মহিলারা সাধারণত যেভাবে

স্ট্যাটাস বজায় রাখেন আরকি। মিস্টার সেডলি সারাদিন থাকেন অফিসে। বাড়ি ফিরে আসেন বিধ্বস্ত অবস্থায়, একরাশ উদ্বেগ নিয়ে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে বা সুযোগ কোনটাই হয় না অ্যামেলিয়ার।

সোজা কথা অ্যামেলিয়ার খবর রাখার ফুরসত নেই তার বাবা-মায়ের।

ডবিন একদিন এল সেডলিদের বাড়িতে। অ্যামেলিয়ার করুণ মুখটা দেখে অসম্ভব মায়া লাগল তার। বন্ধুকে গিয়ে তাগাদা দিতে লাগল সে, অ্যামেলিয়ার কাছে যাওয়ার জন্যে।

'মিস এমি যখন তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল তখন ওর মুখটা যদি দেখতে,' বলল ডবিন, 'তবে সব কটা বিলিয়ার্ড বল ফেলে দিতে টেমস নদীতে।

'জুয়া খেলে ফালতু সময় নষ্ট না করে ওর সঙ্গে দেখা করগে যাও। মেয়েটার জন্যে তোমার একটুও মায়া লাগে না? একটা চিঠি লিখে পাঠালেও তো পারো।'

'দরকার নেই। ও আমাকে এমনিতেই ভালবাসে, বাসবেও,' জবাবে বলল জর্জ। আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল। তারপর সোজা চলে গেল ক্লাবে, বিলিয়ার্ড খেলবে।

পরদিন সেডলিদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে বন্ধুকে তৈরি হতে দেখে খুশি হলো ডবিন।

'এমির জন্যে একটা কিছু নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত,' বলল জর্জ। 'কিন্তু হাত একেবারেই খালি।'

বন্ধুর হাতে কখানা পাউণ্ড ধরিয়ে দিল ডবিন। জর্জ কোচ নিয়ে রওনা হলো ফ্লিট স্ট্রিটের দিকে। কোচ থেকে নামতেই ওর চোখ পড়ল অনতিদূরের এক দোকানের জানালায়। চমৎকার একটা শার্ট পিন দেখে লোভ সামলাতে পারল না ও। কিনে ফেলল। প্রায় সব টাকাই খরচ করে ফেলল জর্জ। অ্যামেলিয়ার জন্যে কিছু কেনা আর সম্ভব হলো না, অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না। অ্যামেলিয়া তো আর উপহার চায় না, সে চায় শুধু তার জর্জকে। জর্জ সেডলিদের ড্রইংরুমে ঢুকতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যামেলিয়ার মুখখানা। মুহূর্তে ভুলে গেল প্রতীক্ষার অসহ্য প্রহরগুলোর কথা।

ওর কপালে চুমু খেল জর্জ। ঘণ্টা দুয়েক গল্পগুজব করে কাটাল ওরা। তারপর উঠে পড়ল জর্জ। জানাল তার জরুরী কাজ রয়েছে। এমিকে বলে গেল হবু ননদদের সঙ্গে ডিনার সেরে নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে। এমিকে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল জর্জ।

জর্জের 'জরুরী কাজ'গুলো হচ্ছে কনফেকশনারিতে গিয়ে আইসক্রীম খাওয়া, দরজির দোকানে নতুন একটা কোটের মাপ দেয়া, বিলিয়ার্ড খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বাদে খোশ মেজাজে বাড়ি ফিরে এল জর্জ, ডিনারের সময় পেরিয়ে গেছে তখন।

বাড়ি ফিরে জর্জ বাবার মুখোমুখি পড়ল। ভদ্রলোকের মেজাজ মর্জি খুব একটা ভাল ঠেকল না ওর কাছে। ডিনার টেবিলে অস্বস্তিকর নীরবতা। অ্যামেলিয়ার মুখ শুকনো। হবু শ্বশুরের পাশে বসে রয়েছে সে। মনে ভাবনা, জর্জের বাবা কি তার কোন কথায় আঘাত পেয়েছেন? জর্জ ঘরে ঢুকতেই পাল্টে গেল পরিবেশ। একটানা কথা বলে চলল সে।

খাওয়া শেষে মেয়েরা চলে গেল ড্রইংরুমে। আর ওয়াইন পান করার জন্যে বসে রইল বাপ-বেটা। বাবার ভ্রূ-কুঞ্চিত চেহারার দিকে ভয়ে ভয়ে চাইল জর্জ। ফন্দি আঁটতে লাগল কিভাবে বাবার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবে। বাজারে প্রচুর দেনা হয়ে গেছে তার, শোধ দেয়া দরকার। বাবার মুড ভাল করার জন্যে অত্যুৎসাহে ওয়াইনের প্রশংসা শুরু করল জর্জ।

'সত্যিই ভাল,' সম্মতি জানালেন বাবা। চুমুক দিতে লাগলেন গ্লাসে। বোঝা গেল রীতিমত উপভোগ করছেন। খানিকটা সাহস ফিরে পেল জর্জ, আশাবাদী হল।

'জর্জ, আমি জানতে চাই– তোমাদের মধ্যে– তোমার আর ওই মেয়েটার মধ্যে এখন কি রকম সম্পর্ক।'

'সে তো স্পষ্ট,' হালকা তালে বলল জর্জ। 'ও আমাকে ভালবাসে। সবাই জানে সেটা।'

'তুমি বাসো?'

'বাহ্, তুমিই না আমাকে বলেছ ওকে বিয়ে করতে? আমি তোমার কথামতই তো চলছি। সেডলিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তোমার বহু আগেই কথা হয়ে গেছে না?'

'বেশি ভালমানুষি করতে এসো না,' গম্ভীর শোনাল মিস্টার অসবর্নের কণ্ঠ। 'তোমার সব খবরই জানা আছে আমার। কাদের সঙ্গে জুয়া খেলছ তাও জানতে বাকি নেই। লর্ড টারগুইনদের সঙ্গে খুব জমে গেছে, না?'

প্রমাদ গুণল জর্জ। বাবা কি রেগে গেছেন? মিথ্যে ভয় পেল ও। ওর বাবা বরঞ্চ খুশি হয়েছেন ও সমাজের উঁচু স্তরের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করছে বলে। বাবার কথায় মুহূর্তে ভয় উবে গেল ওর।

'সব বয়সের দোষ,' বললেন ভদ্রলোক। 'তাও ভাল যে ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশছিস। বাপের টাকা না থাকলে পারতি এত লাটসাহেবি করতে?'

শেষদিকে খানিকটা অহংকারী শোনাল মিস্টার অসবর্নের গলা।

সুযোগটা ছাড়ল না জর্জ।

'তুমি তো সবই জানো, বাবা, ওদের সঙ্গে মিশতে ঝক্কিও আছে। প্রচুর পয়সা লাগে। এই দেখো না আমার পার্সের অবস্থা।'

ছোট পার্সটা বাবাকে দেখাল জর্জ। অ্যামেলিয়া নিজের হাতে ওটা বানিয়ে উপহার দিয়েছে তাকে। ডবিনের দেয়া নোটগুলোর দু একটা অবশিষ্ট আছে এখন ওটার ভেতর।

'টাকার জন্যে ভাবিস না, পেয়ে যাবি। ওদের চেয়ে টাকা কি কম আছে নাকি আমার? কাল আমার হেড ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করিস।' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর বলে চললেন, 'এবার আসল কথায় আসি। সেডলির মেয়ের চেয়ে ভাল আর কাউকে বিয়ে করতে পারিস না? আরও উঁচু বংশে? কিরে?'

'কিন্তু, বাবা তুমি আর মিস্টার সেডলিই তো আমাদের বিয়ে ঠিক করে রেখেছ, অনেক বছর আগেই।'

'করেছিলাম, তাতে কি? সেডলি হালে প্রচুর টাকা খুইয়েছে। শুনে রাখো– অ্যামেলিয়াকে বিয়ে করতে হলে দশ হাজার পাউণ্ড যৌতুক আদায় করতে হবে। নইলে এ বিয়ে বাতিল। কোন গরীবের মেয়েকে বাড়ির বউ করছি না আমি।'

মিস্টার অসবর্ন এরপর সান্ধ্য কাগজ খুলে বসলেন। বুঝিয়ে দিলেন, কথা এখনকার মত শেষ। জর্জ ওপরতলায় চলে গেল, ড্রইংরুমে অ্যামেলিয়ার কাছে। পুরো সন্ধেটা অ্যামেলিয়াকে সঙ্গ দিল ও অনেকদিন পর অ্যামেলিয়ার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে দেখা গেল ওকে। মেয়েটির জন্যে কি দুঃখ হচ্ছে ওর? ওকে হারানোর চিন্তা কি পেয়ে বসেছে জর্জকে? সেদিনকার মধুর মুহূর্তগুলোর স্মৃতি পরবর্তী কয়েকটা দিন রোমন্থন করল অ্যামেলিয়া। অসবর্নদের বাড়িতে কোনদিন এত ভাল লাগেনি ওর।

পরদিন সকালে জর্জ ছুটল বাবার হেড ক্লার্কের কাছে। চেক তৈরিই ছিল। ওটা ভাঙিয়ে পকেটভর্তি করে নিল জর্জ। ব্যাঙ্কে অ্যামেলিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। বেরিয়ে আসছেন ভদ্রলোক, চরম উদ্বিগ্ন আর হতাশ দেখাচ্ছে তাঁকে। জর্জের মনে কিন্তু কোনরকম রেখাপাত করল না ব্যাপারটা। সে এখন মহা ফুর্তিতে রয়েছে, পকেট তার টাকায় ঠাসা।

সেদিন সন্ধেয় অ্যামেলিয়ার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল জর্জ। ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছে মেয়েটি। জর্জের বাবা ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করলেন কেন? ওর নিজের বাবাই বা কেন এত ভেঙে

পড়েছেন? জর্জ কি জানে কিছু? অ্যামেলিয়াকে কি সে সারাজীবনই এখনকার মত ভালবাসবে?

'বেচারী এমি! মনটা বড় নরম ওর,' চিঠিটা পড়া শেষ করে নিজের মনে বলল জর্জ।

সাত

মিস ক্রলি পার্ক লেনে তাঁর সুদৃশ্য বাড়িতে ফিরে এসেছেন। লণ্ডনের অন্যতম অভিজাত পাড়া এটা। তাঁর সঙ্গে এসেছে বেকি। সে খুব যত্ন আত্তি করছে ভদ্রমহিলার। মিস ক্রলি অসুস্থ। তাঁর ধারণা ভাইয়ের বাড়ির স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া কাহিল করে দিয়েছে তাঁকে। আসলে তা নয়। একদিন সাপারে মাত্রাতিরিক্ত গলদা চিংড়ি খাওয়াই কাল হয়েছে তাঁর, অসুস্থ বানিয়ে ছেড়েছে তাঁকে।

ঠিক তার পরদিনই ক্যাপ্টেন ক্রলি নাইটসব্রিজ ব্যারাক থেকে অসুস্থ ফুফুর খোঁজ নিতে ছুটে এল। এসে দেখল ফুফুর মেইডের মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে রয়েছে। আর মিস ব্রিগস, ফুফুর সঙ্গী মহিলা কাঁদছে।

'ওঁর শরীর ভাল নেই। আমার সঙ্গে দেখা করবেন না বলেছেন,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সে।

সবাই বুঝে গেছে মিস ক্রলির কাছে অন্য সবার চেয়ে রেবেকার সঙ্গ অনেক বেশি কাম্য– রডনের কাছেও। ফুফুর কথা জেনে নিয়ে রেবেকার পিছু নিল রডন, ডাইনিংরুমে চলে এল। মিনিট দশেক বাদে সন্তুষ্টচিত্তে বেরিয়ে এল ও। তারপর কালো ঘোড়াটায় চেপে চলে গেল নিজের কাজে। চেয়ে চেয়ে সবই দেখল মিসেস ফারকিন আর মিস ব্রিগস।

'বেটি জাদু জানে,' মিসেস ফারকিনের কণ্ঠে রাগ। 'স্যার পিট ওকে আসতে দিতে চাননি। কিন্তু বোনকে চটাতে সাহস পান না ভদ্রলোক। তাই রাজি হয়েছেন। ক্যাপ্টেন মেয়েটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর ওদিকে হিংসায় জ্বলছেন ওর বাবা। বড় গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা।'

মিস ক্রলির সুস্থ হতে সময় লাগল না। এখন উনি বিছানায় বসে বেকির রঙ্গ উপভোগ করেন আর হেসে কুটিকুটি হন। বেকির অভিনয় ক্ষমতা দারুণ কিনা! মিস ক্রলির জন্যে মিস ব্রিগসের দুঃখ প্রকাশের দৃশ্যগুলো আশ্চর্য সুন্দর করে নকল করে দেখায় বেকি।

ক্যাপ্টেন ক্রলি রোজই আসে। ফুফুর স্বাস্থ্যোন্নতির খবর তাকে উৎফুল্ল করে তোলে। ফলে বেকির সঙ্গে ডাইনিংরুমে সময় কাটিয়ে বেরিয়ে আসার পর প্রতিদিনই তাকে আগের চেয়ে বেশি প্রাণবন্ত দেখায়। বেকিরও আপাতত পার্ক লেন ছেড়ে নড়ার ইচ্ছে নেই। স্যার পিট অবশ্য ইতোমধ্যে কয়েকবার চিঠি লিখেছেন ওকে, ফিরে যেতে বলেছেন। মিস ক্রলিকেও চিঠি পাঠিয়েছেন ভদ্রলোক। জানিয়েছেন বেকির অনুপস্থিতিতে তাঁর মেয়েদের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। বৃদ্ধা মহিলা ভাইয়ের কথায় কান দিলেন না। বেকিকে ছাড়তে রাজি নন তিনি।

পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ক্যারিজ নিয়ে বেড়াতে বেরোন মিস ক্রলি। বেকি থাকে তাঁর পাশে। দিনকে দিন বেকির প্রতি দুর্বলতা বাড়ছে তাঁর।

কেটে যেতে লাগল সময়।

এরপর স্যার পিটের বাড়ি থেকে খবর এল একটা। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন। স্যার পিট আবারও বিপত্নীক। দুঃসংবাদটা নাড়া দিতে পারল না মিস ক্রলিকে।

'তিন তারিখের পার্টিটা বাতিল করতে হবে,' সহজ গলায় বললেন তিনি। 'ভাইটার এবার বোধহয় আক্কেল হবে। আর হয়ত বিয়ে করতে চাইবে না।'

চুপ করে রইল বেকি।

পরদিন সকাল। বেকি তখন জানালায় দাঁড়িয়ে। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সে। চমকে দিল মিস ক্রলিকে। একটা ফরাসি উপন্যাস পড়ছিলেন ভদ্রমহিলা।

'স্যার পিট এসেছেন,' ঘোষণা করল বেকি। প্রায় তক্ষুণি নিচে দরজা নক করলেন ব্যারোনেট।

'আমি ওর সঙ্গে দেখা করব না। নিচে গিয়ে জানাও আমার শরীর খারাপ। এ মুহূর্তে ওকে সহ্য করতে পারব না,' বললেন মিস ক্রলি। পড়ে চললেন বইটি।

'উনি খুব অসুস্থ,' বলল রেবেকা। 'দেখা বোধহয় করতে পারবেন না।' নিচে নেমে এসেছে সে। স্যার পিট তখন ওপরে ওঠার পাঁয়তারা করছেন।

'ভালই হলো,' বললেন স্যার পিট। 'আমি এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে। চলো ড্রইংরুমে যাই।'

ড্রইংরুমে ঢুকল ওরা।

'বাড়ি ফিরে চলো,' বললেন ব্যারোনেট। তাঁর চোখজোড়া রেবেকার চোখে স্থির। কালো দস্তানাজোড়া খুলে নিলেন হাত থেকে।

ভদ্রলোকের চাহনি এতই অদ্ভুত ঠেকল রেবেকার কাছে যে কেঁপে উঠল ও।

'শিগ্‌গিরই যাব,' নিচু গলায় বলল বেকি। 'মিস ক্রলি একটু ভাল হয়ে উঠুন– বাচ্চাদের কাছে ফিরে যাব।'

'গত তিনমাস ধরে একই কথা বলছ,' পাল্টা বললেন স্যার পিট। 'আমার বোনের টানে পড়ে থাকছ তো? ওকে চেনো না। মন উঠে গেলেই তোমাকে কান ধরে বার করে দেবে। নিজের ভাল চাইলে আমার সঙ্গে বাড়ি চলো। ফিউনেরলের জন্যে ফিরছি। যাবে? হ্যাঁ অথবা না– একটা কিছু বলো।'

'আ...আপনার সঙ্গে একা যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল বেকি।

'আমি তোমাকে চাই,' বলে বসলেন স্যার পিট। দুম করে কিল বসালেন টেবিলটাতে। 'তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। তুমি চলে আসার পর থেকে বাড়ির অবস্থা শেষ। সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। তোমাকে ফিরতেই হবে। বলো, বেকি ফিরবে না? ফিরবে না?'

'কোন্ পরিচয়ে ফিরব?' ঢোক গিলে জানতে চাইল বেকি।

'লেডি ক্রলি,' বললেন ব্যারোনেট। 'এবার খুশি তো? তোমাকে আমার বউ করব। তুমিই আমার মনের মত বউ হবে। যাবে না? কি, কিছু বলছ না যে?'

'স্যার পিট!' কেঁপে উঠল রেবেকার গলা।

'রাজি হয়ে যাও, বেকি,' বলে চললেন স্যার পিট। 'বুড়ো হলেও এখনও বাদ হয়ে যাইনি। তোমাকে সুখী করবই। দেখবে আমার কথার নড়চড় হবে না। এদিক ওদিক দেখলে তুমি তোমার ইচ্ছেমত চলবে। আমি বাধা দেব না। তোমার নামে জমি লিখে দেব কথা দিচ্ছি।'

হাঁটু গেড়ে বেকির সামনে বসে পড়লেন বুড়ো ভদ্রলোক।

আঁতকে পিছিয়ে গেল রেবেকা। কাঁপছে। কান্না জড়ানো কণ্ঠে কোনমতে বলতে পারল, 'ও, স্যার পিট! স্যার...আমার...আমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

আট

কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠলেন স্যার পিট। রাগে থমথম করছে মুখ।

'বিয়ে হয়ে গেছে! মিথ্যে কথা!' বলে উঠলেন তিনি। 'ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে। তোমাকে বিয়ে করবেটা কে শুনি? একটা শিলিংও আছে তোমার?'

'আমি সত্যি বলছি,' কাঁদতে কাঁদতে বলল বেকি। আবেগে গলা কেঁপে উঠছে। ম্যান্টেলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে, ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছছে।

'কাকে বিয়ে করেছ? কোথায়?' গর্জে উঠলেন স্যার পিট।

'কথা দিন আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন না,' মিনতি ঝরল বেকির কণ্ঠে। 'আমি আগের মতই আপনার দেখাশোনা করতে চাই।'

'ও, লোকটা তোমাকে ফেলে চলে গেছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যারোনেট। খানিক ভেবে আবার বললেন, 'বেশ, ফিরে যেতে পারো। গভর্নেস হিসেবে।'

ওঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বেকি। এখনও কেঁদে চলেছে সে। কোঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে মুখের ওপর। স্যার পিট ওর ভাবভঙ্গি দেখে অভিভূত হলেন।

'ব্যাটা চলে গেছে বলে ভেবো না, বেকি। আমি তো আছি। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।'

'স্যার, বাড়ি ফিরে যেতে পারলে খুব খুশি হব আমি। কিন্তু আপনার স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে আপনার মেয়ে মনে করবেন।'

রেবেকা হাঁটু গেড়ে বসে স্যার পিটের শক্ত, লোমশ একটা হাত চেপে ধরল দু'হাতে। করুণ চোখে ভদ্রলোকের দিকে চাইল সে। ঠিক তখুনি খুলে গেল দরজাটা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন মিস ক্রলি।

রেবেকা আর স্যার পিট ড্রইংরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাইরে হাজির হয়ে গিয়েছিল মিসেস ফারকিন আর মিস ব্রিগস। তারা স্যার পিটকে রেবেকার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছে, কি-হোল দিয়ে। ভদ্রলোক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন তাও শুনেছে। কথাটা শোনামাত্রই ছুটে ওপরে চলে গেছে দু'মহিলা। স্যার পিট কিভাবে বসে রয়েছেন সে খবরটা জানিয়েছে

মিস ক্রলিকে। মিস ক্রলি তক্ষুণি হাতের বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে নেমে এসেছেন নিচে। রেবেকা সে সময় বসে রয়েছে হাঁটু গেড়ে।

'পিট কোথায়, আমি তো দেখছি রেবেকা কার্পেটে বসে রয়েছে,' বললেন মিস ক্রলি। 'পিট, ওর মত করে আরেকবার বসো দেখি, চোখটা জুড়াক আমার।'

'আমি ওঁকে বলে দিয়েছি,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল রেবেকা, 'আমার পক্ষে লেডি ক্রলি হওয়া সম্ভব নয়।'

'ওকে ফিরিয়ে দিয়েছ!' চরম বিস্মিত দেখাল মিস ক্রলিকে। জীবনে বোধহয় এমন অদ্ভুত কথা শোনেননি ভদ্রমহিলা। মিস ব্রিগস আর মিসেস ফারকিনের অবস্থাও তথৈবচ। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তাদের।

'হ্যাঁ, ফিরিয়ে দিয়েছি,' দুঃখিত গলায় জানাল রেবেকা।

'তুমি ওকে সত্যিই প্রস্তাব দিয়েছিলে, স্যার পিট?' জিজ্ঞেস করলেন মিস ক্রলি।

'হ্যাঁ,' জবাবে বললেন স্যার পিট, 'দিয়েছিলাম।'

'আর ও তাতে রাজি হয়নি?'

'না,' আকর্ণ হাসলেন স্যার পিট।

'দুঃখ পেয়েছ বলে তো মনে হয় না,' মন্তব্য করলেন মিস ক্রলি।

'ঠিকই বলেছ,' হালকা চালে বললেন স্যার পিট। মুখে মৃদু হাসি। এবারে আরও আশ্চর্য হলেন মিস ক্রলি। খেপে গেলেন রীতিমত।

'হাসছ যে লজ্জা করে না?' ক্রোধের সঙ্গে বললেন মিস ক্রলি।

আরও চওড়া হল স্যার পিটের হাসি। বিড়বিড় করে নিজের মনেই বললেন, 'ছুঁড়িটা আস্ত একটা বিচ্ছু! তলে তলে কত দূর এগিয়েছে! বেঁচে গেছি, বাবা!'

'বেঁচে গেছ মানে?' রাগে পা দাপালেন মিস ক্রলি। তারপর বেকির দিকে ফিরে বললেন, 'তা তোমার ধারণা আমরা তোমার উপযুক্ত নই?'

'ওকথা বলবেন না, ম্যাম,' বিনীত স্বরে বলল বেকি। 'আপনারা আমার জন্যে অনেক করেছেন। আপনাদের দয়া জীবনে ভুলতে পারব না আমি। আমার...আমার...' আর বলতে পারল না বেকি। চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এ মুহূর্তে দর্শকদের অধিকাংশের অন্তরই তার জন্যে সমবেদনায় পরিপূর্ণ।

'তুমি খুব ভাল মেয়ে, বেকি। আমাকে সব সময় তোমার পাশে পাবে,' সান্ত্বনা দিয়ে বললেন স্যার পিট। তারপর কালো ব্যাণ্ড লাগানো হ্যাটটা পরে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল বেকি। মিস ক্রলি

এখনও ওর গোপন কথা জানেন না। পরিকল্পনা তৈরির জন্যে আরও খানিকটা সময় পেয়ে গেল ও।

সোজা শোবার ঘরে চলে গেল বেকি। খাটে বসে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল। আশায়-নিরাশায় দুলছে ওর বুক। তার বিয়ে হয়ে গেছে একথা জানেন স্যার পিট। মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে মিস ক্রলিকে নিয়ে। তিনি কিভাবে নেবেন খবরটা? অস্বস্তি বেড়ে চলেছে বেকির। ভদ্রমহিলা শুধু যে এ বিয়ের বিরোধিতা করবেন তাই নয়, খুব সম্ভব ভাতিজাকে একটা পেনিও দেবেন না; বঞ্চিত করবেন। ভাবনাটা মাথায় আসতেই ঠাণ্ডা হয়ে এল বেকির সারা শরীর। কিন্তু পরক্ষণেই আশাবাদী হয়ে উঠল ও। মিস ক্রলি ভাতিজাকে অসম্ভব ভালবাসেন। বেকির প্রতিও কি তিনি বারবার দুর্বলতা প্রকাশ করেননি?

'রডনকে উনি মাফ করে দেবেনই,' ভাবল রেবেকা। 'আমাকেও। খবরটা জানার পর হয়ত জ্ঞান হারাতে পারেন, তাছাড়া চেঁচামেচি কিছুটা তো হবেই, কিন্তু ভুলেও যাবেন ক'দিন পরেই।'

এ গল্পের পাঠক পাঠিকারা হয়ত ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছেন কে রেবেকার স্বামী। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন আপনারা। রেবেকার স্বামী আর কেউ নয়, সে হচ্ছে ক্যাপ্টেন রডন ক্রলি।

নয়

রডন ক্রলি আর বেকি গোপনে বিয়ে করেছে। ফুফুকে জানানোর ব্যাপারটা রডন ছেড়ে দিয়েছে স্ত্রীর ওপর। বেকির প্রতি অগাধ আস্থা তার। সে নিশ্চিত, বেকি ফুফুকে মানিয়ে ফেলবেই।

বেকি যখন চিঠিতে জানাল যা করার এখনই করতে হবে তখন মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে নিল রডন। বেকি জানিয়েছে সে ফুফুর বাড়ি ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার কথামত রডন লজিং ভাড়া নিল দুজনের জন্যে, ব্যারাকের কাছেপিঠেই। ঘরগুলো ফুল দিয়ে সাজাল ও, একটা পিয়ানোরও অর্ডার দিল। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। এখন কেবল বেকির আসা বাকি।

সেদিন রাতে পার্ক লেনের বাড়িতে হেসে গেয়ে মিস ক্রলির মন ভরিয়ে তুলল বেকি। আজকের মত এভাবে আর কোনদিন ভদ্রমহিলার মন কাড়তে

পারেনি ও। আসলে রডন যদি তখন থাকত তবে হয়ত দুজনই ফুফুর সামনে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রডন ওখানে নেই, কাজেই সুযোগটা নষ্ট হল।

পরদিন সকালে মেইড যথারীতি টোকা দিল বেকির ঘরের দরজায়। জবাব পেল না। আবারও টোকা দিল সে। এবারও জবাব নেই। বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল মেইড। বিছানা পরিপাটী অবস্থায় রয়েছে। বোঝা যায় কাল রাতে ওখানে কেউ শোয়নি। বেকির ছোট ট্রাঙ্ক দুটো ঘরের এক কোণে দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর ড্রেসিং টেবিলের পিন কুশনের নিচে রাখা রয়েছে একটা চিঠি। ওটা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল মেইড। তারপর নিচে মিস ব্রিগসের ঘরে চলে এল।

'মিস ব্রিগস!' চেঁচাল ও। 'ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মিস শার্পের ঘর খালি। উনি পালিয়েছেন। এই দেখুন, চিঠি লিখে গেছেন।'

'কি বললে!' হাত থেকে চিরুনি ফেলে দিল মিস ব্রিগস। 'মিস শার্প পালিয়েছে? দাও দেখি।' দ্রুত হাতে চিঠিটা খুলল সে, পড়তে শুরু করল।

'প্রিয় মিস ব্রিগস,

আপনাকে চিঠি লিখে সব জানাব বলে আগেই ভেবে রেখেছি। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমার মত একজন এতিম সবার কাছে যে ভালবাসা আর সহানুভূতি পেয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। কিন্তু কি করব বলুন, আমার যে আরও অনেক বড় দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে। আমি আমার স্বামীর কাছে চলে যাচ্ছি। আজ জানাচ্ছি, আমি বিবাহিতা। স্বামী আমাকে তাঁর কাছে যেতে আদেশ করেছেন।

প্রিয় মিস ব্রিগস, খবরটা আমাদের প্রিয় বান্ধবীকে দয়া করে জানাবেন। তাঁকে বলবেন, চলে যাওয়ার আগে তাঁর প্রিয় বালিশটির ওপর অশ্রুবর্ষণ করেছি আমি। জানাবেন, আমার মনে বড় ইচ্ছে বালিশটিকে আবার দেখার, আদর করার। আমার মন পড়ে রয়েছে ওঁর বাড়িতে। কবে যে আবার ফিরব! ওঁকে বলবেন আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন।

স্যার পিট বিয়ে করে আমাকে সম্মান দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে জানিয়েছি আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি আমাকে মাফ করেছেন। কিন্তু একটি ব্যাপার জানাতে পারিনি তাঁকে। বলতে পারিনি তাঁর স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমি ওঁর ছেলের বউ। ঠিকই ধরেছেন– মিস ক্রলির রডনই আমার প্রাণপ্রিয় রডন। প্রিয় বন্ধু, মিস ক্রলিকে বলবেন আমাদের দুজনকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে।

এখন মাঝরাত। আর লেখা সম্ভব নয়। সবার জন্যে ভালবাসা আর

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি–

আপনার কৃতজ্ঞ ভক্ত,
রেবেকা ক্রলি।'

মিস ব্রিগস চিঠিটি পড়া শেষ করেছে কি করেনি অমনি ঘরে ঢুকলেন মিসেস ফারকিন।

'শুনেছেন, মিসেস ফারকিন!' চোখ গোল গোল করে বলল মেইড, 'মিস শার্প ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ভেগেছে।'

মিস ব্রিগস ছুটল মিস ক্রলিকে খবরটা পৌঁছে দিতে। আঘাতটা বড় বেশিই পেলেন বৃদ্ধা। আর্তনাদ করে জ্ঞান হারালেন। তাঁকে বিছানায় বয়ে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো। লোক পাঠানো হলো ডাক্তার আনতে।

ওদিকে খানিক বাদেই এসে হাজির হলেন স্যার পিট।

'বেকি কোথায়?' জানতে চাইলেন তিনি। 'ওর লাগেজ কই? ও আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরবে।'

'আপনি খবর শোনেননি?' পাল্টা প্রশ্ন করল মিস ব্রিগস।

'কিসের খবর?'

'ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'জানি। তাতে আমার কি?' বললেন স্যার পিট। 'ওকে জলদি নেমে আসতে বলো। আর অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না।'

'ও আমাদের এখানে নেই। মিস ক্রলিকে প্রায় মেরে রেখে গেছে। ও ক্যাপ্টেন রডনকে বিয়ে করেছে সে খবর জানেন না?'

কথাটা শুনে স্যার পিটের চক্ষু চড়কগাছ! রেবেকা তাঁর ছেলেকে বিয়ে করেছে শুনে পরক্ষণেই রাগে আর হিংসায় গা জ্বলে গেল ভদ্রলোকের। মুখ খারাপ করে বসলেন তিনি, ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল মিস ব্রিগসের। ওঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল সে।

সেসময় নিজেদের বাড়িতে আয়েশ করে বসে রয়েছে রডন আর তার নবপরিণীতা স্ত্রী।

'বুড়ী যদি কিচ্ছু না দেয়, তখন?' উদ্বিগ্ন রডন চাইল স্ত্রীর দিকে।

'ভেবো না। সব ব্যবস্থা করে ফেলব,' স্বামীর গালে হাত বোলাল বেকি।

'তা তুমি পারবে,' বলল রডন। চুমু খেল স্ত্রীর হাতে।

দশ

সপ্তাখানেক পর। রাসেল স্কয়্যারের একটি বাড়ির যাবতীয় গৃহস্থালী জিনিসপত্র নিলামে উঠল। সবগুলো জিনিসের মধ্য থেকে কেবল একটির উল্লেখ করছি আমরা। সেটি হচ্ছে ছোট একটি পিয়ানো। ওটা কিনল ক্যাপ্টেন ডবিন। জিনিসটি কিনতে পেরে খুশি হল সে। নিলাম হচ্ছে সেডলিদের বাড়িতে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গল্পের শুরুতে ও বাড়িতে বেশ কয়েকটি সুন্দর সন্ধ্যা কাটিয়েছি আমরা।

বৃদ্ধ জন সেডলি নিঃস্ব এখন। সব টাকা স্টক এক্সচেঞ্জে খুইয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। পাওনাদারদের দেনা শোধ করছেন তিনি বাড়ির মালামাল বিক্রি করে। পিয়ানোটা অ্যামেলিয়ার, খুব পছন্দের জিনিস ওর। ডবিন চায় এই দুঃসময়েও ওটা থাকুক অ্যামেলিয়ার সঙ্গে।

পরদিন সন্ধ্যায় পিয়ানোটা ফুলহ্যামের ছোট্ট একটি বাড়িতে পৌঁছে গেল। লণ্ডনের ঘিঞ্জি এলাকাগুলোর একটি হচ্ছে এই ফুলহ্যাম। মিস্টার সেডলি তাঁর ক্লার্ক মিস্টার ক্ল্যাপের বাড়িতে স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে উঠেছেন।

সেডলি পরিবার মালপত্র সব খোয়ালেও চেলটেনহ্যাম থেকে তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠিয়েছে জোস সেডলি। আর্থিক কষ্ট সইতে না হলেও দেউলিয়াপনার কারণে মন ছোট হয়ে গেছে অ্যামেলিয়ার বাবা-মার। সমাজে মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়েছে তাঁদের। মিস্টার সেডলির বন্ধুরা সব একে একে কেটে পড়েছেন। এ মুহূর্তে জন অসবর্ন হচ্ছেন মিস্টার সেডলির প্রধানতম শত্রু। অ্যামেলিয়া যৌতুক আনতে পারবে না বলে ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন ভদ্রলোক। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সেডলির মত বাজে লোকের মেয়ের সঙ্গে কিছুতেই তাঁর ছেলের বিয়ে হতে পারে না।

নীরবে যন্ত্রণা সয়ে চলল অ্যামেলিয়া। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায় সে নিজের ছোট্ট ঘরটাতে। নিজেও টের পায় না কখন যেন দুগাল ভিজে গেছে চোখের পানিতে। দিনকে দিন মনমরা হয়ে পড়তে লাগল মেয়েটি।

ওদিকে জন সেডলির গোঁও কম নয়। জন অসবর্নকে হৃদয়হীন পাষাণ বলে গালাগাল করেন তিনি। মেয়েকে নির্দেশ দিয়েছেন জর্জের কাছ থেকে

পাওয়া সমস্ত উপহার ফিরিয়ে দিতে। তাছাড়া, জর্জের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা চিঠি লেখালেখি করতেও নিষেধ করে দিয়েছেন।

অ্যামেলিয়ার এই দুঃসময়ে কি করছে জর্জ?

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পুরোদমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছে ও। খুশি হয়ে মিস্টার অসবর্ন ছেলেকে মোটা টাকা পাঠিয়েছেন, ইউনিফর্ম কেনার জন্যে। বেশ সুখেই কাটছে জর্জের সময়। অ্যামেলিয়ার কথা মনে পড়ে মাঝে মধ্যে, দুঃখ হয় ক্ষণিকের জন্যে। তবে ভুলেও যায় দ্রুত। এত কাজ তার, অ্যামেলিয়াকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে কেন?

ডবিন একদিন জর্জকে মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকতে দেখল।

'ও...ও আমার দেয়া সব জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছে,' বন্ধুকে বলল জর্জ। 'এই দেখো।'

আঙুল তাক করল সে টেবিলের দিকে। আঙটি, ছোট্ট একটি ছুরি, সোনার চেইন, লকেট সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওখানে।

'সব শেষ,' বলল জর্জ। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। 'তুমি চাইলে ওর চিঠিটা পড়তে পারো।' পড়তে শুরু করল ডবিন:

'বাবা তোমাকে জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিতে বলেছেন। চিঠিও লিখছি শেষবারের মত। জানি, আমার চেয়ে কষ্ট কম পাচ্ছ না তুমি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে কষ্ট সইবার শক্তি দান করেন, আর তোমাকে সুখে রাখেন। তোমার পিয়ানোটার মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাব। ওটার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।

অ্যামেলিয়া।'

পিয়ানো পাঠিয়েছে ডবিন। অথচ না জেনে অ্যামেলিয়া লিখেছে জর্জের কথা। তবে সেজন্যে কিছু যায় আসে না ওর। অ্যামেলিয়া খুশি হয়েছে, সেটাই যথেষ্ট।

'মেয়েটা খুব লক্ষ্মী,' জর্জকে বলল ও। বিনাবাক্যব্যয়ে সায় জানাল জর্জ। এরপর কিছুক্ষণের জন্যে যুদ্ধের কথা বেমালুম ভুলে গেল জর্জ। বারবার কেবল মনে পড়ছে অ্যামেলিয়ার নিষ্পাপ মুখটা। ডবিনের সঙ্গে অ্যামেলিয়া সম্পর্কে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল ও।

'এখন কোথায় আছে ওরা?' জানতে চাইল জর্জ। মনে মনে লজ্জা পেল। তারই তো উচিত ছিল সেডলিদের খোঁজ-খবর রাখা। 'কোথায় ওরা? চিঠিতে কোন ঠিকানা তো পেলাম না।'

ডবিন ঠিকানা জানে। ইতোমধ্যে সেডলিদের বাড়িতে গিয়েছে সে।

দেখা করেছে অ্যামেলিয়ার সঙ্গে।

খবরটা জেনে ডবিনকে ছেঁকে ধরল জর্জ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল প্রেমিকা সম্বন্ধে।

'ও কেমন আছে? কিছু বলল? শরীর খারাপ করেনি তো?'

বন্ধুর একটা হাত ধরল ডবিন। সোজাসুজি চাইল দুচোখে।

'জর্জ, মেয়েটা তোমার জন্যে মরতে বসেছে,' কোনমতে শুধু এটুকু বলতে পারল ও।

এ ঘটনার চার ঘণ্টা পরে কাজের মেয়েটি অ্যামেলিয়ার ঘরে এল। অ্যামেলিয়া তখন যথারীতি জমানো চিঠিগুলো মুখস্থ করছে।

'মিস এমি,' ডাকল মেয়েটি। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'বলো,' ওর দিকে না চেয়েই বলল অ্যামেলিয়া।

'একজন অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। এই দেখুন খবর পাঠিয়েছেন।'

এমির হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল ও।

'তোমাকে দেখতে এসেছি, জান। সোনা বউ, শিগ্‌গির এসো।'

অ্যামেলিয়া যখন চিঠি পড়ছে তখন নিচে বসে আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে ওর জর্জ।

এগারো

ফুলহ্যামের অখ্যাত এক গির্জায় বিয়ে হয়ে গেল জর্জ অসবর্ন আর এমির; এপ্রিলের এক বৃষ্টিভেজা দিনে। মিসেস সেডলি, কাজের মেয়েটি এবং মিসেস ক্ল্যাপ উপস্থিত রইলেন। সমস্ত সময়টুকুই কেঁদে পার করলেন মিসেস সেডলি। ক্যাপ্টেন ডবিন জর্জের বেস্ট ম্যান হলো। মিস্টার সেডলি মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতি জানানোয় জোসেফকে দায়িত্ব নিতে হলো। জর্জের বোনেরাও কেউ আসেনি। তাদের বাবা কড়াকড়িভাবে বিয়েতে যোগ দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

নববিবাহিত দম্পতি মধুচন্দ্রমার জন্যে ব্রাইটনকে বেছে নিল। প্রেমিককে একাকী কাছে পেয়ে খুশির সীমা রইল না অ্যামেলিয়ার। জর্জও অ্যামেলিয়াকে পেয়ে খুশি, তবে কদিন পর থেকেই ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে

উঠতে লাগল সে।

একদিন বিকেলে সমুদ্রের পার থেকে হেঁটে ফিরছে স্বামী-স্ত্রী। এসময় হঠাৎই রেবেকা আর তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। মিস ক্রলি হাওয়া বদল করতে এসেছেন ব্রাইটনে, তাঁর পিছু পিছু এসেছে এরা দুজন। বৃদ্ধা পার্ক লেনে দেখা করতে রাজি হননি ওদের সঙ্গে। মহাখাপ্পা হয়ে রয়েছেন তিনি। রেবেকার আর রডনের ধারণা ব্রাইটনে ফুফুকে পটিয়ে ফেলতে পারবে, ক্ষমা পেয়ে যাবে।

পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হতেই রেবেকা জড়িয়ে ধরল অ্যামেলিয়াকে। তাদের স্বামীরাও করমর্দন করল। এরপর থেকে দু জোড়া দম্পতির প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল পরস্পরের বাড়িতে। পুরুষরা কার্ড খেলে সময় কাটায় আর মহিলা দুজন গল্পগুজব করে। দীর্ঘদিন বাদে বান্ধবীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো অ্যামেলিয়া। পুরোদমে উপভোগ করতে লাগল নতুন জীবন।

রেবেকা আর রডন লাট সাহেবদের মত বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে। অথচ এ ধরনের জীবন যাত্রা ওদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রচুর দেনা ওদের। কিন্তু সে নিয়ে মাথা ঘামায় কে? হোটেলের সেরা ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছে ওরা। বিল মেটানোর সামর্থ্য নেই রডনের। সেজন্যে কোন উদ্বেগও তার নেই।

জোস সেডলি একদিন এল অসবর্নদের বাড়িতে। সে, রডন আর জর্জ মিলে জুয়ার আড্ডা বসাল। জিতে নেয়া জুয়ার টাকায় মানিব্যাগ ফুলিয়ে ফেলল রডন।

সবকিছু চলছিল বেশ ভালভাবেই। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই; ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে ওরা। কিন্তু এত সুখ কপালে সইল না ওদের। ডবিন একদিন খবর নিয়ে এল। দুঃসংবাদ। জর্জের বাবা ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না ঠিক করেছেন। ছেলেকে বাদ দিয়েছেন উইল থেকে। বাবার কাছ থেকে একটি পয়সাও পাবে না জর্জ। তবে ওর জন্যে গচ্ছিত মায়ের দু হাজার পাউণ্ড দেয়া হবে ওকে। দুঃসংবাদের এখানেই শেষ নয়। জানা গেল, যুদ্ধক্ষেত্রে কদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছে সেনাবাহিনী, বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে।

অ্যামেলিয়া আর রেবেকা ব্রাসেলস পর্যন্ত সঙ্গ দিল স্বামীদের। সেনাবাহিনী জড়ো হচ্ছে ওখানে। প্রস্তুতি চলছে। যুদ্ধ বাধবে ফ্রান্সের সঙ্গে। জোসেফও এল ব্রাসেলসে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের, ব্রাসেলসের চাকচিক্য দেখে। পুরো শহরটা জুড়েই যেন মায়ার আর প্রলোভনের জাল ছড়ানো

রয়েছে। এর আবেদনকে উপেক্ষা করার সত্যিই যেন কোন উপায় নেই। দিনরাত চলছে জুয়ার আড্ডা, নাচগানের আসর। তাছাড়া থিয়েটার তো রয়েছেই। ব্রাসেলসের স্থাপত্যশিল্প দৃষ্টি কেড়ে নিল অ্যামেলিয়ার। বিদেশে এটাই ওর প্রথম সফর। মুগ্ধ হয়ে গেল ও। চমৎকার একটা হোটেলে উঠেছে ওরা। জর্জ এটা ওটা কিনে উপহার দিচ্ছে সর্বক্ষণ। (দু'হাজার পাউণ্ড বড্ড জ্বালাচ্ছে জর্জকে। টাকাগুলো উড়িয়ে দিতে পারলেই যেন শান্তি তার।) বাড়িতে মার কাছে চিঠি লিখল অ্যামেলিয়া। জানাল, খুব সুখী সে। তার জর্জ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ স্বামী। ওর মত মানুষ হয় না!

তবে বেশিদিন সুখের সাগরে ভাসতে পারল না অ্যামেলিয়া। ওর বিবাহিত জীবনে কালো মেঘ ছায়া ফেলতে শুরু করল হঠাৎই, ইদানীং প্রায়ই জর্জ আর রেবেকা ঘুরতে বেরোয়। সবই দেখে অ্যামেলিয়া। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও মুখ বুজে সয়ে যায়। জর্জের ওপর অনেক বিশ্বাস তার।

প্রতিদিন সন্ধেয় অ্যামেলিয়াকে ঘরে রেখে 'রেজিমেন্টের কাজে' বাইরে চলে যায় জর্জ। আসলে যায় সে ক্রলিদের বাসায়। জুয়ার আড্ডায় স্বামীর কাছে বার বার হারলেও স্ত্রীকে ইতোমধেই আসক্ত করে ফেলেছে বলে ধারণা ওর।

অ্যামেলিয়া জর্জকে কিছু না বললেও দাম্পত্য জীবন ধীরে ধীরে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। ইদানীং বেকির সঙ্গেও আগের মত আন্তরিক ব্যবহার করতে পারে না সে।

বারো

বহু প্রতীক্ষিত 'ডাচেস বল' সে রাতে অনুষ্ঠিত হবে। ব্রাসেলসের অভিজাত রমণীরা সুদর্শন পুরুষদের সঙ্গে নাচবে আজ। অ্যামেলিয়ার জন্যে নতুন একটা ড্রেস আর গয়না কিনেছে জর্জ। তারপর ওকে নিয়ে চলে গেছে বল-এ। বলরুমের দরজার পাশে একটা চেয়ারে স্ত্রীকে একা বসিয়ে রেখে কেটে পড়েছে জর্জ। তার অবশ্য এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই। স্ত্রীকে দামী পোশাক, গহনা কিনে দিয়েছে, সঙ্গে করে বলরুমে নিয়ে এসেছে এই-ই তো যথেষ্ট। আর কি চাওয়ার থাকতে পারে একটা মেয়ের? এখানকার কাউকেই চেনে না এমি। চরম অস্বস্তিবোধ করছে সে। এ সময় ডবিন এগিয়ে এল ওর দিকে।

অ্যামেলিয়া না পারলেও রেবেকা কিন্তু সাড়া ফেলে দিয়েছে উপস্থিত সবার মধ্যে। পুরুষদের অনেকেই পরিচিত তার সঙ্গে। তারা এগিয়ে এল, ঘিরে ধরল ওকে। নাচতে হবে তাদের সঙ্গে। ওদের এড়িয়ে গেল রেবেকা। চলে গেল অ্যামেলিয়ার কাছে। আন্তরিকতার সঙ্গে কুশল জানতে চাইলেও উদ্দেশ্য আসলে ভিন্ন তার। মুহূর্ত পরেই অ্যামেলিয়ার পোশাকের, চুলের স্টাইলের, জুতোর সব কিছুরই খুঁত বার করে ফেলল সে।

'এভাবে কেউ পার্টিতে আসে নাকি?' বাঁকা হেসে বলল রেবেকা।

মাথা নিচু হয়ে গেল অ্যামেলিয়ার।

এতেও সন্তুষ্ট হলো না রেবেকা। জর্জের বদভ্যাসের জন্যে দুষতে লাগল অ্যামেলিয়াকে।

'ঈশ্বরের দোহাই, তোমার স্বামীকে ঠেকাও। নইলে জুয়া খেলে ফতুর হয়ে যাবে। প্রতি রাতে আসে আমাদের বাড়িতে। খেলে আর হারে, তবু হুঁশ হয় না। তোমার চোখে কি কিছুই পড়ে না? স্বামীর খোঁজখবর রাখতে হয়, না কি?'

একটানা বকেই চলছিল সে। জর্জ অসবর্ন এসে থামাল তাকে। স্ত্রীকে নয়, সে ডাকতে এসেছে রেবেকাকে; নাচার জন্যে। জর্জের বাহু পেঁচিয়ে চলে গেল বেকি। তার ফুলের তোড়া আর শালটা রেখে গেল অ্যামেলিয়ার হেফাজতে।

বেচারী অ্যামেলিয়া অসহায়ের মত চেয়ে রইল ওদের দিকে।

রেবেকার সঙ্গে কয়েক দফায় নাচল জর্জ। ওদিকে অবহেলিত অ্যামেলিয়া বসে রইল এক কোণে, নিশ্চুপ। এ সময় ফিরে এল জর্জ। রেবেকার শাল আর ফুলের তোড়া নেবে। চলে যাচ্ছে রেবেকা। মেয়েটি অ্যামেলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ভদ্রতাটুকুও দেখাল না। অ্যামেলিয়া কেবল চেয়ে চেয়ে দেখল জর্জ ছোটাছুটি করছে। স্ত্রীকে যেন চোখেই পড়ছে না তার।

ফুলের তোড়াটা নিয়ে চলে গেল জর্জ। ফিরিয়ে দিল ওটার মালিককে। ছোট্ট একটা চিরকুট গোঁজা রয়েছে তোড়াটায়। ওটা নজর এড়াল না রেবেকার। মৃদু হাসল সে। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল জর্জের হাত। তারপর একবার কটাক্ষ করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। উত্তেজনায় দমাদম হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে তখন জর্জের বুকে।

অ্যামেলিয়া চিরকুটটা দেখতে পায়নি। কিন্তু তবুও ভীষণ নাড়া খেয়েছে সে। এ মুহূর্তে অসহ্য ঠেকছে সব কিছু।

'উইলিয়াম,' কাছেই দাঁড়ানো ডবিনকে ডাকল সে, 'আপনি আমার

একটা উপকার করবেন? আমার…আমার কেমন যেন লাগছে। আমাকে একটু হোটেলে পৌঁছে দেবেন?'

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অ্যামেলিয়া জানলও না কোন্ ফাঁকে সে ডবিনকে তার নাম ধরে ডেকে ফেলেছে। ডবিন ওকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। সোজা বিছানায় গিয়ে পড়ল এমি, তবে দু চোখের পাতা এক করতে পারল না।

ওদিকে জর্জ তখন সোল্লাসে জুয়া খেলে চলেছে। জিতছেও ক্রমাগত।

'কপালটা খুলে গেছে আজ,' বলল সে। মদে চুর হয়ে রয়েছে, অকারণে হাসছে। এ অবস্থায় ডবিন হাজির হলো সেখানে।

'জর্জ, যাবে এসো,' বলল সে। 'আর মদ খেতে হবে না। শত্রুবাহিনী মার্চ শুরু করেছে। তিন ঘণ্টার মধ্যে পাল্টা আক্রমণ করতে হবে।'

খবরটা শুনে অনেকখানি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জর্জ। রেবেকার সঙ্গে ওর সম্পর্কের ব্যাপারটা এখন কি হবে? অতীত জীবনের কথা মনে পড়ল ওর। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখল। যুদ্ধে ও মারা গেলে তখন? অ্যামেলিয়ার কি হবে? ওদের অনাগত সন্তানটির ভবিষ্যৎ কি? অ্যামেলিয়ার প্রতি এতদিন কত অন্যায়ই না সে করেছে! বাবাও কি ওকে কম ভালবাসতেন? তাঁর প্রতিও কি অন্যায় করেনি সে? এমনি নানা প্রশ্ন ভিড় জমাল ওর মনে।

হোটেলে ফিরে এল জর্জ। শোবার ঘরে গিয়ে দেখল অ্যামেলিয়া ঘুমাচ্ছে। বাবাকে বিদায় জানিয়ে চিঠি লিখতে বসল ও। চোখ ভরে এল জলে।

চিঠি লেখা শেষে শোবার ঘরে ফিরে এল ও। প্রদীপের ম্লান আলোয় অ্যামেলিয়ার মিষ্টি অথচ বিষণ্ন মুখটা নজরে এল ওর। চোখ বোজা, একটা হাত বেরিয়ে রয়েছে চাদরের বাইরে। বড় পবিত্র দেখাচ্ছে ওকে। হু হু করে উঠল জর্জের অন্তরটা। বিছানার পাশে চলে এল ও। নিচু হয়ে চুমু খেল স্ত্রীর গালে। মুহূর্তে দুটো সাদা হাত জড়িয়ে ধরল ওর গলা।

'আমি জেগে আছি, জর্জ,' ফুঁপিয়ে উঠল এমি। ঠিক সে সময় বেজে উঠল একটা বিউগল। তারপর আরেকটা, আরও একটা। এবার শহরের চারদিক থেকেই ভেসে আসতে লাগল সুর। এসে গেছে যুদ্ধের ডাক!

সূর্য তখন সবে উঠি উঠি করছে। জর্জের রেজিমেন্ট ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রের দিকে মার্চ শুরু করল। হোটেল অতিক্রম করার সময় অ্যামেলিয়ার দিকে চাইল জর্জ, ম্লান হাসল। জানালায় দাঁড়ানো অ্যামেলিয়া। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। রেজিমেন্ট নিয়ে এগিয়ে চলল জর্জ। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল বিউগলের সুর।

তেরো

পেরদিন সকালে অ্যামেলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এল রেবেকা। বান্ধবীর জন্যে ভালবাসা না থাকলেও করুণা বোধ করছে সে। উপলব্ধি করছে, সহানুভূতি জানানো উচিত অ্যামেলিয়াকে।

ব্যাপারটায় হিতে বিপরীত হলো। সাম্প্রতিক অতীতের অসহ্য স্মৃতি আর ঈর্ষা ক্ষুব্ধ করে রেখেছে অ্যামেলিয়াকে। রেবেকা ওকে জড়িয়ে ধরার জন্যে এগোতেই পিছিয়ে গেল সে। মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল ওর চেহারা। ঠাণ্ডা চোখে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে চাইল সে। বিস্মিত হয়ে গেল রেবেকা।

'এমি, শরীর খারাপ নাকি?' জানতে চাইল রেবেকা। হাত ধরল বান্ধবীর। 'তুমি কেমন আছ দেখতে এলাম।'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল এমি, এ জীবনে এই প্রথমবারের মত। কাঁপছে।

'কেন এসেছ?' চোখের দৃষ্টি এতটুকু বদলায়নি ওর।

'ও বোধহয় জর্জকে দেখেছে আমাকে কাগজ দিতে,' ভাবল রেবেকা। 'রাগছ কেন, অ্যামেলিয়া?' মাথা নিচু হয়ে গেছে রেবেকার। 'আমি তোমার খোঁজ খবর নিতেই এসেছি।'

'তার দরকার নেই,' বলল অ্যামেলিয়া, 'তুমি নিজে ভাল আছ? থাকারই তো কথা।' এক মুহূর্তের জন্যে থামল ও। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'তোমার সঙ্গে কখনও আমি দুর্ব্যবহার করেছি, রেবেকা? বলো।'

'কখনোই না,' বলল রেবেকা। মাথা তখনও মাটির দিকে।

'তোমার দুরবস্থায় পাশে থাকিনি আমি? বোনের মত দেখিনি তোমাকে? কিন্তু বিনিময়ে কি করলে তুমি? আমার এতবড় সর্বনাশ করতে পারলে? আমাদের মাঝখানে কেন এসেছ তুমি? কেন ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছ? পারবে ওকে আমার মত ভালবাসতে? পারবে না। তুমি এত নীচ! স্বামীর প্রতিই বা কি দায়িত্ব পালন করছ তুমি?'

'এটুকু বলতে পারি, স্বামীর প্রতি কোন অন্যায় করিনি,' বলল রেবেকা।

'আর আমার সঙ্গে? চেষ্টা করেছিলে, পারোনি।'

'হুঁহ্! ও কিছুই জানে না,' ভাবল রেবেকা।

'জানতাম ও আমার কাছে ফিরে আসবেই। এসেওছে,' আবেগে কেঁপে

উঠল অ্যামেলিয়ার গলা। 'আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে ওকে কেড়ে নিতে চাও? ওকে মোটেও কাছে পাইনি আমি, এই তোমার জন্যে। আমার অবস্থা দেখে মজা পেতে এসেছ? গত কয়েকদিনে তুমি শেষ করে দিয়েছ আমাকে। আজই বা আসার কি এমন দরকার পড়ল?'

অ্যামেলিয়ার চোখে চোখ রাখতে ব্যর্থ হলো রেবেকা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওকে যেন ভুলেই গেছে এমি। জর্জের একটা কাপড় তুলে নিয়ে চুমু খেল। পাগলের মত পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভেতর। নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল রেবেকা।

'অ্যামেলিয়া কেমন আছে?' সিঁড়িতে ওকে জিজ্ঞেস করল জোসেফ। বোনের খোঁজে আসছিল সে।

'ভাল নয়,' জবাব দিল রেবেকা। 'ওর সঙ্গে এখন কারও না কারও থাকা দরকার,' গোমড়া মুখে বাড়ির পথ ধরল ও। উপেক্ষা করল জোসের ডিনারের দাওয়াত।

রেবেকা যদিও বলল কারও থাকা উচিত অ্যামেলিয়ার সঙ্গে, কিন্তু থাকবেটা কে? তার নিজের এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। যত্তসব ফালতু ঝামেলা! কে পোহাতে যায় এসব?

জর্জের দেয়া ফুলগুলো তাজা পানিতে রাখল সে। তোড়ার ভেতরকার চিরকুটটা আবার পড়ল।

'বোকা মেয়ে,' আপন মনে বলল সে। 'এটা দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারি ওকে। গর্দভটা যদি জানত কার জন্যে দুঃখ করছে, আহারে! ব্যাটা আমাকে পালানোর জন্যে ফুসলাচ্ছিল! ওর চেয়ে আমার রডন শতগুণে ভাল।'

কামানের গর্জন আর বন্দুকযুদ্ধ পুরোদমে চলছে এখন ব্রাসেলসে। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত স্বামীদের চিন্তায় উদ্বেগাকুল হয়ে রয়েছে স্ত্রীরা। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে কি এঁটে উঠতে পারবে তাদের সেনাবাহিনী? রেবেকার প্রায়ই মনে পড়ে রডনের কথা। জর্জের জন্যে প্রায় সর্বক্ষণই প্রার্থনা করে এমি। সে কি জানে যুদ্ধের ময়দানে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে তার প্রাণপ্রিয় জর্জ? একটা বুলেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে ওর বুকটা–আর কোনদিন সামনে এসে দাঁড়াবে না ও, হাসবে না, কথা বলবে না।

চোদ্দ

পেরিয়ে গেছে বারোটি মাস। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠতে বেগ পেতে হয়েছে অ্যামেলিয়াকে। ডাক্তারদের ধারণা হয়েছিল, হয় মারা পড়বে নয়ত পাগল হয়ে যাবে ও। এ ঘটনার পর ওর কোল জুড়ে এল সন্তান- ওর ছেলে। বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে অনেকখানি সান্ত্বনা পেয়েছিল সে। বাচ্চাটার চোখ জোড়া অবিকল বাপের মত। ভালবাসায় ভরে উঠেছে মায়ের বুক। আশায় আবারও বুক বেঁধেছে সে। নিরাপদ বোধ করছে।

ডবিন ওকে ইংল্যাণ্ডে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বাচ্চাটাকে ইতোমধ্যেই ভালবেসে ফেলেছে ডবিন, ধর্মপুত্র করেছে। অনবরত এটা ওটা উপহার নিয়ে হাজির হয়ে যায় সে। তবে শুধু যে ছেলের জন্যে আনে তাই নয় আনে বাড়ির সবার জন্যেই। বাড়িওয়ালার ছোট মেয়েটাও পছন্দ করে ফেলেছে তাকে।

বাচ্চার জন্যে একদিন কাঠের ঘোড়া, ড্রাম, ট্রাম্পেট আরও অন্যান্য খেলনা নিয়ে এল ডবিন। ছেলেকে যোদ্ধা বানাবে যেন। ওর ছেলেমানুষী দেখে হেসে ফেলল সবাই।

'বিদায় নিতে এসেছি, অ্যামেলিয়া,' একথা-ওকথার পর বলল ডবিন। আলতো করে তুলে নিল অ্যামেলিয়ার একটা হাত।

'বিদায়? যাচ্ছেন কোথায়?' মৃদু হেসে জানতে চাইল এমি।

'ভারতে। চিঠি লিখবে তো? বহুদিন থাকতে হবে।'

'জর্জির কথা অবশ্যই লিখব,' কথা দিল এমি। 'দেখুন না কিভাবে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে।' বিছানায় শুয়ে রয়েছে জর্জি।

ছোট্ট একটা গোলাপী হাত ডবিনের আঙুল চেপে ধরল। অ্যামেলিয়া চাইল ডবিনের দিকে। জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া, গর্বে। হতাশ হলো ডবিন। অ্যামেলিয়ার চোখে আরও কিছু কি আশা করেছিল সে? মা-ছেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। খানিকক্ষণ ভেবে পেল না কি বলবে। অবশেষে কোনমতে বলতে পারল, 'ভাল থেকো।'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন,' পাল্টা বলল এমি। চুমু খেল ডবিনের গালে। জর্জি তখন ঘুমিয়ে কাদা।

দরজার দিকে ভারী পায়ে এগোল ডবিন। তার কোচের চাকার শব্দ

শুনতে পেল না এমি। সে তখন জর্জিকে নিয়ে ব্যস্ত, ঘুমের মধ্যে হাসছে ও।

কেটে গেছে আরও কয়েক বছর। ছেলেকে নিয়ে মেতে রয়েছে এমি। ছেলেই তার ধ্যান, জ্ঞান- সব কিছু। ছেলে দেখতে হয়েছে বাপের মত। অ্যামেলিয়া যেন তার হারানো স্বামীকে ফিরে পেয়েছে জর্জির মধ্যে। ছেলেটি বাপের স্বভাব পেয়েছে। উদ্ধত, তবে মাকে ভালবাসে খুব। শাসনও করে।

ডবিন ওদিকে জর্জির জন্যে ক্রমাগত উপহার পাঠিয়ে চলেছে। ও ছ বছরে পা দিলে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল সে। ডবিনকে বছরে মাত্র দু তিনটে চিঠি লেখে অ্যামেলিয়া। তাও আবার সেগুলোতে থাকে কেবল ছোট্ট জর্জির কথা। এমির চিঠিগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছে ডবিন। জর্জি ও তার মাকে সর্বক্ষণ মনে পড়ে ওর, দেখতে ইচ্ছে করে।

ডবিনের অনুরোধে মাঝেমধ্যে ফুলহ্যামের বাড়িতে আসে ওর বোনেরা। ক্যারিজে করে ঘুরতে নিয়ে যায় এমি আর জর্জিকে। ক্যারিজটা খুব পছন্দ জর্জির, কাজেই বাধ্য হয়ে এমিকেও যেতে হয় তার সঙ্গে। প্রায়ই জর্জি সময় কাটায় ডবিনের বোনদের সঙ্গে, ওদের বাড়িতে।

সেডলিদের অবস্থা পড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। জোসেফের পাঠানো টাকা মিস্টার সেডলির দেনা শুধতেই ফুরিয়ে যায়। দেনার দায় বাড়ছেই তাঁর। ভদ্রলোক নিয়ত নতুন নতুন ব্যবসা করার চেষ্টা করেন এবং মার খান। জর্জের মৃত্যুর পর পাওয়া পাঁচশো পাউণ্ডও উড়িয়ে দিয়েছেন মিস্টার সেডলি। এই পাঁচশো পাউণ্ড অ্যামেলিয়ার জানা মতে জর্জের রেজিমেন্ট থেকে এসেছিল। আসলে তা নয়। ডবিন পাঠিয়েছিল টাকাটা। এছাড়াও জর্জের শেষকৃত্যের এবং অ্যামেলিয়ার অসুস্থতার সময়কার সমস্ত খরচও জুগিয়েছে সে। অ্যামেলিয়া অবশ্য এসবের কিছুই জানে না।

অভাব বেড়ে চলেছে ফুলহ্যামের ছোট্ট বাড়িটিতে। জর্জির কাপড় চোপড়ের খরচ আর স্কুলের বেতন মেটাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারী অ্যামেলিয়া।

পনেরো

একদিন সন্ধ্যায় ডবিনের বোনদের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এল জর্জি। ওর গলায় ঝোলানো সোনার চেনওয়ালা একটা ঘড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল অ্যামেলিয়া। কোত্থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করল।

'এক মহিলা দিয়েছে। বিচ্ছিরি দেখতে। আমাকে চুমু খেল, কাঁদল, আমার ফুফু হয় নাকি,' মাকে জানাল জর্জি। 'ওকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি।'

ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল এমির। মহিলা নিশ্চয়ই জর্জের বোন। ওর কাছ থেকে কি বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে? উহ্, কী ভয়ংকর!

ওদিকে মিস অসবর্ন তার বাবাকে জানাল ছেলেটিকে দেখেছে। 'যা সুন্দর হয়েছে না!' বলল সে, 'ঠিক জর্জের মত।'

বৃদ্ধ মিস্টার অসবর্ন আর সইতে পারলেন না। লাল হয়ে গেল তাঁর মুখ। কাঁপছেন।

কদিন বাদে জর্জি বাড়ি ফিরে মাকে জানাল এক বুড়ো ভদ্রলোক নজর রাখছিলেন ওর ওপর।

'কিছুতেই চোখ সরায় না,' বলল সে, 'খালি কাঁপছিল। ফুফুও ছিল, কাঁদতে দেখলাম। দেখা হলেই কাঁদে।'

অ্যামেলিয়ার বুঝতে বাকি রইল না, জর্জির দাদা দেখে ফেলেছেন তাকে। মুখ শুকিয়ে গেল ওর। জানে, চিঠি আসবে। এলও, কদিন পরেই। মিস্টার অসবর্ন লিখেছেন, জর্জিকে নিজের কাছে রাখতে চান। ছেলের সম্পত্তির উত্তরাধিকার করতে চান ওকে। তাছাড়াও জানিয়েছেন, মিসেস জর্জ অসবর্নকে ভাতা প্রদান করবেন তিনি। খেয়ে পরে ভালভাবেই কেটে যাবে তার জীবন। এমনকি মিসেস অসবর্ন আবার বিয়ে করবে বলে যে কানাঘুষা চলছে তা যদি সত্যিও হয় তবু ভাতা বন্ধ করা হবে না। তার বোঝা উচিত, রাসেল স্কয়্যারে দাদার বাড়িতেই ভাল থাকবে জর্জি। মাঝেমধ্যে মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে ছেলে।

মিস্টার অসবর্নের উকিল চিঠিটি নিয়ে এসেছে। পুরোটা পড়া শেষ করে রাগে কাঁপতে লাগল অ্যামেলিয়া। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ওটা ছড়িয়ে দিল মেঝেতে।

'টাকার বিনিময়ে সন্তানকে বিকিয়ে দেব? এতবড় স্পর্ধা উনি কোথায় পেলেন? মিস্টার অসবর্নকে জানাবেন আমি এ চিঠির জবাব দেব না। আপনি এখন আসুন।'

চলে গেলেন উকিল।

উকিল যখন এসেছিলেন তখন অ্যামেলিয়ার বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না। তাঁদেরকে কিছু জানালও না অ্যামেলিয়া, বলে কি হবে? তাঁরা নিজেদের জ্বালাতেই অস্থির। জোসেফ আর টাকা পাঠাচ্ছে না– অন্তত মিস্টার সেডলি স্ত্রীকে আর মেয়েকে তাই এ[illegible] আবার দেনা জমে গেছে, জর্জিও খাবারের আর কাপড়ের মান নি[illegible]ই কথা তোলে, মুখ কালো করে। ভীষণ বিপদে পড়ে গেল এমি। ক্রিসমাসের সময় পরিস্থিতি ঘোলাটে হলো আরও। এমি যখন জানাল নতুন কাপড় কিনে দিতে পারবে না তখন কান্নায় ভেঙে পড়ল জর্জি।

'তবে কথা দিয়েছিলে কেন?' কাঁদতে কাঁদতে বলল জর্জি। 'ক্রিসমাসে সবাই নতুন কাপড় পরবে। আমাকে নিয়ে হাসবে ওরা।'

কিন্তু চুমু আর আদর ছাড়া আর কিছুই তো দেয়ার নেই বেচারী এমির। হঠাৎ তার মনে পড়ল ডবিন ভারত থেকে চমৎকার একটা শাল পাঠিয়েছিল। ওটা বেচে দিলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমন কাজ। বিশ গিনিতে বিকাল ওটা। তক্ষুণি কাছের বইয়ের দোকানটায় ছুটল এমি। কটা বই কিনল জর্জির জন্যে। বাড়ি ফিরেই প্যাকেটের ওপর লিখে ফেলল সে–

জর্জ অসবর্নকে,

মায়ের দেয়া ক্রিসমাস উপহার।

স্মিত হেসে প্যাকেটটা নিয়ে জর্জির ঘরের দিকে চলে গেল ও, যাতে স্কুল থেকে ফিরেই বইগুলো পেয়ে যায় তার ছেলে। বারান্দায় মায়ের সঙ্গে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওগুলো কি?'

'জর্জির জন্যে কয়েকটা বই কিনেছি,' জবাব দিল অ্যামেলিয়া। 'ক্রিসমাসে কিছু তো দেয়া দরকার।'

'বই!' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'পেটে খাবার নেই আর তুমি বই কিনে বেড়াচ্ছ? বাড়ি ভাড়ার কথা ভেবেছ একবারও? ছেলেটাকে আর কত লাই দেবে শুনি? বুড়ো বাপটার জন্যে একটু মায়াও হয় না তোমার?'

ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলেন মিসেস সেডলি। প্রতিবেশীদের অনেকেই শুনল তাঁর কান্না।

'মা, শোনো,' সামাল দিতে চেষ্টা করল এমি। 'আমার শালটা বেচে

এগুলো কিনেছি। নাও,' বাকি গিনিগুলো মায়ের হাতে গুঁজে দিল ও।

নিজের ঘরে গিয়ে কেঁদে মন হালকা করল এমি। মা প্রায়ই দোষ দেন ওকে। এই দুঃসময়ে ও নাকি জর্জির জন্যে প্রচুর ফালতু খরচ করে। উনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এটুকু বোঝেন না যে জর্জ অসবর্নের ছেলের এরচেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় থাকার কথা। তবে কি দাদুর কাছেই জর্জিকে পাঠিয়ে দেয়া উচিত? হ্যাঁ, অন্য কোন উপায় তো নেই। তবে এক্ষুণি নয়– পরে।

ষোলো

অ্যামেলিয়া ভারতে চিঠি পাঠাল। জোসকে অনুরোধ করল এই বিপদের মুহূর্তে নিয়মিত টাকা পাঠাতে। চিঠির বিষয়বস্তু বাবাকে জানাল ও। ভাবল, বাবা হয়ত খানিকটা স্বস্তি পাবেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। বুড়োমানুষটি স্বীকার করলেন, জোসেফ টাকা পাঠানো বন্ধ করেনি। পাঠাচ্ছে আগের মতই। কিন্তু ধার শোধ করতে হচ্ছে বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। কথাগুলো বলে ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন বৃদ্ধ। বাবার জন্যে দুঃখ হলো এমির। তবে এ ঘটনার ফলে স্থির সিদ্ধান্তেও পৌঁছে গেল সে। জর্জিকে দাদুর কাছে পাঠিয়ে দেবে। বাবার দিকের আত্মীয়দের কাছেই ভাল থাকবে বাচ্চাটা।

পরদিন অ্যামেলিয়ার কাছ থেকে চিঠি পেল জর্জের বোন। এ বোনটি রাসেল স্কয়্যারেই থাকে। চিঠি পেয়ে খুশি হয়ে উঠল সে। ছুটল বাবাকে খবরটা জানাতে। কি কারণে এমি ছেলের ব্যাপারে মত পাল্টেছে তাও বলল। ওর বাবা দেনার দায় থেকে মুক্তি পাননি এখনও। সে যে সামান্য ভাতা পায় তাতেও ছেলের খরচ চালানো কঠিন। তার আশা অসবর্নদের কাছে ছেলের অনাদর হবে না। তবে এমি এ-ও জানিয়েছে, সে লিখিত প্রতিশ্রুতি চায়। যখন ইচ্ছে তখন ছেলেকে দেখতে আসতে পারবে ও। এই চুক্তি ছাড়া ছেলেকে কাছ ছাড়া করবে না সে।

'যাক্, মিসেস ডাঁটিয়াল তবে মাটিতে নেমেছে,' বললেন মিস্টার অসবর্ন। 'জানতাম, নামবেই। পেটে খাবার নেই! হাঃ হাঃ!' পড়ার ঘরে চলে গেলেন ভদ্রলোক। ফিরে এলেন একটা চাবি নিয়ে। ওটা ছুঁড়ে দিলেন মেয়ের দিকে।

'আমার ঘরের ওপরেরটা গোছগাছ করিয়ে দাও,' বললেন মিস্টার অসবর্ন।

'আচ্ছা,' বলল মিস অসবর্ন। সামান্য কেঁপে উঠল। ঘরটা জর্জ অসবর্নের। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। ওর কিছু কিছু জিনিস ঠিক সেই আগেকার মত করেই রাখা আছে, কেউ হাত দেয়নি। ওগুলো দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল মিস অসবর্ন। গা ছেড়ে দিল বিছানায়।

'পুরানো দিনগুলো আবার ফিরে আসছে,' বলল হাউজকিপার, 'ছেলেটার এখানে ভালই লাগবে।'

জানালা খুলে দিল সে। পথ করে দিল তাজা বাতাস ঢোকার।

ঘর গুছিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করল মিস অসবর্ন।

'জর্জির মাকে কিছু টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করো,' বললেন মিস্টার অসবর্ন। 'একশ পাউণ্ড পাঠিয়ে দাও।'

'আমি বরং ওর সঙ্গে দেখা করি?' জানতে চাইল জর্জির ফুফু।

'তোমার খুশি। তবে ও যেন এ বাসায় না আসে,' সাফ জবাব দিলেন মিস্টার অসবর্ন।

'বাবা, এই নাও,' সে রাতে চুমু খেয়ে একশ পাউণ্ডের চেকটা মিস্টার সেডলির হাতে ধরিয়ে দিল এমি। 'মা, তুমি আর ভেবো না। জর্জি...জর্জি এখানে আর বেশিদিন থাকছে না।'

গলা ধরে এল এমির। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে চলে গেল।

পরে ছেলেকে সব কথা জানাল সে। শুনে বিন্দুমাত্র মন খারাপ করল না জর্জি। উল্টে, বন্ধুদের জানাল শিগ্গিরই বড়লোক হয়ে যাচ্ছে ও। ক্যারিজে চেপে ঘুরে বেড়াবে, অনেক ভাল স্কুলে পড়বে।

ছেলেকে বিদায় দেয়ার দিন দেখতে দেখতে চলে এল। জর্জির জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিল এমি। টপ টপ করে অশ্রু ঝরছে জর্জির বই, খেলনা ইত্যাদির ওপর। যত্ন করে সব গুছিয়ে দিল মা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে সবই দেখল জর্জি। কিন্তু মায়ের অন্তরের ব্যথা ছুঁতে পারল না ওকে।

নির্দিষ্ট সময়ে চলে এল ক্যারিজ। হাসিমুখে ওতে চেপে বসল জর্জি। হাত নেড়ে ছেলেকে বিদায় জানাল মা। চুরমার হয়ে যাচ্ছে ওর হৃদয়। তাতে কার কি?

সতেরো

রেবেকা আর তার স্বামীর কি খবর?

ওয়াটারলুর যুদ্ধে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে রডন। কর্নেল পদে উন্নীত হয়েছে। যুদ্ধ শেষে স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিস গিয়েছে সে, শীতের ছুটি কাটাতে। বেশ ফুর্তিতেই রয়েছে ওরা। প্যারিসে সাড়া ফেলে দিয়েছে বেকি। ভদ্রমহিলারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, সে সত্যিই অনন্যা। ফরাসি ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলে ও। মিশে গেছে সে ফরাসি মহিলাদের সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, অল্প কদিনেই স্বামী-স্ত্রী সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। দেনার দায় ভালমতই চেপেছে ওদের ঘাড়ে।

যাহোক, লণ্ডনে ফিরে এল ওরা। ফুফুর কাছ থেকে কিছু আদায় করার জন্যে নানা রকম চেষ্টা চরিত্র করতে লাগল। মিস ক্রলির স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে। দিন ফুরিয়ে এসেছে তাঁর। কিন্তু ভদ্রমহিলা ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। ওদের প্রতি বিরাগ আরও বেড়েছে তাঁর। এর কারণ খবরের কাগজের একটি ঘোষণা:

'২৬ মার্চ কর্নেল রডন ক্রলির স্ত্রীর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে।'

রাগে অন্ধ হয়ে গেলেন বৃদ্ধা। বড় ভাইপোকে ডেকে পাঠালেন। সম্প্রতি সে লেডি জেন সাউথডাউনকে বাগদত্তা করেছে। ভদ্রমহিলা ভাইপোকে এক্ষুণি বিয়ে করার জন্যে জোরাজুরি আরম্ভ করলেন। কথা দিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় বছরে এক হাজার পাউণ্ড করে দিতে থাকবেন। এ ছাড়া মৃত্যুর পরে সম্পত্তির সিংহ ভাগ তো পাবেই সে।

ফুফুর কথা ফেলতে পারল না পিট। বিয়ে করল। ফুফু অল্পদিনেই লেডি জেনের ভক্ত হয়ে গেলেন। রেবেকা আর রডনের নাম এখন শুনতে পারেন না তিনি। ওদের কিছু দেবেন না সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বেকি বুঝল, আশা শেষ। রডনকে সেনাবাহিনীর চাকরি ছাড়তে পরামর্শ দিল সে। যেভাবে হোক স্বামীকে ভাল কোন পদে বসাবেই সে। হয় ইংল্যাণ্ডে, নয়ত কোন কলোনিতে। তবে তার আগে নিজেকে সমাজের উঁচু স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। তো যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কার্জন স্ট্রিটে আবাস গাড়ল ওরা। লণ্ডনের বিলাসবহুল এলাকা এটি। রাজার হালে দিন কাটছে ওদের– যদিও রোজগার নেই এক পয়সাও।

প্রথমদিকে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত মহিলারা উপেক্ষা করল বেকিকে। রডন তো খেপে লাল। কিন্তু বেকি কেবল হাসে।

'অত ভেবো না তো,' স্বামীকে সান্ত্বনা দেয় সে। 'মনে নেই কি ছিলাম আমি? গর্ভনেস থেকে আজকের অবস্থায় এসেছি। দেখবে কদিন পরেই আর বন্ধুর অভাব হবে না। তুমি কেবল বউয়ের কথা মত কাজ করে যাবে। শোনো...' ভবিষ্যতের পরিকল্পনা খুলে বলল ও, 'যে করে হোক তোমার ভাই আর ভাবীর সঙ্গে খাতির জমাতে হবে। ওরাই আমাদের ভদ্র সমাজে মিশিয়ে দেবে। তাছাড়া তোমার বাপটা মরলে কুইন্স ক্রলিতে শীতে বেড়াতে যেতে পারব আমরা। আর পিটটাও তো রোগা পটকা। ফট করে মরেও যেতে পারে। তখন আর পায় কে? আশা ছাড়তে নেই, ডার্লিং।'

ওদিকে রডনের ফুফু মিস ক্রলি মারা গেছেন। পিটকে দিয়ে গেছেন সব টাকা পয়সা। তাই জেনে রডন ভাইকে খুব আন্তরিকতাপূর্ণ এক চিঠি লিখল। ভাই তো অবাক, ভাবীও খুশি। সে জানিয়েছে, ফুফুর টাকা ভাইয়ের ভোগে লাগছে বলে বড় আনন্দিত সে। ফুফুকে সে কতই না দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু ভাই ফুফুর সেই দুঃখ দূর করেছে। পিটের কোন তুলনা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরো চিঠিটাই লিখেছে বেকি। রডন কেবল কপি করেছে। শেষদিকে নিজের হাতে ক'লাইন লিখে জুড়ে দিয়েছে বেকি। লেডি জেনকে অভিনন্দন জানিয়েছে। পিটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভোলেনি; তার এতিম অবস্থায় কুইন্স ক্রলিতে তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে বলে। ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে শেষ করেছে চিঠি।

জবাবে পিট স্বাগতম জানিয়েছে রডনকে। যে কোন সময় সপরিবারে বেড়াতে আসতে পারে সে। তাছাড়া, ওদের ছেলের জন্যেও সম্ভাব্য সব সাহায্য করতে প্রস্তুত ও।

বেকির বুদ্ধির কল্যাণে দু ভাইয়ের আবার মিলমিশ হয়ে গেল। এখন কেবল জেনের ঘাড়ে চেপে সমাজে নিজেদের স্থান করে নেয়া বাকি। ভাশুর আর জাকে পাল্টা আমন্ত্রণ জানাল বেকি।

'জেন লণ্ডনে এলে,' স্বামীকে বলল বেকি, 'আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। পুরুষদের দৃষ্টি কাড়তে পারলেই যথেষ্ট। মহিলারা তখন আমাকে না ডেকে পারবে না।'

বেকির কথা ফলে গেল। জেনের মাধ্যমে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হলো ওর। বেশ কজন ভদ্রলোক তার প্রতি আগ্রহও প্রকাশ করতে শুরু

করেছেন ইদানীং। ডিনারের পর প্রায়ই তাঁরা কার্জন স্ট্রিটে সান্ধ্যকালীন আড্ডা জমাতে আসেন। তাঁদের জন্যে বরফ আর কফির সুবন্দোবস্ত রাখে বেকি। লেডি জেনের ভাই তরুণ লর্ড সাউথডাউন আর প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তিত্ব লর্ড স্টেইন ওদের বাড়ির নিয়মিত অতিথি।

আঠারো

রেবেকার ড্রইংরুমে ফায়ারপ্লেসের উষ্ণতা। ম্যান্টেলপিসটাকে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো মোমবাতি। সোফায় বসে থাকা রেবেকাকে মৃদু আলোয় আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। গোলাপী একটা ড্রেস পরেছে সে। গায়ে শাল। কোঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে গলার কাছটায়।

মোমবাতির আলোয় লর্ড স্টেইনের টাকমাথাটাও চকচক করছে। ভদ্রলোকের মাথায় সামান্য কগাছি লাল চুল। কুঁতকুঁতে চোখ জোড়ার ওপর ঘন ভ্রূ। মুখে অসংখ্য ভাঁজ। এই খাটো ভদ্রলোক যুবা বয়সে জুয়াড়ী হিসেবে দারুণ নাম কিনেছিলেন। এ মুহূর্তে অবশ্য রডনদের সঙ্গে তাসের আড্ডায় মাতেননি তিনি। রেবেকার সঙ্গই বেশি কাঙ্ক্ষিত তাঁর কাছে।

'মিসেস ক্রলির স্বামীর খবর কি?' রডনের সঙ্গে দেখা হলেই জানতে চান লর্ড স্টেইন। বড়ই দুরবস্থা বেচারা রডনের। সে আর কর্নেল ক্রলি নয়। তার পরিচয় এখন রেবেকার স্বামী হিসেবে।

তাদের ছেলেটি কেমন আছে? কোথায় আছে? বাড়িতে অতিথি এলে হয় ওকে চিলেকোঠায় নয়ত রান্নাঘরে বসিয়ে রাখা হয়। মা ওর প্রতি নজর দেয়ার সময় পায় না। এক ফ্রেঞ্চ নার্সের কাছে মানুষ হচ্ছে সে। রডন ছেলেকে খুব ভালবাসে। কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না সচরাচর, রেবেকার খোঁটার ভয়ে। ছেলেকে ভালবাসা যেন অপরাধ! ওকে নিয়ে হাসে রেবেকা; বলে, 'আর কত লাই দেবে?'

প্রতিদিন সকালে রডন শেভ করতে শুরু করলেই টুলে বসে ওকে দেখতে থাকে ছেলে। বাপ-বেটার খাতির আছে বেশ। ছেলের জন্যে ডিনারের পরে প্রায়ই মিষ্টি আর কেক নিয়ে আসে রডন। লুকিয়ে রাখে পুরানো একটা বাক্সে। খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলে ছেলের খুশি ধরে না। কিন্তু হাসতে পারে না প্রাণ খুলে। নিষেধ আছে। মা নিচের তলায় ঘুমায়। তার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না?

রেবেকা আছে বেশ সুখেই। তার মতে রডন নির্বোধ। তবে ফুটফরমাশ খাটার জন্যে মন্দ নয়। বিনা প্রশ্নে রেবেকার নির্দেশ পালন করে সে। অপেরায় নিয়ে যায়, বেড়াতেও যায়। যতক্ষণ অপেরা চলে ততক্ষণ ক্লাবে সময় কাটায় রডন। তারপর যথাসময়ে হাজির হয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনে স্ত্রীকে। এমন অনুগত স্বামী কজন পায়? বিনিময়ে ও কেবল আশা করে ছেলেটার প্রতি বেকির ভালবাসা।

রডনের ছেলেটি খুব মিশুক। সবার সঙ্গে অল্পতেই মিশে যেতে পারে। বেকির কিন্তু সহ্য হয় না ছেলেকে। আর অসুখ বিসুখ হলে তো কথাই নেই, দু 'চোখের বিষে পরিণত হয় তখন।

বেকির ছেলের বয়স তখন আট। একদিন বেশ রাতে ড্রইংরুমের দরজায় আড়ি পাতল সে। ভেতরে তখন তার মা লর্ড স্টেইনকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। হঠাৎই দরজা খুলে বেরিয়ে এল মা, আর ছেলেকে ওখানে দেখেই রক্ত চড়ে গেল তার মাথায়। কষে এক চড় বসাল ছেলের গালে। এক ছুটে রান্নাঘরে চলে গেল ছেলেটি।

'আমি…আমি গান শুনলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যায়?' ফোঁপাচ্ছে ও। 'ওই কুৎসিত টেকোটাকে গান শোনাতে পারে আর আমি কি দোষ করেছি?'

খানসামা, রাঁধুনি আর হাউজমেইড পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। কোন জবাব দিতে পারল না। ওরা জানে, লর্ড স্টেইনের সঙ্গে বেগম সাহেবার এখন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

এ ঘটনার পরে প্রায় শত্রুতে পরিণত হলো মা-বেটায়। ছেলেকে দেখলেই গা জ্বলে যায় মায়ের। ছেলেও মাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে। সেদিনের একটি চড় চিরদিনের মত পর করে দিল দুজনকে।

উনিশ

পেরিয়ে গেছে কয়েক বছর। কুইন্স ক্রলিতে পিট এখন বাবার স্থান নিয়েছে। বেশ কয়েক মাস রোগ ভোগের পরে মারা গেছেন বৃদ্ধ স্যার পিট। দায়িত্ব নিয়েই সম্পত্তি রক্ষায় ও বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেছে পিট। পরিবারের প্রধান হিসেবে রডনকে স্ত্রী-বাচ্চাসহ ক্রিসমাসে বেড়াতে আসতে বলাটাও দায়িত্ব মনে করেছে সে।

ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না বেকির। কিন্তু একটিবারের জন্যে

হলেও এবারে তার কথায় কান দেয়নি রডন।

'ওর প্রতি নজরই নেই তোমার,' খেদের সঙ্গে বলেছে সে, 'ও যাবে। কোচে আমার পাশে বসবে। আর ওখানে তোমাকে জ্বালাতন করবে ভেবো না। পিটের বাচ্চারা রয়েছে। ওদের সঙ্গেই ওর সারাদিন কেটে যাবে।'

নির্দিষ্ট দিনে রওনা দিল ওরা। সারাটা রাস্তাই খুব আনন্দে কাটল রডনের ছেলের। শেষদিকে অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেখে বিশাল এক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কোচ। চারদিকে উৎসবের ছোঁয়া। আলো জ্বলছে প্রচুর। ক্রিসমাসের জন্যে তৈরি হচ্ছে সবাই।

কোচ থেকে নেমেই লেডি জেনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল বেকি। চাচাতো ভাইয়ের কাছে ছুটে এল পিটের বাচ্চাদুটো।

ডিনারের সময় রডনের ছেলে চাচীর পাশে বসল। ওকে যত্ন করে খাওয়ালেন ভদ্রমহিলা। গলে গেল ও।

'টেবিলে বসে খেতে দারুণ লাগে!' বলল ও।

'টেবিলে বসে মানে?' অবাক হয়ে গেলেন চাচী।

'বাড়িতে তো সব সময় রান্নাঘরে খাই,' জবাব দিল ও।

বেকি তখন স্যার পিটের সঙ্গে গল্পে মত্ত। ছেলের মন্তব্য কানে গেল না তার। লেডি জেন কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

তিন ভাইবোনে বন্ধুত্ব হতে সময় নিল না। রীতিমত জমিয়ে ফেলল ওরা। চাচীকেও খুব পছন্দ হয়েছে ইয়াং রডনের। সুযোগ পেলেই বসে পড়ে তাঁর পাশে, কথা বলে সময় কাটায়। ব্যাপারটা বেকির নজর এড়াল না। সে বুঝল, ছেলেকে আদর করলে খুশি হবেন লেডি জেন। একদিন সন্ধ্যায় সবার সামনে ছেলেকে কাছে ডাকল সে। তারপর ও আসতেই চুমু খেল কপালে। হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল ছেলে। থ বনে গেছে।

'বাড়িতে তো কখনও চুমু খাও না, মা,' বোমা ফাটাল যেন ও।

চুপ করে গেল সবাই। কেবল ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল বেকি। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে যেন।

লেডি জেন আর বেকির মধ্যে সদ্ভাব গড়ে উঠতে পারল না। ইয়াং রডনের কথাটা সব সময় কানে বাজে লেডি জেনের। ওর মাকে মন থেকে বিশ্বাস করতে পারে না সে।

যাহোক, ক্রিসমাসের ছুটি ফুরালে বাড়ি ফিরে এল ওরা। রডনের আর তার ছেলের মন খারাপ রইল বেশ কিছুদিন। বেকি কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে এসে জানে বেঁচেছে। জা-কে দেখলেই অস্বস্তি লাগত তার।

তাছাড়া, লর্ড স্টেইনের জন্যেও মন কেমন করছিল।
লণ্ডনে ফিরে এসে ফুর্তির মাত্রা আরও বাড়াল বেকি। ঘন ঘন পার্টি দেয়। রডন ইদানীং স্ত্রীর বন্ধু-বান্ধবদের সহ্য করতে পারে না। বেশিরভাগ সময় বাইরেই কাটিয়ে দেয় সে। মাঝেমধ্যে ছেলেকে নিয়ে হাঁটতে বেরোয়। ঘুরে আসে দীর্ঘ পথ। কর্নেল রডন ক্রলিকে এখন চেনা দায়। বদলে গেছে সে। আগেকার সুদর্শন, বলিষ্ঠ লোকটিকে নিঃসঙ্গ, অবহেলিত রডনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।
কার্জন স্ট্রিটে উৎসবের ছোঁয়া লাগে প্রায় রাতেই। ক্যারিজের আধিক্যে রাস্তা বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ভদ্রলোকরা বেকির দর্শন লাভের জন্যে পরস্পর ঠেলাঠেলি করে। কে বেশিক্ষণ কাছে পাবে ওকে তাই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। অভিজাত মহিলারাও আসে। ড্রইংরুমে বসে বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদের গান শোনে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থাই রাখে তাদের হোস্টেস। লর্ড স্টেইনের আনুকূল্যে লণ্ডনের উঁচু সমাজে ইতোমধ্যে আসন করে নিয়েছে রেবেকা।
ওরা এত যে খরচ করে তার টাকাটা আসে কোত্থেকে? কেউ সঠিক উত্তরটা জানে না। লোকে বাতাসে গুজব ছড়ায়।
রডন ক্রলি প্রাক্তন সৈনিক হিসেবে এখনও বেতনের অর্ধেক টাকা পায়। তবে সে তো অতি সামান্য। জুয়ার টেবিলে জেতে বটে কিন্তু তাই বা এমন কি? স্যার পিট ওকে টাকা দেয় না, এটা নিশ্চিত। লাট সাহেবের মতন তবে থাকে কিভাবে? রেবেকা অবশ্য ভক্তদের বিশেষ করে লর্ড স্টেইনের কাছ থেকে টাকা পয়সা, গয়নাগাটি গ্রহণ করে। উপহার দিলে কেই বা না নেয়? তবে এত কিছুর পরেও দেনা কিন্তু পিছু ছাড়ে না। রডন মাঝে মধ্যে ভেবে দিশেহারা হয়, রেবেকা ওসব চিন্তাকে পাত্তাও দেয় না। তার এত কিছু ভাবার সময় কোথায়? ওকে এসব নিয়ে ভাবতে হলে রডন আছে কি করতে?
বেকির সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল এক সন্ধেয়। লর্ড স্টেইনের বাড়িতে দাওয়াত ছিল রডনের আর ওর। বেকি পার্টি নিয়ে মেতে উঠলেও ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ল রডন। ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাতে। বুক ভরে নিল রাতের তাজা বাতাস। এ সময় রেনহ্যাম নামে এক লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। লর্ড স্টেইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে।
'বাড়ি যাবেন? চলুন একসঙ্গে ফিরি,' প্রস্তাব করল সে।
রাজি হলো রডন। রেনহ্যামের সাধা একটা চুরুটও ধরাল।
পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। চুরুট টানছে। হঠাৎ একজন আগন্তুককে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে। লোকটি কাছে এসে রডনের কাঁধে হাত রাখল।

'কিছু মনে করবেন না, কর্নেল,' মৃদু গলায় বলল সে। 'এদিকে একটু আসুন। আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

এসময় দ্বিতীয় একজন লোক কোত্থেকে যেন শিস দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঠনঠন শব্দ করে হাজির হয়ে গেল একটা ক্যাব।

'উঠে পড়ুন,' বলল প্রথম জন।

বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করল রডন। সে জানে কি ঘটেছে। বেলিফদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ও, দেনার দায়ে।

'অভিযোগ এনেছে কে? কত টাকার?' জানতে চাইল রডন।

'আপনার বাড়িওয়ালা। দেড়শ পাউণ্ড পায় আপনার কাছে।'

'রেনহ্যাম, ঈশ্বরের দোহাই আমাকে একশ পাউণ্ড ধার দাও। আমি পরে শোধ করে দেব,' অনুনয় ঝরে পড়ল রডনের কণ্ঠে।

'আমার কাছে দশ পাউণ্ডও নেই,' বলল রেনহ্যাম। 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট,' পাল্টা বলল রডন। ওকে নিয়ে জেলখানার দিকে চলল ক্যাব।

বিশ

জেলে গিয়ে অন্যান্যদের মত কিন্তু হতাশ হলো না রডন। এর আগেও বার দুয়েক ওখান থেকে বেড়িয়ে এসেছে সে।

'আপনার বিছানা আর জিনিসপত্র সব আগের মতই আছে, কর্নেল,' বেলিফ বললেন।

শোবার ঘরে চলে গেল রডন। দেনার দায়ে সর্বদাই অভিযুক্ত সে। ফলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক তার কাছে। অনভিজ্ঞ লোক হলে হয়ত তক্ষুণি বাড়িতে চিঠি লিখতে বসে পড়ত।

'বেকির রাতের ঘুম নষ্ট করে কি লাভ?' ভাবল রডন। 'আমার ঘরে আছি কি নেই জানবেও না ও। তারচেয়ে বরং জাঁকিয়ে ঘুম-টুম দিয়ে নিই, কাল চিঠি লেখা যাবে। মাত্র তো দেড়শ পাউণ্ডের মামলা। ও জুটিয়ে ফেলবেই, কোনখান না কোনখান থেকে।'

নিশ্চিন্তে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল রডন।

পরদিন সকাল দশটায় ঘুম ভাঙল ওর। নাস্তা সেরে কাগজ, কলম আর কালি আনিয়ে নিল। চিঠি লিখতে বসল স্ত্রীকে:

'প্রিয় বেকি,

রাতে ভাল ঘুম হয়েছে আশা করি। সকালে তোমার কফি পৌঁছে দিতে পারিনি বলে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। গত রাতে বাড়ি ফেরার পথে বেলিফরা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।

দেড়শ পাউণ্ডের জন্যে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে বাড়িওয়ালা। চিঠি পেয়েই চলে যেয়ো ওর কাছে। পঁচাত্তর পাউণ্ড গুঁজে দিয়ো ওর হাতে। বলবে বাকিটা শিগ্গিরই দিয়ে দেব আমি। ও রাজি না হলে আমার ঘড়ি আর তোমার কোন জিনিস বন্ধক রেখে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেয়ো।

আজ রাতের মধ্যেই টাকাটার ব্যবস্থা করবে কিন্তু। আজকের মধ্যে যদি ছাড়া না পাই তবে আমার বিরুদ্ধে ওরা অন্যান্য অভিযোগও দায়ের করবে। তাছাড়া, এখানকার বিছানাটাও খুব নোংরা।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার,
রডন।'

বিঃ দ্রঃ জলদি আসবে কিন্তু।

লোক মারফত তক্ষুণি চিঠিটা পাঠিয়ে দিল রডন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে চুরুট ফুঁকতে লাগল। বেলিফের জেলখানার চারদিকেই বার। বেরনোর কোন উপায় নেই। একেবারে খাঁচায় বন্দী জন্তুর মত অবস্থা।

'বড় জোর তিন ঘণ্টা,' ভাবল রডন, 'টাকা নিয়ে পৌঁছে যাবে বেকি।'

কিন্তু পেরিয়ে গেল সারাদিন। এল না বেকি, দূতও ফেরেনি। শেষ পর্যন্ত বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বেকির চিঠি নিয়ে ফিরে এল লোকটি। ত্রস্ত হাতে ওটা খুলল রডন। গোলাপী কাগজে, সুগন্ধী মিশিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বেকি।

'প্রিয় ডার্লিং,

সারা রাত তোমার চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সকাল বেলা ডাক্তারের পরামর্শ মত ঘুমের ওষুধ খেতে হয়েছে। ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। সেজন্যেই তোমার লোককে মাত্র কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে, নিচের হলে।

তুমি কি জানো চিঠিটা পড়ে কেমন লেগেছে আমার? এই অসুস্থ শরীরে ছুটেছি বাড়িওয়ালার কাছে। তারসঙ্গে দেখা করেছি, কেঁদে পায়ে পড়েছি কিন্তু পাষাণ লোকটা এতটুকু নরম হলো না। বলে কিনা পুরো টাকা না দিলে জেলেই থাকতে হবে তোমাকে। দামী যেসব জিনিসপত্তর ছিল সবই তো বেচা সারা। আর যেগুলো আছে সেগুলো বন্ধক রাখলে একশ পাউণ্ডও

হবে না। হাতে সময় নেই এমুহূর্তে। লর্ড স্টেইন অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। তাঁর কাছে করজোড়ে দুশো পাউণ্ড ধার চেয়েছি। উনি বলেছেন কাল সকালে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। ততক্ষণ অপেক্ষা করো, লক্ষ্মীটি।'

ইতি–
শুধু তোমার
বেকি।'

বিঃ দ্রঃ বিছানায় শুয়ে লিখছি। কী প্রচণ্ড মাথা ধরা আর তোমার জন্যে হৃদয় যাতনা তা যদি তুমি বুঝতে!

চিঠি পড়ে রাগে ফুঁসতে লাগল রডন। লাল হয়ে গেছে তার মুখ। সবাই বুঝল, কিছু একটা হয়েছে তার। ওর সমস্ত সন্দেহ ঘনীভূত হলো। ওকে মুক্ত করার জন্যে নিজের গয়না বিক্রি করতে পারত বেকি। তা না করে টাকা চেয়েছে লর্ড স্টেইনের কাছে। ওকে জেলে পাঠাল কে? লর্ড স্টেইন নয় তো? লর্ড স্টেইনের বন্ধুই তো গ্রেপ্তার হওয়ার সময় ওর সঙ্গে ছিল।

কাগজ চেয়ে নিয়ে ভাই-ভাবীকে চিঠি লিখতে বসল রডন। এখন শহরে রয়েছে তারা। ওর সন্তানের মুখ চেয়ে ওকে সাহায্য করার জন্যে আকুল প্রার্থনা জানাল সে। দেড়শ পাউণ্ড সঙ্গে আনতে অনুরোধ করল।

এক ঘণ্টা পরে গেটের সামনে একটা ক্যারিজ এসে থামল। দারোয়ান দরজা খুলে দিলে ভেতরে ঢুকলেন এক ভদ্রমহিলা।

'কর্নেল ক্রলি এখানেই তো?' জানতে চাইলেন মৃদু কণ্ঠে।

'কর্নেল, আপনার কাছে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন,' চেঁচিয়ে বলল দারোয়ান। ভদ্রমহিলাকে রডনের ঘরের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

'রডন, আমি এসেছি,' বললেন ভদ্রমহিলা, 'আমি জেন।'

প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল রডন। চেপে ধরল ভাবীর দু হাত। আবেগে থর থর করে কাঁপছে। কোনমতে ধন্যবাদ জানাতে পারল। গলা বুজে এসেছে তার।

মিটিয়ে দেয়া হলো দেড়শ পাউণ্ড, ভাবীর সঙ্গে ক্যারিজে চেপে বেলিফের আস্তানা ছাড়ল রডন। তখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চলেছে সে।

একুশ

কার্জন স্ট্রিটের কোণায় ক্যারিজ থেকে নেমে পড়ল রডন। দৌড়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল ও। হাঁপাচ্ছে, ভেতরে ঢুকতে গিয়েও

থমকে পড়ল। ড্রইংরুমের জানালায় আলো জ্বলছে। অথচ বেকি জানিয়েছিল সে অসুস্থ। নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে রডন। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ক'মুহূর্ত।

শেষমেশ চাবি বার করল ও, ঢুকল বাড়িতে। হাসির শব্দ স্পষ্ট কানে এল ওর। ওপরতলা থেকে আসছে। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ও। বেকির হাসির শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না। কাজের লোকেরা বাড়িতে নেই। খুব সম্ভব বেকিই বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের। হঠাৎ গান গাইতে শুরু করল বেকি।

'দারুণ! আহা!' লর্ড স্টেইনের গলা।

দরজা খুলে ঢুকে পড়ল রডন। টেবিলে ডিনারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, দুজনের জন্যে। সোফায় বসেছে বেকি। ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছেন লর্ড স্টেইন। বেকির পরনে জমকালো পোশাক। বাহুতে আর আঙুলে চটকদার গয়না। এগুলো আগে দেখেনি রডন। লর্ড স্টেইন চুমু খাওয়ার জন্যে বেকির হাতটা ধরতেই লাফিয়ে উঠল বেকি। রডনের ফ্যাকাসে মুখটা চোখে পড়েছে তার। স্বামীর অগ্নিদৃষ্টি ভীত করে দিল, ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল ও রডনের পায়ে।

'আমার কোন দোষ নেই,' বলল সে, 'বিশ্বাস করো।' তারপর লর্ড স্টেইনের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কিছু বলছেন না কেন? ওকে বলুন আমি নির্দোষ।'

লর্ড স্টেইন অত বোকা নন। তিনি ভাবলেন ফাঁদ পেতেছে বেকি। ক্রোধে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক।

'নির্দোষ?' চেঁচালেন তিনি, 'তোমার প্রতিটা গয়না আমার দেয়া। আমার হাজার হাজার পাউণ্ড দিয়েছি তোমাকে। এই লোকটা আমার টাকা উড়িয়েছে– বিনিময়ে বেচে দিয়েছে তোমাকে। হুঁহ্! নির্দোষ তো তোমরাই! যত্তসব ফালতু লোকজন।'

হ্যাটটা তুলে নিয়ে বেরোতে চাইলেন লর্ড স্টেইন। কিন্তু রডন তখন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে।

'পথ ছাড়ুন,' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রডনের দিকে চাইলেন লর্ড।

সরল না রডন।

'শালা বদমাশ! কুত্তা!' সজোরে চড় বসিয়ে দিল সে ভদ্রলোকের মুখে, তারপর এক ধাক্কায় ফেলে দিল মাটিতে।

কাঁপছে রেবেকা। মনে মনে স্বামীর সাহসের প্রশংসা করল সে।

'এদিকে এসো,' গর্জে উঠল রডন। নিমেষে ওর কাছে পৌঁছে গেল

বেকি। 'সব খুলে দাও,' নির্দেশ করল রডন। বাধ্য মেয়ের মত অলঙ্কারগুলো খুলে স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিল বেকি।

'মাটিতে ছুঁড়ে দাও,' রডনের আদেশ পালন করতে ভুল হলো না বেকির। ওর ছুঁড়ে দেয়া হিরের ব্রূচটা লর্ড স্টেইনের কপালে গিয়ে লাগল। অনেকখানি কেটে গেল কপালটা। কাটা দাগটা তাঁর অপকর্মের সাক্ষী হয়ে রইল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

'ওপরে এসো,' রডন বলল স্ত্রীকে।

'আমাকে মেরে ফেলো না, প্লীজ,' অনুনয় করল বেকি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসল রডন। 'টাকার কথা ওই লোকটা যা যা বলল তা কি সত্যি?'

'না।'

'তোমার চাবিগুলো দাও।'

একসঙ্গে ওপরে গেল ওরা। একটা বাদে সবগুলো চাবি রডনের হাতে দিল বেকি। ওর আশা, খেয়াল করবে না রডন। এটা অ্যামেলিয়ার উপহার দেয়া সেই ছোট্ট ডেস্কটার চাবি– বেকির গুপ্তভাণ্ডার। রডন অবশ্য ঠিকই খুঁজে বার করল ওটা। বেকিকে খুলতে বাধ্য করল। চিঠিপত্র আর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে লর্ড স্টেইনের দেয়া বেশ কতগুলো চেকও বেরিয়ে পড়ল। শেষেরটা এক হাজার পাউণ্ডের।

'ও দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আজই ওকে ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বেকি।

'দেনা যা জমেছে তার কিছু আমি শোধ করব। বাকিটা দেবে তুমি। আমাকে দেড়শটা পাউণ্ড ধার দিতে পারতে অন্তত। কোন কিছু তো একা ভোগ করিনি। সবই ভাগাভাগি করেছি তোমার সঙ্গে,' ধরে এল রডনের গলা।

'আমার কোন দোষ নেই,' জবাবে বলল বেকি।

ওখানে আর দাঁড়ানোর রুচি হলো না রডনের, নীরবে বেরিয়ে গেল সে।

রডন চলে গেলে পর বেকির মনের কি অবস্থা হলো? বিছানার এক কোণে মূর্তির মত কয়েক ঘণ্টা বসে রইল ও। জানে, আর ফিরবে না রডন। আত্মহত্যা করবে না তো? বেকির সমস্ত ফন্দি, সৌন্দর্য, বুদ্ধি সবই মাঠে মারা গেল। এমনটা হবে কখনও কি ভাবতে পেরেছিল ও? আত্মহত্যা করে

সব ঝামেলা চুকিয়ে দিলে কেমন হয়?

বেকির ফ্রেঞ্চ মেইড ঘরে ঢুকল এসময়। টেনে দিল জানালার পর্দা। তারপর নিচে নেমে এসে ছড়ানো ছিটানো গয়নাগুলো কুড়িয়ে নিল।

রেবেকা আর রডনের সেই শেষ দেখা। চাচার বাড়িতে চলে গেল ওদের ছেলে। চাচা-চাচী নিজের ছেলের মত করে মানুষ করতে লাগলেন ওকে। কার্জন স্ট্রিটের বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। যাবতীয় আসবাবপত্র বেচে দেয়া হয়েছে। রডনকে গভর্নর করে প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট এক দ্বীপে পাঠানো হয়েছে। বেকির খবর জানে না কেউ। অনেকে বলে ইতালিতে চলে গেছে ও, লর্ড স্টেইনের খোঁজে। আবার কেউ কেউ বলে প্যারিসে আছে বেকি। ওকে বছরে সামান্য ভাতা পাঠায় রডন। ছেলেকেও টাকা পাঠায় আর চিঠি লেখে নিয়মিত।

ছেলের সঙ্গে দেখা করার কোনরকম চেষ্টা করেনি বেকি। বোর্ডিং স্কুলে চলে গেছে ওদের ছেলে। তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো চাচীর সঙ্গে কাটায়। চাচী ওর চোখের মণি। বাবার জন্যে গর্ববোধ করে ও। কিন্তু মায়ের কথা তার মনে পড়ে না একেবারেই।

বাইশ

জর্জি অসবর্নের বয়স এখন এগারো। দাদার বাড়িতে মহা আনন্দেই কাটছে তার দিন। বাবার ঘরে থাকে ও, ভবিষ্যতে উত্তরাধিকারী হবে পারিবারিক সম্পত্তির। দাদার অতি প্রিয়পাত্র সে। মিস্টার অসবর্ন ছেলেকে হারিয়ে আঁকড়ে ধরেছেন পৌত্রকে। বিখ্যাত একটি ব্যয়বহুল প্রাইভেট স্কুলে পড়ে জর্জি।

একদিনের ঘটনা। সুদৃশ্য একটি ক্যারিজ থামল এসে স্কুলের গেটে। দুজন ভদ্রলোক নেমে এলেন ওটা থেকে। প্রাণের সাড়া পড়ে গেল যেন ছেলেদের মধ্যে। প্রতিদিনকার একঘেয়ে রুটিনে নতুনত্বের ছোঁয়া পেল ওরা। বিশেষ করে জর্জির খুশি ধরল না যখন শুনতে পেল ভদ্রলোক দুজন তার সঙ্গেই দেখা করতে চান।

রিসেপশন রুমে গেল জর্জি। দেখতে পেল দুজন অপরিচিত আগন্তুক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। উদ্ধত ভঙ্গিতে তাঁদের দিকে চেয়ে রইল ও। আগন্তুকদের একজন মোটা মত, ঠোঁটের ওপর পুরু গোঁফ। অপরজনের

পরনে নীল কোট। লম্বা-পাতলা লোকটির চুলগুলো অনেকাংশেই ধূসর হয়ে গেছে।

'আশ্চর্য! ওর সঙ্গে কি অসম্ভব মিল!' লম্বা মত ভদ্রলোক বললেন। জর্জির দিকে ফিরলেন, 'আমরা কে বলো দেখি।'

লাল হয়ে উঠল ছেলেটির মুখ। জ্বলজ্বল করতে লাগল চোখজোড়া। উত্তেজিত হলে হামেশাই এমন হয় ওর।

'ওঁকে চিনি না,' বলল সে। 'তবে আপনি খুব সম্ভব মেজর ডবিন।'

ঠিকই ধরেছে ও। মেজর ফিরে এসেছে ভারত থেকে। কাঁপা হাতে জর্জিকে কাছে টেনে নিল সে।

'তোমার মা আমার কথা বলেছে নিশ্চয়ই?' জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' জবাব দিল জর্জি। 'কয়েক শো বার অন্তত।'

'ইনি তোমার মামা, জোসেফ,' বলল মেজর। মোটা লোকটি এবার এগিয়ে এল সামনে। মৃদু হাসছে।

ডবিনের সঙ্গে একই জাহাজে দেশে ফিরেছে জোসেফ। ভারতে চাকরি জীবন শেষে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছে। রীতিমত বড়লোক এখন সে। প্রচুর পেনশন পাবে। রাতে জাহাজের ডেকে বসে ডবিন আর জোসেফ কাটিয়ে দিত বহু সময়। দেশের কথা মনে করে উচাটন করত বুকের ভেতরটা, কবে যে বন্দরে জাহাজ ভিড়বে! ওদের আলোচনায় ডবিন প্রায়ই অ্যামেলিয়া আর তার ছেলের প্রসঙ্গ তুলে আনত। জোসেফকে সে বুদ্ধি দিয়েছে বহুবার, লণ্ডনে একটা বাড়ি কেনার জন্যে। ওতে মিস্ট্রেস হিসেবে বাস করতে পারবে এমি। ইঙ্গিত দিয়েছে, জর্জিকে যেন ভাল স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়। বলা যায়, বুদ্ধি খাটিয়ে জোসেফের কাছ থেকে এসব ব্যাপারে কথাও আদায় করে নিয়েছে সে। এমির জন্যে এখনও বুকভরা ভালবাসা ওর। মেয়েটিকে সুখী দেখতে চায় সে।

জাহাজ সাউদাম্পটনে ভিড়তেই লণ্ডনের দিকে যাত্রা করল ডবিন। জোসেফ রইল জাহাজ থেকে মাল খালাসের তদারকির জন্যে। ফুলহ্যামের বাড়িটিতে যখন পৌঁছল ডবিন তখন বাইরে রয়েছে এমি, তবে ক্ল্যাপরা ছিলেন। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁরা। তাঁদের মুখেই অ্যামেলিয়ার সমস্ত খবরাখবর শুনে নিল ডবিন। মারা গেছেন এমির মা। চরম দুর্দশায় পতিত হয়েছেন এমির বাবা।

ক্ল্যাপদের কাছ থেকে জানা গেল বাবাকে নিয়ে পার্কে হাঁটতে গেছে এমি। ডবিন তক্ষুণি হাঁটা দিল পার্কের দিকে। পার্কে পৌঁছে বাপ-বেটিকে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো না তার। একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে

রয়েছে তারা। গল্প করছে। এসময় ডবিনকে হঠাৎ দেখে ফেলল এমি। চেঁচিয়ে উঠল সে, ছুটে এল ডবিনের কাছে। ওর হাত দুটো সামনে বাড়ানো, ও দুটো চেপে ধরল ডবিন। আবেগে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছে ডবিন। তার ইচ্ছে করছে এমিকে বুকের সঙ্গে পিষে ফেলতে। এমিকে ছেড়ে কক্ষনও আর দূরে কোথাও যাবে না ও। কক্ষনও না। একবার তো মুখ ফসকে বিয়ের প্রস্তাব প্রায় দিয়েই ফেলেছিল সে। সামলে নিল অতিকষ্টে। নিজেকে সংযত করে ভুলই করল না তো ও? এই আবেগঘন মুহূর্তে এমি হয়ত ফেরাতে পারত না ওকে।

'আরেকজন এসেছে আমার সঙ্গে,' খানিক বাদে বলল মেজর।

'মিসেস ডবিন?' কেঁপে উঠল এমির গলা।

'না,' বলল ডবিন। ছেড়ে দিল এমির হাতজোড়া। 'কিভাবে অমন কথা ভাবতে পারলে? জোস এসেছে আমার সঙ্গে, একই জাহাজে। তোমাদের সবার দায়িত্ব নিতেই এসেছে ও।'

'বাবা! বাবা!' ডাকল এমি। 'সুখবর আছে! জোস ফিরেছে। তোমার আর কোন চিন্তা নেই। মেজর ডবিনও এসেছেন।' উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার সেডলি। কাঁপছেন থরথর করে। পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারছেন না ভাল ভাবে।

'বাবা একদম অন্য মানুষ হয়ে গেছেন,' ফিসফিসিয়ে বলল এমি। এগিয়ে গেল ডবিন। হাত মেলাল মিস্টার সেডলির সঙ্গে।

ডবিন ওদের সঙ্গে বাড়িতে গেল। সন্ধেটা কাটাল ওখানেই। মিস্টার সেডলি চেয়ারে বসে ঝিমালেন বেশিরভাগ সময়। এমি গল্প করতে লাগল জর্জির নিত্যনতুন কাণ্ড কারখানা নিয়ে। ছেলেকে কাছছাড়া করতে যে দুঃখ পেতে হয়েছে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উচ্চারণ করল না ও।

'ও-ই আমার জীবনের সব,' বলল এমি। 'ছেলেটা একদম বাপের মত হয়েছে।'

'স্বামীকে এখনও ভালবাসে,' মনে মনে বলল ডবিন। 'বাসুক। আমার তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। মৃত বন্ধুকে ঈর্ষা করে লাভ কি? তবে বৌ একটা পেয়েছিলে, ভাই জর্জ!'

'কাল কি একবার জর্জির সঙ্গে দেখা করবেন?' জানতে চাইল এমি।

'করব,' কথা দিল ডবিন। বিদায় নিল তখনকার মত। এভাবেই কাটল প্রথম দিনটা। ডবিনের জন্যে সফল দিন। এমিকে তো অন্তত দেখতে পেয়েছে।

তেইশ

নতুন বাড়ি নিল জোসেফ, সবাইকে নিয়ে উঠে গেল সেখানে। অ্যামেলিয়া ফুলহ্যাম থেকে সঙ্গে করে শুধুমাত্র পিয়ানোটা নিল। পিয়ানোটা দেখে খুশি হয়ে উঠল মেজর ডবিনও।

'পিয়ানোটার খুব যত্ন করো দেখছি,' বলল সে। 'আমি তো ভেবেছিলাম ভুলেই গেছ ওটার কথা।'

'কি করে ভুলব বলুন? ভোলা যায়?'

'সত্যি বলছ?' কান পর্যন্ত হাসল ডবিন। এমির জন্যে যন্ত্রটা কিনেছিল সে। তার ধারণা, জর্জ কথাটা জানিয়েছে ওকে।

'জর্জের স্মৃতি কি এত সহজে ভোলা সম্ভব?' আবেগে কেঁপে উঠল এমির কণ্ঠ। 'জিনিসটা ও দিয়েছিল আমাকে।'

'তাই?' নির্বিকার শোনাল ডবিনের গলা। হতাশ মনে হলো তাকে। তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটা খেয়াল না করলেও পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে এমি। বুঝেছে, পিয়ানোটা জর্জ নয়, ডবিন দিয়েছিল। লজ্জা পেয়েছে ও, দুঃখও।

ক'দিন পরের কথা। ড্রইংরুমে বসে রয়েছে ওরা। খানিক আগে ডিনার সেরেছে। পেট পুরে খেয়ে ঝিমাচ্ছে জোসেফ। অ্যামেলিয়া নরম গলায় বলল ডবিনকে, 'একটা ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না, প্লীজ।'

'কি ব্যাপার বলো তো?'

'বিয়ের আগে আমাকে যখন পিয়ানোটা দিয়েছিলেন তখন বুঝিনি। আপনাকে ধন্যবাদ জানাইনি। ভেবেছিলাম অন্য কেউ দিয়েছে জিনিসটা। এখন বুঝছি, তা নয়। ধন্যবাদ আপনাকে।' এমির চোখজোড়ায় জল টলমল করতে দেখল ডবিন।

'এমি,' বলল ডবিন, 'জিনিসটা আমিই কিনেছিলাম, তোমার জন্যে। তোমাকে তখনও ভালবাসতাম আমি, এখনও বাসি। প্রথম দেখার কথা মনে পড়ে তোমার? তুমি গান গাইতে গাইতে নেমে এসেছিলে নিচে। ভক্সহলে গিয়েছিলাম আমরা। সেদিন থেকে একটিমাত্র মেয়ের ধ্যান করে যাচ্ছি– সে হচ্ছ তুমি। তোমাকে ছাড়া আমি দুনিয়ার আর কোন মেয়েকে ভাবতে পারি

না।' দম নেয়ার জন্যে সামান্য থামল ডবিন। করুণ হাসল। 'ভারতে যাওয়ার আগে তোমাকে সব খুলে বলতে এসেছিলাম, কিন্তু এসে বুঝলাম, আমি তোমার মনে জায়গা পাইনি। আমি থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না, গেলেও তাই।'

'আপনি ভুল বুঝবেন না,' বলল এমি। 'আমি আসলে জর্জ ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি, পারবও না। ও-ই আমার স্বামী, ইহকালেও, পরকালেও। আমি শুধুই ওর, এখনও। আপনি আমার আর আমার ছেলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আমার ভাইয়ের মত। প্লীজ, কথা দিন সারাজীবন বন্ধু থাকবেন।' কেঁদে ফেলল এমি। মুখ লুকাল ডবিনের কাঁধে।

ওকে জড়িয়ে ধরল ডবিন। সান্ত্বনা দিতে চাইল, যেন বাচ্চা মেয়ে ও।

'আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই,' বলল ডবিন। 'থাকতে দেবে তো? আমার একটাই অনুরোধ, মাঝে মধ্যেই বিরক্ত করব তোমাকে; দেখা করতে আসব।'

'সে কথা কি বলে দিতে হবে?' মৃদু হেসে বলল এমি। সম্মতি মিলে গেল। ডবিনের খুশি ধরে না।

ইদানীং এমির ভাগ্যাকাশে সূর্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। জোসেফের ক্যারিজে চেপে প্রায়ই বেড়াতে বেরোয় সে। দেখা করে জোসেফের এবং তার নিজের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। সবাই পছন্দ করে তাকে। মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে নারী-পুরুষ সবার মন কেড়ে নিয়েছে ও। আগের মত এখন আর মনমরা নয় এমি। জীবনকে উপভোগ করতে শুরু করেছে সে। দেখে খুশিতে বুকটা ভরে ওঠে ডবিনের।

চব্বিশ

জোসেফ সেডলির বাড়িতে এখন শোকের ছায়া। মারা গেছেন জন সেডলি। ফুলহ্যামে গির্জা সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হলো তাঁকে। স্ত্রীর পাশে।

এ ঘটনার সপ্তাহ কয়েক বাদে মৃত্যু আবারও ছোবল হানল। এবার রাসেল স্কয়্যারে। মিস্টার অসবর্ন মারা গেলেন। যুবা বয়সের দুই বন্ধু পরে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। মৃত্যুর মাধ্যমে অবসান ঘটল শত্রুতার।

উইলে মিস্টার অসবর্ন অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েদের, বাকি

অর্ধেক জর্জিকে। পুত্রবধু অ্যামেলিয়াকে জর্জির অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন। বছরে পাঁচশো পাউণ্ড করে পেতে থাকবে সে। বুড়ো ভদ্রলোক মেজর ডবিনের জন্যেও মোটা অঙ্কের টাকা রেখে গেছেন। পুত্রবধু ও পৌত্রকে তাদের দুরবস্থায় আর্থিক সাহায্য করেছে বলে ডবিনের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন।

উইলের কথা জেনে খুশি হয়েছে এমি। ছেলের অভিভাবকত্ব পাবে শুনে স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু মেজর ডবিনের ঋণ কিভাবে শোধ করবে সে? কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিইবা দেয়ার আছে তার? অন্য কিছুর কথা ভাবলেই মানসপটে ভেসে ওঠে জর্জের প্রতিচ্ছবি। ও বলত, 'তুমি আমার, শুধু আমার। সারাজীবন শুধু আমারই থাকবে।'

ডবিনও যে ওর মনের কথা বোঝে না তা নয়। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। ভাবে, কখনও হয়তবা বদলাতেও পারে এমির মন।

ইতোমধ্যে জোসেফ একটা প্রস্তাব দিয়েছে। সে, এমি, জর্জি আর ডবিন মিলে ইউরোপ থেকে বেড়িয়ে আসবে। প্রস্তাবটা মনে ধরল ডবিনের। বেড়াতে গেলে মৃত স্বামীর কথা হয়ত খানিকটা হলেও ভুলতে পারবে এমি। মনে ক্ষীণ আশা, নতুন পরিবেশে এমির কৃতজ্ঞতা হয়ত ভালবাসায় রূপান্তরিত হতে পারে।

তো, চারজনের ছোট্ট দলটি স্টিমবোটে চেপে একদিন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিল। পথে জায়গায় জায়গায় থামল ওরা। জীবনকে নতুনভাবে উপভোগ করছে এখন এমি। ডবিনও। প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঘরবাড়ি দেখে চমকিত হয় এমি। আর ডবিন মুগ্ধ হয় ওকে দেখে।

পঁচিশ

আমাদের অভিযাত্রীরা শেষমেশ হাজির হলো ব্যাডেন ব্যাডেন-এ। ভিনদেশী প্রচুর ট্যুরিস্টও রয়েছে। জুয়া খেলার চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে এখানে। বিদেশীদের পোয়াবারো।

একদিন সন্ধেবেলা। বাড়িতে বসে রয়েছে ডবিন আর অ্যামেলিয়া। বেড়াতে গেছে জোসেফ। মামার এক বন্ধুর সঙ্গে নামকরা জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে জর্জি। এর আগে কখনও ক্যাসিনো দেখেনি জর্জি। মামার বন্ধুকে চাপাচাপি শুরু করল, তাকে ক্যাসিনোর ভেতর নিয়ে

যেতে হবে। ভেতরে ঢুকতেই ভিড়ের চাপে জর্জি ছিটকে গেল সঙ্গীর কাছ থেকে। দেখতে পেল একটি টেবিলে বসে রয়েছে এক মহিলা। কালো মুখোশ পরা। তার সামনে টাকার ছোটখাট একটা পাহাড়। তবে দ্রুত কমতে লাগল পাহাড়ের উচ্চতা, এক সময় মিলিয়ে গেল সম্পূর্ণ। হেরে গেছে মহিলা। ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে চাইল। নজরে পড়ল জর্জির মুখখানা।

'খেলেছ কখনও?' জানতে চাইল সে।

'না, ম্যাম।'

'তবে তুমি হয়ত পয়া হতেও পারো। আমার একটা উপকার করবে?'

'কি উপকার?' জিজ্ঞেস করল জর্জি। লাল হয়ে গেছে তার মুখ। চকিতে চাইল চারদিকে। মামার বন্ধুর দেখা অবশ্য পেল না। অন্য এক টেবিলে তখন খেলা উপভোগ করছে সেই লোক।

'আমার হয়ে খেলো। তোমার ইচ্ছেমত যে কোন নম্বর নিতে পারো, যে কোন নম্বর।' পার্স থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বার করল মহিলা। এই একটিই অবশিষ্ট রয়েছে। জর্জির হাতে গুঁজে দিল ওটা। মহিলার কথামতই কাজ করল জর্জি, নম্বরও চলে এল। শুরুতেই বাজিমাত করে দিয়েছে ও।

'ধন্যবাদ,' বলল মহিলা। নিজের দিকে টেনে নিল জিতে নেয়া অর্থ। 'নাম কি তোমার?'

'অসবর্ন, জর্জ অসবর্ন,' জবাব দিল জর্জি। নেড়ে দেখল পকেটের ভেতরটা। নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? এ সময় কোত্থেকে যেন হাজির হয়ে গেল ওর জোসেফ মামা।

'বাড়ি ফিরবে এসো,' বলল সে। মুখোশ পরিহিতার দিকে কঠোর দৃষ্টি হানল। মহিলা পাশের খালি চেয়ারটা থেকে তুলে নিল শাল।

'বসুন,' জোসেফকে বলল সে। 'আপনি হয়ত আমার ভাগ্য ফেরাতে পারবেন।

কণ্ঠস্বর শুনে চমকাল জোস। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল মহিলার দিকে। ভাগ্নেকে বলল, 'বাইরে যাও তুমি। আমি এক্ষুণি আসছি।'

জর্জি বেরিয়ে গেলে জানতে চাইল জোস, 'আপনি কে বলুন তো?'

'আমাকে চিনতে পারোনি? আন্দাজ করো দেখি,' হতাশ শোনাল মহিলার গলা। মুহূর্তে সরিয়ে ফেলল মুখোশ।

'আমাকে ভুলে গেছ?'

'হায় ঈশ্বর! মিসেস ক্রলি!'

'রেবেকা,' শুধরে দিল মহিলা। স্পর্শ করল জোসেফের হাত। তবে খেলা থেকে মনোযোগ টলেনি এতটুকু। 'এলিফ্যান্টে আছি আমি,' নরম গলায় বলল সে। 'মাদাম ডি রডনের নাম বললেই হবে।' তারপর গলা উঁচিয়ে বলল, 'আজ রাস্তায় এমিকে দেখলাম। সুখেই আছে মনে হলো। তোমরা সবাই ভাল আছ। ভাল নেই কেবল আমি। ওহ্, আমি আর পরছি না, জোসেফ। আমি বড্ড একা, বড় নিঃসঙ্গ।' চোখ মুছল বেকি। সেই সঙ্গে পরবর্তী চাল দিতেও ভুল করল না।

'কথা দাও আমার সঙ্গে এলিফ্যান্টে দেখা করবে। বলো আসবে। কাল সকালে এসো। আমাদের সম্পর্ক কি আজকের বলো?'

স্বামী তাকে ত্যাগ করার পর থেকে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করছে বেকি। ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে দুনিয়াময়। ভাশুর স্যার পিটের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেছিল সে, ব্যর্থ হয়েছে। ফলে চলে গিয়েছিল ফ্রান্সে, পেছনে রেখে গিয়েছিল প্রচুর দেনা। ফ্রান্সেও টিকতে পারেনি সে। পাততাড়ি গুটিয়ে ইতালি, জার্মানীতে গিয়েছে। কিন্তু ফলাফল সেই একই। যেখানেই যায় সেখানেই জোটায় অসংখ্য বন্ধু বান্ধব, দেনা করে। ফলে পরে মান্যগণ্য লোকজন এড়িয়ে চলে ওকে।

রেবেকার সঙ্গে সাক্ষাতের পরের দিন খুব সক্কাল বেলা ঘুম ভাঙল জোসেফের। নিজের সেরা পোশাকটা পরে নিয়ে এলিফ্যান্ট হোটেলের দিকে রওনা দিল সে। শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় হোটেলটার অবস্থান। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল জোসেফ। সবচেয়ে উঁচু তলায় খুঁজে পেল বেকির ছোট্ট ঘরটা। ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠল বেকি। চেপে ধরল একটা হাত।

'তুমি আগের মতই আছ!' বলল সে। 'তুমি যেখানেই থাকো না কেন আমি তোমাকে চিনতামই। অচেনা লোকজনের মাঝে একজন পুরানো বন্ধুর মুখ! আহ্, কি যে ভাল লাগছে।'

রেবেকা তারপর নিজের দুঃখের পাঁচালী ফাঁদল। নিজেকে দুর্ভাগ্যের অসহায় শিকার হিসেবে প্রমাণিত করল। ওর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছে জোসেফ। তার ধারণা, বেকির মত ভাল মেয়ে দুনিয়ায় আর দুটো নেই। ওকে বিয়ে করলে কেমন হয়?

সেদিন ফিরে এসে বেকির প্রসঙ্গ তুলল জোস। কিন্তু ডবিনের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই ওর প্রতি।

'বদমাশ মেয়েলোকটা আবার তোমার কাঁধে ভর করেছে? কোত্থেকে হাজির হলো ও?' বেকিকে প্রথম থেকেই অপছন্দ করে ডবিন। 'মিসেস জর্জ

কি বলে শোনো আগে।'

ভেতর থেকে ডেকে আনা হলো এমিকে। জোস তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উৎসাহের সঙ্গে তাকে জানাল, 'দারুণ– দারুণ এক ব্যাপার ঘটেছে আজ। পুরানো এক বন্ধু– মানে তোমার খুব প্রিয় এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ওর সঙ্গে দেখা করবে, এমি?'

'কোন্ বান্ধবী? নাম কি?'

'বাজে এক মহিলা। তোমার দু চোখের বিষ। আমারও।' বলল ডবিন।

'বুঝেছি,' মৃদু গলায় বলল এমি, 'রেবেকা।' শিউরে উঠল সে। মনে পড়ে গেল ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। কি যন্ত্রণা, কষ্ট! ভোলা কি যায় সে সব? উত্তেজিত হয়ে উঠল এমি।

'ওর মুখ দেখতে চাই না আমি,' চেঁচিয়ে উঠল এমি।

'বলেছিলাম না?' ডবিন বলল জোসকে।

'বেচারীর খুব দুঃখ। তাছাড়া অসুস্থও। শয়তান স্বামীটা ছেড়ে গেছে ওকে।'

'বলো কি!' বিস্মিত শোনাল এমির কণ্ঠ।

'বেচারী বড় অসহায়,' বলল জোস। 'ভাশুর কোনরকম সাহায্য করেনি। ওকে দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

'আহা বেচারী!' বলল এমি।

'বেচারীর প্রায় মাথা খারাপের জোগাড়,' করুণ কণ্ঠে বলল জোস। 'ওর একটা ছেলে ছিল, মনে আছে? মায়ের ভক্ত ছিল ছেলেটা। ওকে পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে মায়ের বুক থেকে। দেখাও করতে দেয় না।'

'জোসেফ,' সব শুনে বলল এমি। 'এক্ষুণি ওর ওখানে যাই চলো।' শোবার ঘরে ছুটে গেল ও। বনেট পরে, শাল নিয়ে বেরিয়ে এল আবার। 'চলো, জোস।'

ছাব্বিশ

দশ মিনিট পরে এলিফ্যান্ট হোটেলের মালিক অ্যামেলিয়াকে পৌঁছে দিলেন ওপর তলায়, বেকির ঘরে। দরজায় টোকা দিল এমি।

'কে?' ভেতর থেকে ভেসে এল বেকির কণ্ঠস্বর। দরজা খুলল সে। ওকে দেখে দু হাত বাড়িয়ে দিল এমি। জড়িয়ে ধরল বান্ধবীকে। তাজ্জব

বনে গেছে বেকি। তবে এমির আন্তরিকতা ছুঁয়েছে তাকেও। বহুদিন পর প্রাণ খুলে গল্প করল দুজনে। এক ঘণ্টা পরে এমি বাড়ি ফিরল। ততক্ষণে বেকির প্রতি অন্যায়ের জন্যে লর্ড স্টেইনের ও রডনের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মে গেছে তার। লোক দুটি অসম্ভব স্বার্থপর। বেকিকে কি কষ্টটাই না দিয়েছে!

'সত্যিই দারুণ ভোগান্তি গেছে বেচারীর,' ড্রইংরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল এমি। ডবিন তখন খবরের কাগজ পড়ছে।

ওর দিকে মুখ তুলে চাইল ডবিন। জোসেফও।

'আমার মেইড চিলেকোঠায় শোবে,' বলল এমি। 'আর বেকি চলে আসবে ও ঘরে।'

'কার কথা বললে?' এবার কাগজটা সরিয়ে রাখল ডবিন।

'রেবেকা,' জবাব দিল এমি।

'ওই ভয়ঙ্কর মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে চাও?' দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'নিশ্চয়ই,' দৃঢ় গলায় বলল অ্যামেলিয়া। 'আপনি এত খেপছেন কেন শুনি? ও এখানে আসবে এবং থাকবে।'

'এমি ঠিকই বলেছে,' সুর মেলাল জোস।

'বেচারী কম কষ্ট করেনি,' বলল এমি। 'কেউ এখন আর ওর পাশে নেই। দুনিয়ায় আপন বলতে ওর কেই বা আছে? গান শিখিয়ে পেট চালাতে হচ্ছে ওকে।'

'তুমিও বরং গান শেখো ওর কাছে,' বলল ডবিন। 'তবু ওকে এখানে জায়গা দিয়ো না। আমি অনুরোধ করছি।'

'আপনার ব্যবহারে আশ্চর্য লাগছে,' বলল অ্যামেলিয়া। 'বেকি আমার ছোটবেলার বান্ধবী। ওর এখন সাহায্য দরকার, আমি করব।'

'কেমন বান্ধবী সে তো ভালই জানি,' রাগতস্বরে বলে ফেলল ডবিন।

অ্যামেলিয়ার কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা লাগল। ক্রুদ্ধ চোখে মেজরের দিকে চাইল সে। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। দড়াম করে বন্ধ করল দরজাটা, সোজা নিজের ঘরে চলে গেল ও। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল।

'আমি তো জর্জ আর বেকিকে কবেই মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছি,' ভাবল ও, 'ডবিন কোন্ অধিকারে আমাকে পুরানো কথা মনে করিয়ে দিল?'

বেরিয়ে পড়ল ডবিনও। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল শহরময়। ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে গেল ব্রিটিশ দূতাবাসের এক কর্মচারী বন্ধুর সঙ্গে। ডিনার সারল দুজনে। বেকির লণ্ডনে থাকাকালীন সময়কার অনেক কথাই জানে বন্ধুটি। সেসব শুনে আঁতকে উঠল ডবিন। রাতে সে যখন ফিরল তখন বেকি আসর জমিয়ে বসেছে ও বাড়িতে। সে রাতে

এমির সঙ্গে আর কোন কথা হলো না ডবিনের। পরদিন সকাল হতেই এমির ঘরে একটা চিরকুট পাঠাল সে, জানাল, জরুরী আলাপ আছে।

এমি দেখা করল ওর সঙ্গে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলবেন।'

'মিসেস ক্রলিকে তুমি এখানে থাকতে দিতে পারো না। স্বামী ছাড়া মহিলা, একা একা যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ায়, জুয়া খেলে– সে কি করে এখানে আশ্রয় পায়? তোমার ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ আছে, নাকি?'

'সে ভাবনা আমাকেই ভাবতে দিন। আমার ব্যাপারে নাক গলানোর কোন অধিকার আপনার নেই।'

'আমার জিজ্ঞেস করার অধিকার আছে।'

'তা তো থাকবেই। আমাদের জন্যে কম তো করেননি, মাথা কিনে নিয়েছেন সবার,' তীব্র বিদ্রূপ ঝরে পড়ল অ্যামেলিয়ার কণ্ঠে।

'ভুলে যেয়ো না আমি জর্জের বন্ধু।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল বন্ধু। সেজন্যেই গতকাল ওর বদনাম করার চেষ্টা করছিলেন, তাই না? আমি কোনদিন আপনাকে মাফ করতে পারব না। কোনদিন না।'

'কি বলছ তুমি নিজেও জানো না,' দুঃখিত ভাবে বলল ডবিন। 'কটা কথা না হয় বলেই ফেলেছি কাল, সেজন্যে আমার এতদিনের ভালবাসা মূল্যহীন হয়ে গেল?'

মাথা নিচু হয়ে গেল এমির। বলে চলল ডবিন, 'কালকের কথায় দুঃখ পাওনি তুমি। ওটা একটা অজুহাত। তোমাকে গত পনেরোটা বছর ধরে চিনি। তোমার প্রতিটা চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি সব আমার জানা। অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো, পারো না কেবল মানুষের ভালবাসার প্রতিদান দিতে। তুমি আমার ভালবাসার যোগ্য নও। এতদিনে বুঝে গেছি, তোমাকে পাওয়া সম্ভব নয়। আমি সব আশা ছেড়ে দিয়েছি। গুডবাই, অ্যামেলিয়া। গত পনেরো বছরে তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি, নিজেরও। নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাকে আর কখনও জ্বালাতন করব না। চলি।'

নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল এমি, ভয় পেয়ে গেছে। ডবিন আজ দুজনের মধ্যকার অদৃশ্য সুতোর বাঁধন ছিন্ন করেছে। ওর ওপর আর কোন অধিকার রইল না এমির। ওর পায়ের কাছে প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে এতদিন অপেক্ষা করেছে ডবিন। আর সে কেবল দুপায়ে মাড়িয়েছে ওর ভালবাসা। ডবিনকে বিয়ে করার কোন ইচ্ছে কখনও ছিল না তার। সে চেয়েছিল কেবল সারাজীবন ডবিনকে ধরে রাখতে। মানুষটিকে কিছুই দেয়নি সে,

দিতে চায়ওনি। শুধুই পেয়ে এসেছে সে। এটাই যেন স্বাভাবিক ছিল ওর কাছে।

'তারমানে···আপনি···আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন?'

করুণ শোনাল ডবিনের হাসিটা। 'আগেও তো গিয়েছিলাম একবার,' বলল সে। 'ফিরে এসেছিলাম বারো বছর পরে। তখন দুজনেরই বয়স কম ছিল, অ্যামেলিয়া। গুডবাই। আমার আর অত ধৈর্য নেই।'

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা। বেরিয়ে গেছে ডবিন।

সাতাশ

বেকির উপস্থিতিতে জমে উঠল জোসের বাড়ি। আসর গুলজার করে রাখে বেকি। অবশ্য জোসকে বোকা বানিয়ে রেখেছে ও। জোসকে ভাবতে শিখিয়েছে, আসর জমে জোসের জন্যে। ওর টানেই ছুটে আসে সব লোক।

অ্যামেলিয়া এখন নামে মাত্র ও বাড়ির গৃহকর্ত্রী। বিলগুলো মেটাতে হয় তাকে– ফলে সে-ই মিস্ট্রেস। এমিকেও খুশি রাখে বেকি। অনর্গল প্রশংসা করে যায় মেজর ডবিনের। বলে, এমি খুব অন্যায় করেছে ওর প্রতি। এমি নিজেও অবশ্য সুযোগ পেলেই ডবিনের প্রসঙ্গ তোলে।

ডবিন সেদিনের পর একটি মাত্র চিঠি লিখেছে। তাও আবার খুব নিস্পৃহ ভাষায়। এমি বুঝে গেছে, চিরতরে হারিয়েছে মানুষটিকে। চরম মানসিক যাতনা ভোগ করছে সে। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ সে নিজের ওপরে। ডবিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ও। ডবিন এখন ইংল্যাণ্ডে রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলল এমি। গোপনে চিঠি লিখল ডবিনকে। পোস্ট করল নিজেই। বাড়ি ফিরে এল। নার্ভাস। বেকি বুঝল ওর মনের অবস্থা। এক কাপ চা বানিয়ে হাজির হলো এমির বেডরুমে।

'অ্যামেলিয়া,' বলল সে, 'বোঝা গেছে, তুমি এখানে থাকতে পারবে না। জোসের ক্ষমতা নেই তোমাকে দেখে রাখার। নিজের খবরই রাখতে পারে না ভালমত। তোমার বিয়ে করা দরকার, বোকা মেয়ে! পৃথিবীর সেরা পুরুষটি তোমাকে কয়েকশো বার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। অথচ বারবার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছ তুমি। আর বোকামি কোরো না, এমি।'

'আমি··· আমি ওকে ফেরাতে চাইনি,' ফোঁপাতে লাগল এমি। 'কিন্তু···

কিন্তু কিছুতেই যে জর্জকে ভুলতে পারি না…' দেয়ালে টাঙানো জর্জের ছবিটার দিকে চাইল ও।

'কেন পারো না?' ধমকাল বেকি। 'ওর মত একটা স্বার্থপর, অপগণ্ড লোককে কেন ভুলতে পারো না? ডবিন চাপ না দিলে কখনই ও বিয়ে করত না তোমাকে। জানো সে কথা? জর্জ নিজেই বলেছে আমাকে। তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত আমার সঙ্গে। বিয়ের পরের সপ্তাহেই প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে।'

'মিথ্যে! সব মিথ্যে!'

'আমার কথা বিশ্বাস করলে না?' জানতে চাইল বেকি। 'তবে এই দেখো।'

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করল ও। ভাঁজ খুলে ওটা ছুঁড়ে দিল এমির কোলে।

'পড়ো। ওর হাতের লেখা তো চেনোই। আমাকে লিখেছিল চিঠিটা। ওর সঙ্গে পালাতে বলেছিল। তোমার নাকের ডগা দিয়েই চিঠিটা পাচার করেছিল আমাকে– তুমি টের পাওনি।'

কোন কথা এ মুহূর্তে কানে ঢুকছে না এমির। চিঠিটা পড়ছে ও। ফুলের তোড়ার ভেতর এই চিঠিটাই রেখেছিল জর্জ। বেকি ঠিকই বলেছে। জর্জ সত্যিই পালাতে চেয়েছিল ওকে নিয়ে।

মাথা নিচু হয়ে গেল এমির। কাঁদছে সে। অপমানে, ঘৃণায় কালো হয়ে গেছে মুখ। তবে সামলেও নিল দ্রুত। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল বেকি।

'কাগজ কলম নাও,' হেসে বলল ও। 'এক্ষুণি চিঠি লেখো ডবিনকে।'

'আজ…আজ সকালেই চিঠি পোস্ট করেছি,' বলল এমি। চেহারার রঙ পাল্টে গেছে। এবার লাল।

ক'দিন পরের কথা। বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে শনশন হাওয়া। খুব সকাল বেলা বিছানা ছাড়ল এমি। জর্জিকে নিয়ে চলে গেল সি ফ্রন্টে। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর বুক।

'আজ না এলেই ভাল হয়,' বলল সে।

'আজই আসবে,' দৃঢ় শোনাল জর্জির কণ্ঠ। 'ওই দেখো, মা, স্টিমারের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে স্টিমার। যেখানটাতে থামবে সেদিকে পা বাড়াল ওরা। পা কাঁপছে এমির। কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। হাতে গোনা কজন মাত্র মানুষ রয়েছে আশেপাশে।

দীর্ঘদেহী এক পুরুষ পা রাখল তীরে। এক মহিলা ছুটে গেল তার দিকে, হাত দুটো বাড়িয়ে। পরমুহূর্তে মিশে গেল দুটো শরীর। বিড়বিড় করে কি যেন বলল মহিলা। হয়ত বলল, 'মাফ করে দিয়ো…আমাকে মাফ করে দিয়ো, জান…'

খানিক পরেই আলাদা হলো ওরা। এমি তখনও শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে ডবিনের হাতজোড়া। ওর চোখ ডবিনের চোখে। গভীর ভালবাসার, মায়ার আর প্রশান্তির ছাপ স্পষ্ট সেখানে।

'আর কখনও চলে যাবে না তো?' ডবিনের বুকে মুখ গুঁজে শুধাল এমি।

'কক্ষনো না,' শক্ত করে এমিকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল ও।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ডবিন ভালবাসার মানুষটির সাড়া পেল, এমি ধরা দিল তার বুকে। এমি এখন তার, শুধুই তার। আর কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারবে না ওকে। মেজর ডবিন সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। পাঠক, আমরাও কিন্তু পৌঁছে গেছি গল্পের শেষে।

আসুন, ওদের দাম্পত্য জীবনের সুখ কামনা করে প্রার্থনা করি।

* * *

শুভম ক্রিয়েশন